স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

জীবন-চরিত।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঙ্কলিত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

কলিকাতা।, বঙ্গাব্দ ১৩২২।

মূল্য [illegible] টাকা।

উৎসর্গ।

সোদরপ্রতিম

শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্লভ হাজরা (সেন)

ব্রজসুন্দর,
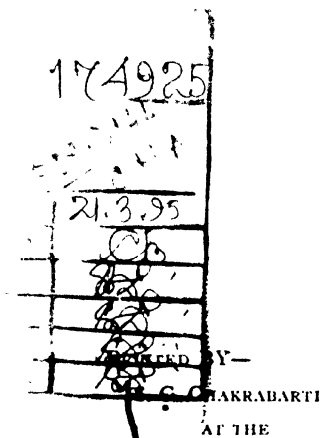
আমার এ পূজারনির্ম্মাল্য তোমায় দিয়া তৃপ্তি—তাই তোমায় দিলাম।

তোমার•

শচীশ।

ভূমিকা।

—:*:—

নিদ্রাঘোরে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ দুর্গোৎসব করিবার বাসনা করিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গতি নাই; ভিক্ষা তাহার উপজীবিকা। তবু সে নিরস্ত হইল না। নিজে মাটী কাটিয়া আনিয়া প্রতিমা গড়িল—লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিল—দুক্রোশব্যাপী পথ হাঁটিয়া গঙ্গাজল মাথায় বহিয়া গৃহে আনিল। কিন্তু ডাকের গহনা দিয়া প্রতিমা সাজাইতে পারিল না—আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণের সেবার্থ অর্পণ করিতে পারিল না—ঢাক ঢোল বাজাইয়া গ্রাম মাতাইতে পারিল না। ব্রাহ্মণ শুধু প্রাণ ভরিয়া পূজাটি করিল।

ঘুম ভাঙ্গিলে চাহিয়া দেখিলাম, আমারও সেই দশা। আমি কোনও রকমে প্রতিমাখানি গড়িলাম, কিন্তু তাহাকেত সাজাইতে পারিলাম না। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিলাম,

ন্তু উপযুক্ত আহার্য্য দিয়া মহদ্‌জনের সেবা করিতে
রিলাম কই? নৈবেদ্য সাজাইতে গিয়া দেখিলাম,
র চাল নাই; হোম করিতে গিয়া দেখিলাম, পাত্রে
নাই; বলি দিতে গিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণে ছাগ
ই। তবে এ ধৃষ্টতা কেন? যে সামর্থ্যহীন, তার
াপূজা করিতে বাসনা কেন?

কেন, তা' বলিব! বলিব বলিয়াই এ দীর্ঘ ভূমিকার
াতারণা করিয়াছি। গত ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের
্যতিথি উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরে একটি
া আহূত হয়। সেই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি
াবন্ধ পাঠ করিতে আমি অনুরুদ্ধ হই। পাঠ করিয়া-
াম বটে, কিন্তু লোকের ভাল লাগিয়াছিল কি না
নি না। অবশেষে আমার দুই চারিজন বন্ধু সেই
াবন্ধটি মুদ্রিত করিতে আমায় অনুরোধ করেন।
মি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম। কিন্তু ছাপিতে
াার পূর্ব্বে প্রবন্ধটিকে অনেক বাড়াইলাম। প্রবন্ধের
া দিলাম—"বঙ্কিম-কাহিনী"। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে
াহিনী" যখন ছাপা শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন
াক জন উদারচিত্ত ভদ্র ব্যক্তির গাত্রদাহ উপস্থিত

হইল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলেন, কেহ বা প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। আমি একটু ভীত হইলাম; কেন না, এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ 'ক' 'খ' শেষ করিয়া রামায়ণ ধরিয়াছেন—কেহ বা 'ক''খ' আরম্ভ করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা জানাইয়াছেন। সুতরাং আমার ভয় পাইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। যাহা হউক আমি পিছাইলাম না। ভাবিলাম, তবে 'কাহিনী'তে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া জীবনী লিখিব। ভাবিলাম, যে চরণে একটি ক্ষুদ্র বনফুল অর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলাম, সে চরণে আরও দুইটা ফুল, চন্দনের সহিত মিশাইয়া দিই না কেন?

আমার বন্ধুরাও সেই পরামর্শ দিলেন। আমি তখন বুকের ভিতর এক অভূতপূর্ব্ব দৈবশক্তি অনুভব করিলাম। তিন মাসের মধ্যে এই জীবনী লিখিয়া শেষ করিলাম। সমস্ত দিন উপকরণ-সংগ্রহার্থ ঘুরিয়া রাত্রে বসিয়া দুই চারিখানি কাগজ লিখিতাম। পরদিন প্রাতে তাহা ছাপাইতে দিয়া আবার উপাদান সংগ্রহকরণাভিলাষে বহির্গত হইতাম। এইরূপে পুস্তক-

খানি তিন মাসের মধ্যে লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল।

*　　　*　　　*

আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লিখিবার সময় এখনও সমাগত হয় নাই। কতকগুলি ঘটনা এমনই ভাবে অপরের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট যে, সে সকল ঘটনার আমি উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কাহারও মনঃপীড়া দেওয়া আমার অভিপ্রেত নয়। যদি অজ্ঞাতসারে কাহারও মনঃকষ্টের কারণ হইয়া থাকি, তবে তিনি যেন আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া আমায় ক্ষমা করেন।

কয়েক জন ভদ্র মহোদয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। যাঁহারা সাহায্য না করিলে এ গ্রন্থ লিখিয়া উঠিতে পারিতাম কি না সন্দেহস্থল। নিম্নে তাঁহাদের নাম দিলাম :—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র, এম, এ (বেঙ্গল-লাইব্রেরী), শ্রীযুক্ত কিরণনাথ ধর, এম, এ (ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী), ও Mr. E. W. Madge (Imperial Library);—এতদ্ব্যতীত গভর্মেণ্ট বা

তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতেও কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছি।

১৮নং নবীন সরকারের লেন,
নেবুবাগান, কলিকাতা। } শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়বারের বক্তব্য।

এবারেও মনোমত করিয়া সাজাইতে পারিলাম না। তবে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শক্তি সামান্য—বিঘ্ন বিপুল। বারান্তরে—যদি আমার ভক্তি থাকে—তবে নূতন সাজে আমার এ প্রতিমাকে সাজাইব।

গ্রন্থের আকার প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে, বাধ্য হইয়া মূল্যও বাড়াইতে হইল। ইতি——

দেওঘর।
১৩২২। শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিম-জীবনী।

বঙ্কিম-জীবনী।

সূচনা।

আমার মনে হয়, পিতৃলোকে সময় সময় বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই বিপ্লবের ফলে মহাপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা—যাঁহারা পৃথিবীতে একদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা—সমসময়ে পিতৃলোক ত্যাগ করিয়া পুনরায় ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এইরূপে পৃথিবীতে সময় সময় প্রতিভার স্রোত বহিয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই, এইরূপ একটা তরঙ্গ উঠিয়া একদিন উজ্জয়িনী-তট প্লাবিত করিয়াছিল। সেই তরঙ্গশিরে কালিদাস, বররুচি, বেতাল-ভট্ট, ঘটকর্পর, শঙ্কু, বরাহ-মিহির প্রভৃতি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া ভারতবর্ষ সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহারাই হয় ত ভাসিতে ভাসিতে যুগযুগান্তরের পর ইংলণ্ডের তটে উপনীত হইয়া রাজ্ঞী এলিজ্যাবথের রাজত্বকাল চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া দেখিলে

আমার মনে হয়, এইরূপ একটা তরঙ্গশিরে জয়দেব চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া পুণ্যময় বাঙ্গালার তট উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তা'র পর ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইল। মহাপ্রেমিক, বিশ্ব-শিক্ষক, প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া কত সার্ব্বভৌম, কত রঘুনন্দন, কত রঘুনাথ মুকুলিত হইল।

তাহার পর কিছু কাল ধরিয়া অনন্ত জলধিগর্ভে আর তেমন তরঙ্গ উঠিল না; আমরা উৎসুকনয়নে চাহিয়া রহিলাম—সুধু একটা চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইল। কিন্তু সে পৃথিবী-পরিপ্লাবী, প্রতিভা-বাহী তরঙ্গ দেখিলাম না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। তাহার পর সহসা একদিন সিন্ধুবক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল—বিদীর্ণ জলধিবক্ষে প্রতিভার তরঙ্গ ছুটিল। দেখিলাম—রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় প্রভৃতি বাঙ্গালার বক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছেন।

তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত রত্নরাজি বেলাভূমি হইতে কুড়াইয়া গৃহে আনিতে না আনিতে গুরুগম্ভীর অম্বর-বিদারী গর্জ্জন পশ্চাতে শুনিলাম! ফিরিয়া দেখিলাম, পৃথিবী ও

আকাশের সঙ্গমস্থল হইতে উথিত হইয়া এক মহাকায় তরঙ্গ বাঙ্গালার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আশা-কুলিত হৃদয়ে বেলা-ভূমি অভিমুখে আবার ছুটিলাম। দেখিলাম, উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গশিরে ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, ভূদেব, গিরিশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, দীনবন্ধু, গোবিন্দরায়, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কেহ কাঁচড়াপাড়ায়, কেহ বীরসিংহ গ্রামে, কেহ কাঁটালপাড়ায়, কেহ সাগরদাঁড়ি গ্রামে, কেহ গুলিটায়, কেহ কলিকাতায়, কেহ চৌবেড়িয়ায়, কেহ নয়াপাড়ায়, সুবিধা ও সুযোগ মত অবতীর্ণ হইলেন। কাহারও ললাটে প্রভাকর, কাহারও নয়নে অশ্রুধারা, কাহারও হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি, কাহারও কণ্ঠে বৈজয়ন্ত-প্রতিঘাতী ভেরীনিনাদ, কাহারও মানসপটে দশমহাবিদ্যার অতুলনীয় রূপ, কাহারও হস্তে "বিশ্বনাথ ট্রাষ্টফণ্ড"-অঙ্কিত পতাকা, কাহারও পদতলে নাট্যসিংহাসন, কাহারও আলিঙ্গন-বদ্ধ বাহুপাশে "সমাজ," কাহারও উদ্যতহস্তে নীলকর-মথন দণ্ড, কাহারও কণ্ঠে যমুনার কুলু কুলু ধ্বনি, কাহারও হস্তে রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য শঙ্খ।

বাঙ্গালার এই পারিপ্লাবন—এই প্রতিভা-তরঙ্গের গর্জ্জন, পৃথিবীর পশ্চিম তটেও প্রতিঘাত হইয়াছিল। শক্তি-উপাসক মহা-বৈষ্ণবের বন্দে মাতরম্ ধ্বনি, কোটি কণ্ঠে বাহিত হইয়া সুদূর নীলাম্বুরাশি সমুচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু—কিন্তু যাঁহাদের তূর্য্য-নিনাদে সমগ্র বঙ্গ, সমগ্র ভারত প্রকম্পিত হইয়াছিল, আজ তাঁহাদের কয় জন আছেন?—আজ তাঁহাদের কয়জন অনাথ কাঙ্গালের অশ্রুমোচন করিতে, অজ্ঞকে কৃষ্ণভক্তি দান করিতে, জীমূতমন্দ্রে নির্জ্জীব হৃদয় অনুপ্রাণিত করিতে এ জগতে অবস্থান করিতেছেন? তাঁহাদের সকলেই আমাদের ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আর কি তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন না? আমরা ব্যাকুলনয়নে আকাশ পানে চাহিয়া আছি, আর কি প্রতিভার তরঙ্গ বাঙ্গালায় প্রবাহিত হইবে না?

বঙ্কিম-জীবনী।

প্রথম খণ্ড।

বঙ্কিম-জীবনী।

কাঁটালপাড়া।

জেলা চব্বিশ পরগণার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। বারাসত এই জেলার অন্তর্গত। পূর্ব্বে বারাসত একটি জেলা ছিল, এক্ষণে একটি মহকুমা-মাত্র। বারাসত হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে কাঁটাল-পাড়া অবস্থিত।

কাঁটালপাড়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। কলিকাতা হইতে বেশী দূর নয়,—বার ক্রোশ মাত্র। রেলে এক ঘণ্টার পথ। কাঁটালপাড়ার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা, উত্তরে নৈহাটী, দক্ষিণে ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী, পূর্ব্বে দেল-পাড়া। ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল-ষ্টেট রেলওয়ে, কাঁটালপাড়াকে দ্বিখণ্ড করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাংশে চট্টোপাধ্যায়-

বংশের বাস—পশ্চিমাংশে, গঙ্গার দিকে অন্যান্য ভদ্র-লোকের বাস। এক্ষণে নৈহাটী ষ্টেশন যে স্থানে অবস্থিত, সে স্থান কাঁটালপাড়ারই অন্তর্গত।

গঙ্গার এক পারে কাঁটালপাড়া—অপর পারে চুঁচুড়া। চুঁচুড়ায় স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্রের বাসস্থান, কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান। আর একদিন, প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, গঙ্গার এক পারে ভারতচন্দ্র রায়, অপর পারে রামপ্রসাদ সেন। তার আগে, চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, গঙ্গার এক কূলে কাশীরাম দাস, অপর কূলে কৃত্তিবাস। আরও একটু দূরে—অজয়ের কূলে, একদিকে জয়দেব, অপর দিকে চণ্ডীদাসকে দেখিয়াছিলাম। চুঁচুড়া কাঁটালপাড়া, পাণ্ডুয়া হালিসহর, সিঙ্গি ফুলিয়া, কেন্দুবিল্ব নান্নুর ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে সকল মহা-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম কোনও কালে বিলুপ্ত হইবে না।

কাঁটালপাড়া কত দিনের, তা' জানি না। কেমন করিয়া নামের সৃষ্টি হইল, তাহাও বলিতে পারি না। কতকগুলি কাঁটাল গাছ আছে বটে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী

অন্যান্য গ্রামে যা' আছে, তদপেক্ষা কোনও মতে বেশী হইবে না। তবে পুরাকালে কি ছিল, তাহা বলিতে পারি না।

কাঁটালপাড়ায় দ্রষ্টব্য বড় একটা কিছুই নাই। অর্জ্জুনা দীঘী সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী আছে। আমরা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি, নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিতে যাইবার সময় অর্জ্জুনার সন্নিকটে সসৈন্যে ছাউনি করিয়াছিলেন। রঘুদেব ঘোষাল নবাবসৈন্যের রসদ সংগ্রহ করিয়া নবাবের আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

আর দেখিবার আছে,—রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ। তাঁহার সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। সে আজ বহুদিনের কথা। আমি দেড় শত বর্ষের আগেকার কথা বলিতেছি। তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে আলিবর্দ্দি খাঁ অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইংরাজ কলিকাতায় কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া ভারতব্যাপী রাজ্যের সূচনা করিতেছেন। মির্জাফর তখন সামান্য সেনানী। সিরাজউদ্দৌলা বালক মাত্র।

সে সময় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রামজীবনের শ্বশুর রঘুদেব ঘোষাল কাঁটালপাড়ার মধ্যে জনৈক সঙ্গতিপন্ন

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার গৃহ তখন ক্ষুদ্র, আড়ম্বরশূন্য,—বর্ত্তমান চট্টোপাধ্যায়-গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। তাঁহার ঠাকুরমন্দির বা অতিথিশালা ছিল বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু বাগান ও পুষ্করিণী যথেষ্ট ছিল। বহুকালের অর্জ্জুনা দীঘী তখন ঘোষাল মহাশয়ের সম্পত্তি।

এমনই দিনে—১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে—একদা অপরাহ্ণে জনৈক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অতিথিশালা নাই, সন্ন্যাসী বাধ্য হইয়া পুষ্করিণী তটে তরুচ্ছায়াতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। তাঁহার কাঁধের উপর একটী দীর্ঘবিলম্বিত ঝুলি। ঝুলির ভিতর রাধাবল্লভজীউ ছিলেন। সন্ন্যাসী ঝুলিটি নামাইয়া তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্যামাচরণ, রাধাবল্লভ প্রাপ্তি সম্বন্ধে স্বহস্তে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"নারায়ণ ব্রহ্মচারী নামক কোনও সন্ন্যাসী, রাধাবল্লভ বিগ্রহকে আপন ঝুলিতে রাখিয়া দেশ-বিদেশ

ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সহোদর ভ্রাতা বলরাম ব্রহ্মচারী, উক্ত বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। তিনিও তাঁহার সহোদরের ন্যায় ঠাকুরকে ঝুলিতে লইয়া দেশভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদা তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হ'ন। তথায় সাহার পুকুর নামে একটী জলাশয় ছিল। সেই জলাশয়ের পাড়ের উপর মাধবী- বৃক্ষ-তলে ঠাকুর নামাইয়া ব্রহ্মচারী স্থানান্তরে গমন করেন। প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, যে ঠাকুর পশ্চিমমুখী ছিলেন, সে ঠাকুর পূর্ব্বমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তদ্দৃষ্টে তিনি চিন্তামগ্ন হইলেন। বুঝিলেন, ঠাকুরের তথায় অবস্থান করিতে বাসনা হইয়াছে। তিনি ঠাকুরকে তথায় রঘুদেব ঘোষালের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া গেলেন। জানি না, নবাবের নিকট তিনি কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু নবাব তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। নবাব কয়েক দিবস পরে ব্রহ্মচারীকে ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণনগরাধিপতিকে অনুজ্ঞা করেন, এই ব্রহ্মচারী যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা গ্রাহ্য 'করিবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা

পাইয়া বলরাম ব্রহ্মচারীকে কাঁটালপাড়া গ্রামে দশ বিঘা ব্রহ্মত্তর, দশ বিঘা দেবোত্তর, দশ বিঘা জমাই জমী দান করেন।

এই জমী পাইয়া ব্রহ্মচারী কাঁটালপাড়ায় ঘর বাঁধিলেন ও বাস করিতে লাগিলেন। পরে পাটাদার দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষের নিকট যাইয়া লক্ষ্মণ-পুর এবং দোগাছা দেবোত্তর লয়েন। কিছুকাল পরে রঘুদেব ঘোষালকে মন্ত্র প্রদান করেন; এবং দেহান্তরের অনতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ঠাকুর ও জমী-জমা দান করেন।"

তা'র কয়েক বৎসর পরে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দির-গাত্রে প্রস্তরফলকে দুই ছত্র লিখিত ছিল।—

বাণ সপ্ত কলা শকে
রঘুদেবেন মন্দিরম্।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ১৬৭৫ শকে রঘুদেব কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে আজ ১৫৮ বৎসরের কথা।

১২৫৩ সালে মন্দির ভাঙ্গিয়া যায়। পরে ১২৫৭ সালে

পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্র বহু অর্থ ব্যয়ে মন্দির সংস্কার করিয়া দেন।

এই রাধাবল্লভ কতদিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না—কত সন্ন্যাসীর হাত ঘুরিয়া অবশেষে চট্টোপাধ্যায় বংশের হাতে পড়িয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র মধ্য জীবন হইতে রাধাবল্লভের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বংশ-পরিচয়।

বংশ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধে আমি দক্ষ হইতে পরিচয় দিলাম।

দক্ষ
|
সুলোচন
|
বাসুদেব (মতান্তরে মহাদেব)
|
নারি (মতান্তরে হলধর)
|
নারো (মতান্তরে কৃষ্ণদেব)
|
বরাহ
|
শ্রীকর অধ্বর্য্যু (মতান্তরে শ্রীধর)
|
বহুরূপ
|
গাহী
|
অবসথী সর্ব্বেশ্বর
|
তেকড়ি

তেকড়ি
|
সিদ্ধেশ্বর
|
লক্ষ্মীধর
|
দিগম্বর
|
জগন্নাথ
|
শ্রীগর্ভ (চৈতন্যদেবের সমকালীন)
|
ভগবান্
|
অবসথী গঙ্গানন্দ
|
কৃষ্ণবল্লভ
|
নন্দগোপাল বা নন্দকিশোর
|
রামকান্ত
|
রামজীবন (ভঙ্গ)

- রামহরি
  - শিবনারায়ণ
  - জয়নারায়ণ
- জগন্নাথ
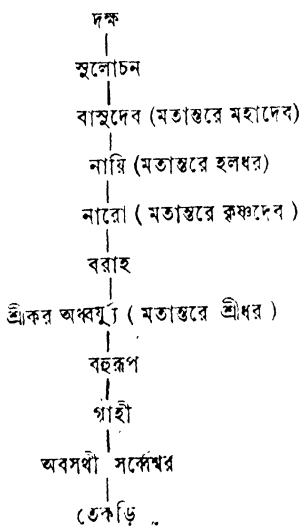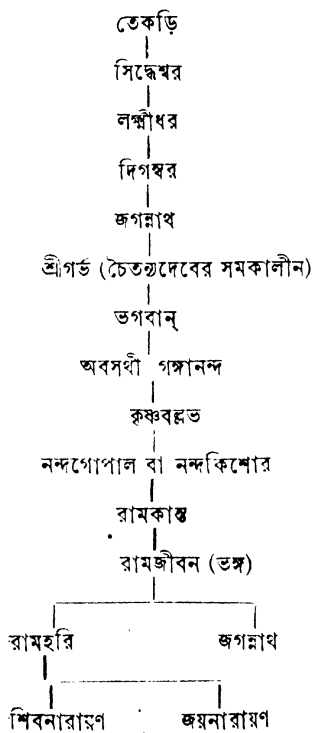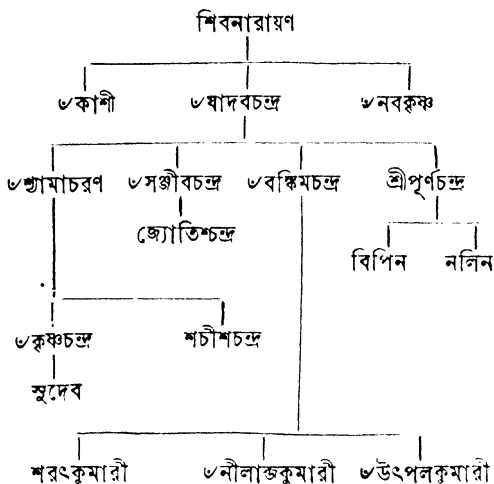
দক্ষ ৯৯৯ সংবৎ—৮৪২ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ হইতে মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ষাট বৎসর।

তার পর বঙ্কিমচন্দ্রের' কথায় বংশ পরিচয় দিব।—"অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল, হুগলী

জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো * । তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় পাইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন, সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন।"

---

* কোন্নগরের সন্নিকট।

মাতাপিতা।

—ঃ০ঃ—

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা পিতা সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিব। যাঁহার অস্থি হইতে দম্ভোলি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার একটু পরিচয় প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা সাতিশয় স্থূলাঙ্গী ও কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। কিন্তু এমন মাধুর্য্যময়ী, এমন করুণাময়ী শান্ত মূর্ত্তি জগতে অল্পই দৃষ্ট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা তপ্তকাঞ্চনগৌরবর্ণ—দীর্ঘকায়—তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন—মহিমা-মণ্ডিত—তেজঃপুঞ্জ পুরুষ ছিলেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র অতি সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রের জনক-জননীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আমায় বলিয়াছেন, "যাদবচন্দ্রের মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র অপবিত্র ভাব দেখি নাই; কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর বদনে যা' কিছু দেখিয়াছি, সমস্তই পবিত্র।"

যাদবচন্দ্র ১২০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হইয়াছিলেন।

যাদবচন্দ্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে জগন্নাথ-দর্শনে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহার অগ্রজ সহোদর কাশীনাথ দারোগাগিরি করিতেন। পুলিসের দারোগা নহে, নিমকীর দারোগা। যাদবচন্দ্র সেখানে ভাইয়ের কাছে থাকিয়া কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর, তখন তাঁহার কর্ণমূলে এক স্ফোটক দেখা দেয়। স্ফোটক ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল—কর্ণমূল পচিতে লাগিল। চিকিৎসকেরা Gangrene বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। অবশেষে যাদবচন্দ্রের আত্মীয় স্বজনেরা দেখিলেন, তাঁহার জীবনের আর কোনও আশা নাই। ক্রন্দনের রোলের মধ্যে যাদবচন্দ্রের দেহ বৈতরণীতীরে লইয়া যাওয়া হইল।

বৈতরণীর খেয়া ঘাটের পার্শ্বে যাদবচন্দ্রের দেহ রক্ষিত হইল। চিতা সজ্জিত হইল। যাদবচন্দ্রের অগ্রজ ভ্রাতা ও বন্ধু বান্ধবেরা কাঁদিয়া আকুল। সেই ক্রন্দনরোলের মধ্যে সহসা গুরুগম্ভীর বাক্য-নির্ঘোষ শ্রুত হইল—"স্থিরো ভব।"

সকলে চমকিত হইয়া দেখিলেন, এক দীর্ঘকায় জটাজূটধারী মহাতেজোদীপ্ত প্রশান্তবদন সন্ন্যাসী মুমূর্ষু যাদবচন্দ্রের নিকটে দণ্ডায়মান। সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র সকলের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। বিপদের সময় সন্ন্যাসীকে দেখিলে কে আশান্বিত না হয়?

যাদবচন্দ্রের পানে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "এ ব্যক্তি মরে নাই—এক্ষণে মরিবেও না। কেন ইহাকে আনিলে?"

বলিয়া তিনি মুমূর্ষুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নানাভঙ্গীতে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অচিরে যাদবচন্দ্রের চৈতন্যসঞ্চার হইল। ক্রমে তিনি উঠিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী কমণ্ডলু হইতে একটু জল লইয়া যাদবচন্দ্রের মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে যাদবচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, এবং সন্ন্যাসীর চরণ দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া সকাতরে বলিলেন, "ঠাকুর, আমায় মন্ত্র দান কর।"

সন্ন্যাসী মন্ত্রপ্রদান করিতে প্রথমে অসম্মত হইলেন; পরে যাদবচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া মন্ত্রদানে সম্মত হইলেন। কিন্তু সে দিন সন্ন্যাসী মন্ত্র দেন নাই, যাদবচন্দ্র

সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলে, শুভদিনে শুভক্ষণে জনশূন্য বৈতরণী-তীরে বসিয়া যাদবচন্দ্রকে দীক্ষিত করিলেন।

দীক্ষান্তে সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি দীর্ঘজীবী ও সুখী হইবে; তোমার ঔরসে পুণ্যময় সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। মান সম্ভ্রম ধন ধর্ম্ম, কিছুরই তোমার অভাব হইবে না।"

সন্ন্যাসীর পদধূলি মাথায় লইয়া যাদবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে আবার প্রভুর দর্শন পাইব?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "তোমার এ দেহে তুমি আমার তিন বার দর্শন পাইবে। একবার মধ্যজীবনে,—বিদেশে; দ্বিতীয় বার তোমার মৃত্যুর অষ্টাহপূর্ব্বে; তৃতীয় বার তোমার মৃত্যুর সময়।"

যাদবচন্দ্র বলিলেন, "আপনার অনুপস্থিতিতে এ দীর্ঘ সময় আমি কি লইয়া থাকিব ঠাকুর?"

সন্ন্যাসী স্বীয় চরণ হইতে খড়ম জোড়াটি খুলিয়া যাদবচন্দ্রকে প্রদান করিলেন; এবং বলিলেন, "এই খড়ম তুমি চিরজীবন পূজা করিও—কখনও অশান্তি পাইবে না।"

সন্ন্যাসী আর একটি জিনিস যাদবচন্দ্রকে দিয়া-

ছিলেন,—পৈতা। এ পৈতা তুলা হইতে প্রস্তুত নহে। আমি বাল্যকালে তাহা দেখিয়াছি। পার্ব্বত্য বৃক্ষবিশেষের তন্তু হইতে এই পৈতা নির্ম্মিত এইরূপ শুনিয়াছিলাম।

যাদবচন্দ্র এ পৈতা কখনও গলায় পরেন নাই; প্রাতঃ-সন্ধ্যায় মস্তকে ধারণ করিতেন। খড়ম চিরদিন—প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়াছিলেন। অবশেষে ১২৮৭ সালে যখন তাঁহার পবিত্র দেহ গঙ্গাতীরে নীত হয়, তখন তাঁহার সঙ্গে পৈতা ও খড়মও গিয়াছিল। তিন জিনিস এক চিতায় পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছিল।

যাদবচন্দ্র।

—*—

পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্র স্বহস্তে আত্ম-জীবনী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। কোনও কোনও অংশ পাঠকের বিরক্তি-উৎপাদনের ভয়ে পরিত্যাগ করিলাম।—

"সন ১২০১ সালে ১৮ই পৌষ তারিখে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। জন্মাবধি ১৫।১৬ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পীড়িত থাকিতাম, যে হেতু আমার ধাত্ বড় শ্লৈষ্মিক ছিল। এ জন্য স্বর্গীয় পিতা মাতা সর্ব্বদা আমাকে নিকটে নিকটে রাখিতেন। সুস্থ সময়ে পাঠশালায় লেখাপড়া করিতাম, কিন্তু গুরু-মহাশয় প্রভৃতি আমাকে কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না।

নবম বৎসরে উপনয়ন হয়। দশম বৎসরে কর্ণমূল ফুলিয়া আমার জ্বর বিকার হয়। কর্ণমূলে অস্ত্র হইলে গলার ভিতর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইত। এতাদৃশ

ঘা হইয়াছিল যে, ঐ রোগে গঙ্গাযাত্রা হেতু উপর হইতে আমাকে বাহির-বাটীতে আনা হইয়াছিল, পরে পরমায়ু থাকায় রক্ষা পাইলাম।

১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কিতাবাদি লেখাপড়া যাহা শিক্ষা হইবার হইল। ১২ বৎসর বয়সে পারিসি পড়িতে আরম্ভ করি। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে উহা ত্যাগ করিয়া ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। দুই মাস পাঠানন্তর উহা ভাল লাগিল না; পুনরায় পার্শি পড়িতে আরম্ভ করিলাম; কৃতবিদ্য হওনের অত্যল্পকাল বাকী থাকিতে, অর্থাৎ অল্লামি, উর্কি, হাফেজ এই তিন কেতাব পড়া বাকি থাকিতে আমার হাম সরফ (সহপাঠী) এবং পরমবন্ধু বিষ্ণুমোহন মিত্রের ভ্রাতা মথুরমোহন মিত্র ও মধুসূদন মিত্র লোকান্তরে গমন করিলেন। আমার পড়িতে আর ইচ্ছা হইল না। আমি বাটীতে না জানাইয়া কলিকাতায় গমন করিলাম; এবং ভগবতী-চরণ মিত্রের নিকটে পরিচিত হইয়া তাঁহার স্নেহপাত্র হইলাম। তিনি পারসি, ইংরাজিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। দুই মাস স্বয়ং আমাকে পড়াইলেন বটে, কিন্তু

আমার আর পড়াশুনা ভাল লাগিল না; আমার মন সর্ব্বদা উচাটন থাকিত। পরে বাটী আসিয়া, ছয় মাস পর্য্যন্ত ব্যায়রাম ভোগ করিলাম।

রোগের উপশম হইলে ৺জগন্নাথ-দর্শনের ইচ্ছা করিলাম। পিতা মাতা প্রভৃতি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কটক অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

নারায়ণ-গড়ের সরহদ্দে 'ব্রহ্মচারী লীলা বান্দ্রির' সন্নিকটে যেখানে রাস্তার উপর পুল আছে, সেখানে পৌঁছিয়া রৌদ্রে কাতর হইয়া পড়িলাম। একখানি ধূতি উড়ানি, আর কাপড়ের খোঁটে কয়েকটি টাকা বাঁধা ছিল। সে সব রাখিয়া জলে নামিলাম। অনেকক্ষণ জলে থাকিয়া শীতল হওনান্তর ডাঙ্গায় উঠিয়া দেখিলাম যে, বস্ত্র ও টাকা নাই।

বড় ক্ষুধা হইয়াছিল। পয়সার অভাবে আহার্য্য কিনিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলাম। বেলা ২।৩ টার সময় কাঁচরাপাড়া-নিবাসী ঠাকুরচরণ রায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কটক জেলার রড়াই নামক এক আড়ঙ্গের পোক্তানি দারোগা। তিনি আপন কর্ম্মস্থানে গমন করিতেছিলেন।

দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে?'

উত্তরে আমূল সকল কথা বলিলাম। পরিচয় দিলাম। পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি সস্নেহে আমার হস্ত ধারণানন্তর কহিলেন, 'তুমি কাশীর ভাই! বেশ, আমার সঙ্গে এস। এই স্থানে লোক ঠেঙ্গাইয়া মারে, তুমি কেমন করিয়া এতক্ষণ বাঁচিয়া আছ, ইহাই আশ্চর্য্য।'

পরে রড়াই পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া গেলেন। তথায় পাঁচ ছয় দিন রাখিয়া লোক সঙ্গে দিয়া ভদরক মোকামে দাদার নিকট পাঠাইলেন। দাদা আমার প্রতি দৃষ্টিমাত্র বুঝিলেন, আমি বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন।

কয়েক রোজ ভদরকে থাকিয়া কটকে গেলাম। তথায় বিশ্বমোহন মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি দৃষ্টিমাত্র চিনিলেন; জানিলেন, মথুরের বন্ধু যাদব। অনেক রোদন করিলেন। দুই দিবস আমাকে দেখিলেন না। ভিন্ন ঘরে মথুরের প্রতি যে স্নেহ ছিল সেই স্নেহে রাখিলেন।

কয়েক দিবস পরে শোক শান্তি হইলে তিনি আমাকে শ্রীক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। সদরআলা জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা নীলমণি আর তাঁহার পারিষদ নবীন গাঙ্গুলী, নিমকির দেওয়ানের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস বসু ও হরিহর রায় প্রভৃতি কয়েক জন শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলেন, আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। আমার ঈপ্সিত শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলাম।

জগন্নাথ দেবের রত্নবেদীর চতুষ্পার্শ বড় অন্ধকার-ময়। লোকের ভিড়ও খুব। প্রদক্ষিণ করিবার সময় আমার দম বন্ধ হইয়া আসিল। কম্পিতকণ্ঠে অস্পষ্টস্বরে বলিলাম, 'নীলমণি দাদা, আমি মরিলাম।'

নীলমণি ও নবীন বড় জোয়ান ও সাহসী। তাঁহারা সেই রত্নবেদীর দেওয়ালে আমাকে ঠেলা দিয়া রাখিয়া দুই জন দুই দিকে হস্ত প্রসারিয়া দাঁড়াইলেন। সে স্থানে কেহ আসিতে পারিল না। পথ রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম; তখন আমার সঙ্গীরা আমাকে শূন্যভরে লইয়া অক্ষয় বট তলায় ফেলিলেন। অনেকক্ষণ জল সেচন ও ব্যজন

করিতে করিতে আমার চৈতন্য হইল। আমার সঙ্গীদের যত্ন ও শুশ্রূষায় সে দিবস আমার প্রাণ রক্ষা হইল।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে দাদার কর্ম্মোন্নতি ঘটিল। তাঁহার সেই পদে আমি ১৮১৭ * খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে নিযুক্ত হইলাম। হরিনাথ সাহায্য করিয়াছিলেন। তখন আমার বয়স আঠার বৎসর। এই আঠার বৎসর বয়সে আমি বৈতরণী নদীর কিনারায় যাজপুর মোকামের নমক চৌকীর দারোগা হইলাম। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে একবার কিছু দিনের জন্য দাদার কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হই। ঘোড়ায় চড়িয়া আমায় তদারক করিতে হইত। এক দিবস তদারকে বহির্গত হইয়াছি। কোনও এক সরাইয়ের কিঞ্চিৎ দূরে একটা কাঁটাজঙ্গল ছিল। ঘোড়া ক্ষেপিয়া সেই জঙ্গলে আমাকে ফেলিয়া দিয়া একটা পদাঘাত করিল; দ্বিতীয় পদাঘাত সময়ে

* ১৮১২ হওয়া সম্ভব; কেন না, ১৮১২ সালে তাঁহার বয়স আঠার বৎসর।

তাহার কদমে কি বাজিল,—সে কাত্ হইয়া অন্যদিকে পড়িল। আমার সঙ্গী চাপরাশি ছুটিয়া আসিয়া আমার অবস্থা দেখিল—ডাকিল—উত্তর পাইল না। পরে কাঁটা জঙ্গল কাটিয়া আমাকে বাহির করিয়া সরাইতে লইয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় হইল। কয়েক দিবস তথায় থাকিলাম। ঘোড়া আর দুই এক কদম মারিলে বাঁচিতাম না, দিগম্বর মিত্রের পুত্রের ন্যায় হইতাম।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বালিহস্তায় বদলি হইলাম। প্রবাদ আছে, এই খানে বালিরাজার মৃত্যু হয়। এই চৌকিতে আসিতে না আসিতে শুনিলাম, সমুদ্রের লোণা সৈবালিতে দরিয়া কিনারায় অনেক মানুষ গোরু ভাসিয়া যাইতেছে। তাতে সরকারি নমকের ক্ষতি হয়। আড়ঙ্গ মুড়মালঙ্গ ও সাত ভেয়ে তদারকের ভার আমার প্রতি অর্পিত হয়। আমি মুড়ামালঙ্গে পৌঁছিয়া তিনশত মণ চোরাই নমক, মায় কিস্তি গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম। দরিয়ার একস্থানে যথায় মাইপহরা নামক বাতিঘর আছে, তাহারই সন্নিকটে—দরিয়ার উপকূলে—মুড়মালঙ্গ।

* * * *

কটক পৌঁছিলে চার্লস বিচর সাহেব এজেণ্ট আমার প্রতি তুষ্ট হন। সেই সময় বিষ্ণুমোহন মিত্র (ভদরক মোকামের রিটেল গোলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী) কর্ম্ম হইতে অপসৃত হন। সাহেব আমাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। কিছু দিন কাজ করিবার পর কটক জেলা তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল; ভদ্রক রিটেল গোলা বালেশ্বর জেলার সামিল হইল। সার জন্ ডাউনি সাহেব তথাকার এজেণ্ট হইলেন। অস্করি ফেক্‌রত নামক কোনও ব্যক্তি দেওয়ান হইলেন। তিনিই কর্ত্তা। তিনি আসিয়া দেখিলেন, ভদরক-গোলা বড় উপার্জ্জনের স্থান। তখন তিনি আমাকে বরখাস্ত করিয়া আমার স্থানে তাঁহার ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিয়া এক রোবকারি লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন, যাদবচন্দ্র বালক এবং অনুপযুক্ত —এতাদৃশ ভারি কর্ম্মের যোগ্য নহেন। আমার বদ্‌লি দারোগা আসিয়া পৌঁছিল। আমার জিম্মায় তহবিলে তখন সাত আট হাজার টাকা ছিল। তহবিল বুঝিয়া লইবার সময় নূতন দারোগা আপন তসবি অর্থাৎ জপের মালায় সংখ্যা রাখিতে লাগিলেন। আমি

বলিলাম, কাগজ কলমে না লিখিয়া জপের মালায় সংখ্যা রাখিলে ভুল হইবে। তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। অবশেষে টাকার রসিদ দিবার সময়, তিনি দস্তখতের স্থানে নামের মোহর করিয়া কহিলেন, "আমরা এইরূপে দস্তখত করিয়া থাকি, তুমি রিপোর্ট করিলে জানিতে পারিবে।" 174925

আমি ঐ রসিদ রিপোর্ট সহ পাঠাইলাম। তাহাতে লিখিলাম যে, "আমার স্থানে যে ব্যক্তি আসিয়াছেন, তিনি তহবিলের টাকা বুঝিয়া লইবার সময় জপের মালায় সংখ্যা রাখেন, এবং রসিদে দস্তখত না করিয়া নামের মোহর দিয়াছেন। ইহা হুজুরে মঞ্জুর হইবে কি না জানি না।" তখন উইলিয়ম বেলেণ্ট সাহেব কমিশনর ছিলেন। তিনি আমার রিপোর্ট পাইয়া আমাকে তলব করিলেন; এবং আমার সাক্ষাতে উইলি সাহেবকে বলিলেন, এই ব্যক্তিকে সারথা আড়ঙ্গে পোক্তানি দারোগাগিরি কর্ম্মে বাহাল কর।"

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি সারথা আড়ঙ্গে বাহাল হইলাম। তথায় একদিন ডোঙ্গায় করিয়া একটা লোণা নদী পার হইতেছিলাম। সহসা ডোঙ্গা উল্টাইয়া

গেল, আমি ডুবিয়া গেলাম। মাঝি রক্ষা করিল, নতুবা সে যাত্রা মরিতাম। ১৮২৪ সালে দনমঙ্গল আড়ঙ্গে, ১৮২৫ সালে অন্য একটা আড়ঙ্গে বদলি হই। তৎকালে ব্রজমোহন ঘোষাল নমকির দেওয়ান। তাঁহার অত্যাচারে আমি তিষ্ঠিতে না পারিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বাটী আসিয়াছিলাম। ১৮২৭ সালে ডাউনি সাহেব আমাকে তলব করিয়া মলঙ্গ আড়ঙ্গের দারোগাগিরি কর্ম্ম দেন। তথায় ১৮৩৪ সাল পর্য্যন্ত কার্য্য করি। ঐ সময় হেন্‌রি রিকেট সাহেব বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট কলেক্টার ছিলেন। ব্রজমোহন ঘোষালের দৌরাত্ম্যের কথা তিনি অবগত ছিলেন। এমন সময় ডাউনি সাহেব বদলি হইলেন, এবং রিকেট সাহেব তাঁহার স্থানে নমকির এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। নিমকি এলাকায় ছোট বড় ছয় শত কর্ম্মচারী ছিল, প্রায় সকলেই অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় কর্ম্মচ্যুত হইলেন। ব্রজমোহন সস্‌পেণ্ড হইলেন। ব্রজনন্দ দাস নামে এক জন বাঙ্গালী দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। আমিও অপরাধী মধ্যে গণ্য হইয়াছিলাম; কিন্তু আমার বিচার হয় নাই।

আমার অপরাধের বিচার জন্য রিকেট সাহেব আমাকে বালেশ্বরে তলব করিলেন। আমি তিন ত বেহারা মালঙ্গি লইয়া হাজির হইলাম। আমার ুরি দুই জন ভয়ে হাজির হইল না। সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ঘুস লইয়া থাক?'

উত্তর। না; আর ঘুস লইয়া কে কোথায় স্বীকার করিয়া থাকে?

সাহেব আরও রাগিয়া কহিলেন, 'হলপানে হলপ করিয়া বল।'

আমি উত্তর করিলাম, 'মহাপ্রসাদ বা গঙ্গাজল বন-স্পৃষ্ট হইলে মহত্ব হারায়। এ হলপ লইয়া শতবার লিতে পারি, যে হেতু ইহার মহত্ব নাই। কিন্তু আসল লপ, আপনি ধর্ম্মস্বরূপ, আপনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া হা বলা যায়, তাহা অপেক্ষা অন্য হলপ বড় নয়, শাস্ত্রে ইরূপ বলে।'

সাহেব। তুমি কি পণ্ডিত?

আমি। পণ্ডিত নহি, পণ্ডিতসমাজে বাস করি।

সাহেব। মণ্ডলঘাট পণ্ডিত সমাজ?

আমি। মণ্ডলঘাটে পণ্ডিত লোক আছে বটে,

কিন্তু সেটা চাসা-গ্রাম। আমার বাসস্থান গঙ্গার ধারে—হুগলির নিকট। তথায় অনেক পণ্ডিত ও সভ্যলোক আছেন।

সাহেব। ব্রজমোহন ঘোষাল তোমার কে?

আমি। কেহ নহে—আমার সঙ্গে কোন সুবাদও নাই।

সাহেব। তোমাকে কে চাক্‌রী দিয়াছে?

আমি। কটক জেলার এজেণ্ট চার্লস বিচর সাহেব।

সাহেব। কতদিন চাক্‌রী করিতেছ?

আমি। দশ বৎসর।

হলপ মকুফ হইল।

`দাদন করিতে করিতে সাহেব মলঙ্গিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা ১৬ কুস্তি খোরাকি নমক পাও; তাহা ওজনে ৮/ মণ।৵ আর গাছা নমক ৮/ মণ পাও। এই ১৬/ মণ নমক তোমরা কি কর?'

উত্তর। আমরা খাইয়া থাকি।

সাহেব সহাস্যে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন আমি বলিলাম, 'মলঙ্গি লোক আপন আপন প্রা

এক বিন্দুও খায় না; পোক্তানি নমক হইতে দৈনিক খরচ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। খোরাকি নমক বিক্রয় করে।’

সাহেব। তোমার জানত বিক্রয় হয়?

আমি। হাঁ; বরং আমি আপন দস্তখত মোহরে ছাড় চিঠি দিয়া বিক্রয় করাই।

সাহেব। সরকারের চাকর হইয়া তুমি এরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়া থাক? তোমায় সস্পেণ্ড করিলাম।

আমি। আপনি সব করিতে পারেন, কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ করিতে দিতে আজ্ঞা হয়।

সাহেব। কি, বল।

আমি। মালঙ্গি লোক অতি দুঃখী; পরিধানে বস্ত্র নাই—এক টুক্‌রা ন্যাকড়া অবলম্বন; দেহে বা কেশে তেল নাই—রুক্ষ অপরিষ্কার; আহার্য্য—ভাত, পুঁইডাঁটা, কাঁকড়া আর লবণ। আট মাস পোক্তানে থাকে, চারি মাস ছুটি পায়। এই চারি মাস ঘরে গিয়া চাষ করে। জমিদার খাজনার জন্য পীড়ন করিলে চাষের ধান্য বিক্রয় করিয়া খাজনা দেয়।

তখন আহারের উপায় আর থাকে না। * * যে সকল স্থানে নমক দুষ্প্রাপ্য, অথবা মহার্ঘ, সেই সকল স্থানের মলঙ্গির নামে আপন দস্তখত মোহরে ছাড় চিঠি লিখিয়া দিয়া থাকি। ইহা অমুক আইনের অমুক ধারার বিধান অনুসারে অবিধি নয়। ফলে তাহারা বিক্রয়লব্ধ অর্থে জমিদারের খাজনা দিতে এবং পরিবারপ্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়। * * *

রিকেট সাহেব প্রজাপালক, ন্যায়বান্; তিনি ক্ষণকাল আমার প্রতি তীক্ষ্ণ নয়নে চাহিয়া মালঙ্গিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত টাকা এই দারোগাকে ঘুষ দিয়া থাক? আর ইহার উপর তোমাদের কোনও নালিশ আছে?'

সকলে এক জবানে কহিল, "কোনও নালিশ নাই. আমরা ঘুষ দিই না।"

তিন জন মালঙ্গি কহিল, 'একদিবস আমরা দৈনিক খাইবার নমক (এক এক সের হইবেক) লইয়া যাইতেছিলাম। দারোগা তাহা দেখিতে পাইয়া ক্রোক করিয়া লইলেন; এবং চাপরাসি মহসিল দিয়া বালেশ্বর লইয়া যাইবার হুকুম দিলেন। পরে চাপ-

রাসিকে চুপি চুপি কি বলিয়া দিলেন। চাপরাসি আমাদিগকে সরকারি গোলায় লইয়া গিয়া আপনার খাবার নমক হইতে তিন জনকে তিন সের নমক দিল; এবং আমাদিগকে বাটিতে রাখিয়া আসিয়া কহিল, 'এমত কর্ম্ম আর করিও না।' অন্য মালঙ্গিরা ফাঁকি-দিয়া চলিয়া গেল, তাদের কিছু হ'ল না। আমরা ধরা পড়িলাম, তাই এ শাস্তি। অতএব ইনি পক্ষপাত।'

সাহেব হাস্য সংবরণ করিয়া গম্ভীর বদনে কহিলেন, 'দারোগা বাবুকে আর এখানে রাখিব না।'

কথিত তিন জন মালঙ্গি শ্রবণমাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল, এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। বলিল, 'এ দারোগা না থাকিলে আমরা পোক্তান করিব না।'

এই কথা শুনিবামাত্র তিন শত মালঙ্গি একেবারে হরিবোল দিয়া উঠিল। সাহেব হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই দারোগা তোমাদের থাকিবেক।" পরে আমার পানে চাহিয়া কহিলেন, 'তুমি অন্য মাজুল হইতে, কিন্তু তুমি প্রজাপালক ও সত্যবাদী; যদি তোমার কোন অপরাধ থাকে, তাহা আমি ক্ষমা করিলাম। তুমি

ব্রজমোহন ঘোষালের আত্মীয় হইলে বোধ হয় ক্ষমা করিতে পারিতাম না। আগামী সালে তোমায় বড় আড়ঙ্গের কর্ম্ম দিব। তুমি আট মাস কম্ম করিয়া চার মাস আমার হুজুরে হাজির হইবে। রিটেল গোলার নমক চালানি, যাহা ব্রজমোহনের ছিল, তাহা তোমাকে দিলাম; ইহাতে বৎসরে দেড় হাজার টাকা কিফাত পাইবা।'

* * *

ইতিমধ্যে মেদিনীপুরের কালেক্টরি তহবিল তছরুপাৎ হইল। খাজাঞ্চিকে বরতরফ করিয়া কালেক্টার ইষ্টেনীফোরত সাহেব, গঙ্গাপ্রসাদ গোঁসাইকে খাজাঞ্চিগিরি কর্ম্ম দিলেন। কিন্তু গভর্মেণ্ট ইষ্টেনীফোরত সাহেবকে সরাইলেন। তাঁহার স্থানে ডনেলি সাহেব আসিলেন রিকেট সাহেব কমিশনর হইলেন। তিনি ডনেলি সাহেবকে আদেশ করিলেন, 'গোঁসাইকে তাড়াইয়া যাদবচন্দ্রকে সেই স্থানে নিযুক্ত করিবে।'

১৮৩৬ ও ১৮৩৭ সাল দুই বৎসর খাজাঞ্চিগিরি কর্ম্ম করিলাম। ডনেলি সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া হেড কেরাণি জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমার নাম

কমিশনরের নিকট পাঠাইয়া ডিপুটি কালেক্টরির পদের জন্য রিকমেণ্ড করিলেন। রিকেট সাহেব জগবন্ধুর নাম কাটিয়া আমাকে রিকমেণ্ড করিলেন। ১৮৩৮ সালে জানুয়ারি মাহায় আমি ডিপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলাম।

১৮৪৯ সাল পর্য্যন্ত মেদিনীপুর, হিজলি ও অন্যান্য স্থানে বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। ১৮৪৯ সালের নভেম্বর মাহায় চব্বিশ পরগণায় বদলি হইলাম। একবার খাড়িজুড়ি বন্দোবস্ত করিতে গিয়া বনের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। বাঘ ১০। ১২ হাত তফাতে ছিল। সঙ্গের লোক চাৎকার করাতে বাঘ পলাইয়া গেল।

১৮৫২ সালে বর্দ্ধমানে বদলি হই। ১৮৫৬ সালে হুগলি আসি। তথা হইতে আবার বর্দ্ধমান। অবশেষে ১৮৫৭ সালে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করি। পেন্‌সন্ হয় মাসিক ২২৫৲ টাকা। এক্ষণে আমার চারিটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়—ডিপুটি কলেক্টর; মধ্যম শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র—ডিপুটি কলেক্টর, পরে রেজিষ্ট্রার; তৃতীয় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র—ডিপুটি কলেক্টার; চতুর্থ শ্রীপূর্ণচন্দ্র

রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত আছেন। ৪২ বৎসর চাক্‌রী করি। এক্ষণে আমার বয়স ৭৯ বৎসর।

ইতি ১৫ই বৈশাখ ১২৭৯ সাল। *"

পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১২৮৭ সালের ১৩ই মাঘ কৃষ্ণ-দশমী তিথিতে। তখন তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর।

* আত্মজীবনীর কোনও কোনও অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি স্থানে স্থানে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। সকল শব্দ পড়িতে না পারায় এরূপ করিতে হইয়াছে।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(৯০ পৃ.)

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

[৪০ পৃঃ]

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[৪০ পৃঃ]

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম।

—*:•:*—

বঙ্কিমচন্দ্র ১৭৬১ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন—খৃষ্টাব্দ ১৮৩৮। সময়—১৩ই আষাঢ়—ইংরাজী ২৭ এ জুন—রাত্রি ৯টা। আষাঢ় মাসের রজনী হইলেও আকাশ তখন নির্ম্মল ও মেঘশূন্য ছিল। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের জননী প্রসব-বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা কাহাকেও তিনি বলেন নাই। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে প্রসববেদনা বাড়িয়া উঠিল। তখন সূতিকাগার পরিষ্কৃত হইল, এবং ধাত্রী ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক ছুটিল। পাড়াগেঁয়ে ধাই, Midwifery পড়ে নাই—শিক্ষাও পায় নাই। মহাঅস্ত্র বাকারির ছাল লইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। এবং পরীক্ষান্তে মহাগম্ভীর বদনে বলিলেন, "আজ রাতে প্রসব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

তা'র ক্ষণকাল পরেই সূতিকাগার প্রকম্পিত করিয়া সহসা শঙ্খধ্বনি হইল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে

ভাবিয়া অনেকে সূতিকাগারে ছুটিয়া আসিলেন। আমার পিতামহও আসিলেন। সকলে দেখিলেন, পুত্র তখনও ভূমিষ্ঠ হয় নাই। তবে এ শঙ্খধ্বনি কেন? কে শাঁক বাজাইল? অনুসন্ধানে জানিলেন, সূতিকাগারে শাঁক নাই। পিতামহ হর্ষ-কণ্টকিত দেহে আকাশ পানে চাহিয়া উদ্দেশে ভগবানকে প্রণাম করিলেন। তাহার ক্ষণকাল পরেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সেই সন্তান পূজ্যপাদ বঙ্কিমচন্দ্র।*

* এই ঘটনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও কোনও আত্মীয়ের নিকট সম্প্রতি শুনিয়াছি—পূর্ব্বে শুনি নাই। সুতরাং প্রকৃত কি না, নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না।

শৈশব।

—**—

বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশবের কথা বড় একটা কেহ অবগত নহে। যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা একে একে অপসৃত হইয়াছেন। যাহা শুনা যায়, তাহা জনশ্রুতি-মাত্র। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কোনও কথা বলিতে সাহস হয় না। দুই চারিটা কথা যাহা আমি বাল্যকালে গুরুজনদের নিকট শুনিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পঞ্চম বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের 'হাতে খড়ি' হয়। 'খড়ি' দিলেন, আমাদের কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য। বালক বঙ্কিম কম্পিত হস্তে খড়ি উঠাইয়া লইয়া বঙ্গসাহিত্য গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শিক্ষার ভার গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের হস্তে অর্পিত হইল। গুরুমহাশয়ের নাম রামপ্রাণ সরকার। বঙ্কিমচন্দ্র এই সরকার মহাশয়ের চিত্র কিয়ৎপরিমাণে অঙ্কিত করিতে ছাড়েন নাই।—"গ্রাম্য কথা"র গুরুমহাশয়কে যখন ভোদার সুপণ্ডিতা জননীর সঙ্গে 'ভূত' শব্দ

লইয়া মহাকলহে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিলাম, তখন রামপ্রাণ সরকারের কথা স্বতঃই আমার মনে পড়িল।

গুরুমহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য; যাদবচন্দ্রের অনুগ্রহের উপর তাঁহার জীবিকা কতকটা নির্ভর করিত। পাঠশালা-গৃহ যাদবচন্দ্রের সম্পত্তি। পাঠশালায় ইতরজাতীয় বালকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে গৃহীত হইলেন।

'ক' 'খ' পড়াইতে গিয়া গুরুমহাশয় সবিস্ময়ে দেখিলেন, পূর্ব্বজন্মান্তরীণ স্মৃতি, অথবা অসামান্য প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহায্য করিতেছে। যে বর্ণমালার পরিচয় করিতে সাধারণ বালকের পনর দিন, এক মাস লাগে, সে বর্ণমালা বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে পঞ্চম বৎসর বয়সে শিক্ষা করিলেন। তখন 'বর্ণপরিচয়' ছিল না, 'শিশুবোধক' ছিল। 'অলস' 'অবশ' তুল্য বাক্যাবলী শিক্ষা করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুই এক দণ্ড মাত্র লাগিয়াছিল। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র নাকি তৎকালে গুরুমহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'অলস' 'অবশ' পড়িলেই 'বশম' 'পশম' পড়া হইল—পাতা উল্টাইয়া যান।" গুরুমহাশয়, 'গীত' 'কীট' আরম্ভ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র

চতুল্য কথাগুলি মুহূর্ত্তমধ্যে শিক্ষা করিয়া নূতন কিছু শিখিতে চাহিলেন। গুরুমহাশয় সাতিশয় ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়াছিলেন, "বাবা বঙ্কিম, এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলে আর কতদিন তোমায় পড়াইব?"

তা'র আট নয় মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে পিতার কাছে চলিয়া গেলেন। যাদবচন্দ্র তখন তথায় ডিপুটী কালেক্টার।

বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে আসিয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ইংরাজি বর্ণমালা শিক্ষা করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কয় দিন লাগিয়াছিল, তাহা জানি না। তবে তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দেব্‌রা থানার জনৈক ভদ্রলোক বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, একদা স্কুলের সম্মুখস্থ পথ দিয়া জনৈক খোট্টা বানর লইয়া ডুগ্‌ডুগি বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বানর দেখিতে ছুটিলেন। তৎপ্রতি নিমেষশূন্য নয়নে চাহিতে চাহিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,

"বাঁদরটাকে এনে, আমাদের কেলাসে ভর্ত্তি ক'রে দিলে হয়; দেখি, ইংরাজি শিখ্‌তে পারে কি না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বাঁদর দেখিয়া যখন ক্লাসে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি শিক্ষক কর্ত্তৃক পাঠে অমনোযোগিতার জন্য বিশেষরূপে ভৎর্সিত হইলেন। তিরস্কৃত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যুদ্দীপ্তনয়নে শিক্ষকের পানে একবার চাহিলেন, তা'র পর তাঁহার স্থানে বসিয়া এক সপ্তাহের পাঠ এক ঘণ্টায় আয়ত্ত করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বালকসুলভ কোনও ক্রীড়ার অনুরাগী ছিলেন না। বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া বালকেরা কতরকম ছুটাছুটি খেলা করিত, কত রকম ব্যায়াম করিত; বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সে সব খেলায় অভিনেতৃরূপে, অথবা দর্শক-রূপে যোগদান করিতেন না। তিনি তাস খেলিতে ভালবাসিতেন; বিদ্যালয়ের ছুটীর পর দুই তিন জন সমবয়স্ক বালক লইয়া তিনি তাস খেলিতে বসিতেন। এ অভ্যাস মেদিনীপুরে ছিল, এবং হুগলি কলেজে বিদ্যাধ্যয়নকালেও ছিল। যাদবচন্দ্র ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর হইতে চব্বিশ পরগণায় বদলি হইয়া আসেন, এবং তিন বৎসর পরে

বৰ্দ্ধমানে বদলি হ'ন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে আর পিতার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে ঘুরিতে হয় নাই। তিনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কাটালপাড়ায় থাকিয়া হুগলি কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন।

বিবাহ।

—:*:—

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স একাদশ বৎসর। কাঁটালপাড়ার নিকট নারায়ণপুর গ্রামে একটি পরম-সৌন্দর্য্যময়ী বালিকা ছিল। তাহার পিতার নাম নবকুমার চক্রবর্ত্তী। বালিকার বয়স তখন পঞ্চম বৎসর মাত্র। পঞ্চম বৎসর হইলেও বালিকার রূপের বিভা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ পঞ্চমবর্ষীয় বালিকার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

বালিকার যখন নয় বৎসর বয়স, তখন তিনি একদিন অনবধানপ্রযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের দুই একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়িয়া পুতুলের শয্যা রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দেখিলেন, তাঁহার শোণিত-তুল্য পাণ্ডু-লিপি এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, “তুমি আমার জামা কাপড় ছিঁড়িয়া

পুতুলকে শোয়ালে না কেন?” সঙ্কুচিতা বালিকা উত্তর করিল, “আমি কাগজগুলা আটা দিয়ে জুড়ে দিচ্ছি।” বঙ্কিমচন্দ্র অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, “জোড়া কাগজ লইয়া আমি গলায় গাঁথিব? তুমি কি মনে কর, আমি আর লিখিতে পারি না! আজই লিখিব।”

বঙ্কিমচন্দ্র নির্জ্জন কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিলেন। সে দিন রাত্রি এক প্রহরের পূর্ব্বে কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার হাতে কাগজের তাড়া। সেই তাড়া অনুতপ্তা বালিকার অঙ্কে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, “দেখ, লিখেছি কি না।” জানি না, বঙ্কিমচন্দ্র সে দিন কি লিখিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাইশ বৎসরে পদার্পণ করেন, তখন তিনি বিপত্নীক হ’ন। ফুটিবার আগেই ফুল শুকাইয়া গেল।—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমা পত্নী ষোড়শ বৎসর বয়সে জ্বররোগে দেহত্যাগ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন যশোহরে। সেখানে নির্জ্জনে বসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষকে তিনি অশ্রুজল

দেখান নাই। বুঝি গর্ব্ব অন্তরায় হইত। তিনি বাল্যকালে
লিখিয়াছিলেন,—

> "—মনে করি কাঁদিব না রব অহঙ্কারে।
> আপনি নয়ন তবু ঝরে ধারে ধারে॥
> গোপনে কাঁদিবে প্রাণ সকলি আঁধার।
> জীবন একই স্রোতে চলিবে আমার।"

—তিনি যৌবনে বা প্রৌঢ়ে মানুষকে কখনও নয়নাশ্রু
দেখান নাই বলিয়া আমার মনে হয়।

মাসের পর মাস গড়াইয়া চলিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে
দ্বিতীয়বার বিবাহিত করিতে কেহ সমর্থ হইল না।
পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র অনেক বুঝাইয়াছিলেন,
কিন্তু কেহই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারেন নাই;
অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতাপিতা তাঁহাকে ডাকিয়া
বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের
আদেশ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ন্যায়
মাতা পিতাকে ভক্তি করিতে আমি বড় একটা কাহাকেও
দেখি নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন মাতা পিতার আদেশ শিরোধার্য্য
করিয়া বিবাহে সম্মত হইলেন, তখন চারিদিকে পাত্রী

অনুসন্ধানের ঘটা পড়িয়া গেল। কয়েকজন ঘটক নিযুক্ত হইয়াছিল। সঞ্জীবচন্দ্র একটী সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বড়ই নিরাশ হইতে হইয়াছিল। ক'নে সুন্দরী বটে, কিন্তু তাহার গর্ব্ব অত্যধিক। সঞ্জীবচন্দ্র যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মামার বাড়ী কোথায়?" তখন সে ঠোট উল্টাইয়া বলিয়াছিল, "কে জানে বাপু কোথায়! আমি সেখানে কখন যাই না।" সঞ্জীবচন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তার পর পাত্রী অনুসন্ধানের জন্য বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। একখানা বাসোপযোগী বড় বোট ভাড়া করা হইল। স্থির হইল, সঞ্জীবচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র, নৌকা আরোহণে পাত্রী অনুসন্ধানার্থে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবেন। জানি না, কি মনে করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গী হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। মহাসমাদরে তাঁহাকে বজরায় গ্রহণ করা হইল।

তারানাথ অথবা তারাচাঁদ নামধেয় হালিসহর-নিবাসী জনৈক ভদ্রসন্তান, একটি পাত্রীর কথা লইয়া

কাঁটালপাড়ায় কয়েক দিন যাতায়াত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কেহই তাঁহার কথায় কাণ দেন নাই। অবশেষে যখন সাহিত্য-রথিত্রয় পাত্রী অনুসন্ধানে মহাড়ম্বর সহকারে যাত্রা করিলেন, তখন তারানাথ পূর্ব্বোক্ত পাত্রী দেখিবার জন্য তাঁহাদের হালিসহরে নামিতে অনুরোধ করিলেন। হালিসহর কাঁটালপাড়া হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। হালিসহরের সন্নিকটে বাঁশবেড়িয়া। আমার মনে হইতেছে, এই বাঁশবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু বাবুর শ্বশুরালয়। নৌকা-রোহীরা তারানাথের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া হালিসহর অতিক্রম করিয়া চলিলেন, এবং দীনবন্ধু বাবুর শ্বশুরালয়ে রাত্রিযাপন করিবার মানস করিলেন।

বাঁশবেড়িয়াতেও তারানাথ গিয়া উপস্থিত; এবং মেয়ে দেখিবার জন্য তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র সম্মত হইলেন; বলিলেন, "এত নিকটে যখন আসিয়াছি, তখন দেখিয়া গেলে ক্ষতি কি? অন্ততঃ তারানাথের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব।"

তিন জনে মেয়ে দেখিতে আসিলেন। মেয়ে

দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হইল। মেয়ে কিন্তু রুগ্ন, শীর্ণকায়—রোগশয্যা হইতে সম্প্রতি উঠিয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্র আদৌ মেয়ে পছন্দ করিলেন না। কিন্তু তাহাতে আসিয়া গেল না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "আমি ইঁহাকে বিবাহ করিব।"

বঙ্কিমচন্দ্র সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। বিপত্নীক হইবার আট মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। সেই মেয়ে—সেই স্ত্রী—বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা পত্নী আজও বর্ত্তমান।

ইংরাজি শিক্ষা।

—:*:—

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজি শিক্ষা মেদিনীপুর স্কুলে আরম্ভ হয়—প্রেসিডেন্সি কালেজে শেষ হয়। মধ্যকাল— আট নয় বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কালেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। সে সময় Entrance বা First Arts বা B. A. পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই। তখন Junior, Senior Scholarship পরীক্ষা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর হইতে আসিয়া একাদশ বৎসর বয়সে হুগলি কালেজের স্কুল বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন।

সেখানে তাঁহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও মেধা শক্তি শিক্ষকদের চিত্তাকর্ষণ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র যাহা একবার শুনিতেন তাহা শীঘ্র ভুলিতেন না। যে প্রকৃতির অঙ্ক একটা কষিয়াছেন, সে প্রকৃতির অঙ্ক আর তাঁহাকে কষিতে হইত না। তিনি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডীর ভিতর থাকিতে পারিতেন না। যখন বিদ্যালয়ে Keightly, Elphinstoneর ইতিহাস পড়ান হইতেছে, তখন তিনি Hume, Macaulayর ইতিহাস

পাঠ করিতেছেন। যখন ক্লাসে Rule of Three শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তখন তিনি Discount কষিতেছেন। এইরূপে তিনি সকল বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন।

শুধু অগ্রণী নয়, তিনি কোন বন্ধনের মধ্যে থাকিতে ভাল বাসিতেন না। বাল্যকালে বা কৈশোরে তিনি দীর্ঘকাল একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। পাঠে তন্ময় হইয়া বেশীক্ষণ একাসনে বসিয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। যৌবনে এ চাঞ্চল্য আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমার মনে হয়, এটা প্রতিভার চাঞ্চল্য। অনলরাশি পদতলে সঞ্চিত হইলে বসুধা যেমন ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠে, তেমনই সঞ্চিত শক্তি-রাশি যতক্ষণ না নির্গমন পথ খুঁজিয়া পায়, ততক্ষণ মহাশক্তিশালী ব্যক্তিকে অস্থির করিয়া তুলে। প্রৌঢ়েও বঙ্কিমচন্দ্রের চাঞ্চল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই; তবে কতকটা সংযত হইয়াছিল; এমন কি লিখিতে লিখিতে তিনি বহুবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেন—বহুবার গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতেন। শয্যায় বসিয়া থাকিলেও ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেন। কাছারিতে রাজ-কার্য্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার সময়ও তিনি প্রথম প্রথম

নিয়ত হস্তপদ সঞ্চালন করিতেন। ক্রমে এ ভাব তিরোহিত হইয়াছিল। বার্দ্ধক্যে এ চাঞ্চল্য বড় একটা দেখি নাই; তবে যেন শেষ পর্য্যন্ত কিছু কিছু ছিল বলিয়া মনে হয়।

স্কুলের নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাবলীর মধ্যে মন আবদ্ধ রাখিতে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই সমর্থ হইলেন না; তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। হুগলী কালেজের সুবৃহৎ লাইব্রেরি মন্থন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস, জীবনী, সাহিত্য, কাব্য পাঠ করিতে লাগিলেন। স্কুলের পাঠ্য পুস্তক কোথায় পড়িয়া রহিল; গৃহে বা বিদ্যালয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সে সকল পুস্তকের পানে ক্ষণেকের জন্যও চাহিয়া দেখিতেন না। তবে যখন বাৎসরিক পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ্য পুস্তক ঝাড়িয়া গুছাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা যাইত, বঙ্কিমচন্দ্র, সকল বালকের উপর স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাদের নিকট কৈশোরে পাঠশিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই এক্ষণে জীবিত নাই; ত্রিশ
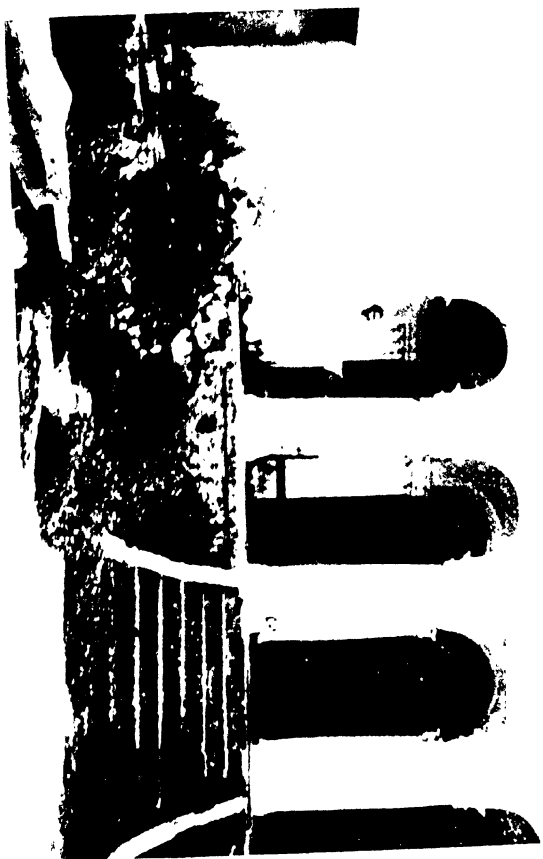
বৎসর পূর্ব্বেও কেহ জীবিত ছিলেন না বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী কালেজে আমার পঠদ্দশায় শুনিয়াছি। কোন শিক্ষক বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের তুল্য প্রতিভাবান্ ছাত্র; দ্বারকানাথ মিত্র ব্যতীত হুগলি কালেজে আর কেহ আসেন নাই। উভয়ের মধ্যে তুলনা করিয়া তিনি বলিতেন, "মেধাশক্তিতে দ্বারকানাথ শ্রেষ্ঠতর ছিলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকানাথের উপর যাইতেন।" আমরা মুখব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহাদের গল্প শুনিতাম। হুগলি কালেজ প্রায় পঁচাত্তর বর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র ছাত্র আসিল, গেল; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বারকানাথের তুল্য ছাত্র হুগলি কালেজে আর কখন আসেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৈশোর বড় সুখে কাটিয়াছিল। প্রাতে মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, নিশীথে সকল সময়ই তিনি পুস্তক লইয়া বিভোর থাকিতেন। তিনি এক সময়ে পরিণত বয়সে জনৈক সহপাঠীর নিকট বলিয়াছিলেন, "আমি পুস্তক পাঠে যত আনন্দ পাই, তত আনন্দ জগতে আর কিছুতেই পাই না।" যৌবনের শেষভাগে বহরমপুরে

অবস্থান কালে তিনি মুন্‌সেফ নফর বাবুর নিকট বলিয়াছিলেন, "পুস্তক লিখিয়া আমি যত আনন্দ পাই, তত আনন্দ আর কিছুতেই পাই না।"

অপরাহ্ণ টুকু বঙ্কিমচন্দ্র অন্য কাজের জন্য রাখিতেন। ছুটাছুটি অথবা ব্যায়াম করিতেন না। তিনি একটি বাগান করিয়াছিলেন; সেই বাগানে অপরাহ্ণ অতিবাহিত করিতেন। কোনও দিন খালের ধারে বেড়াইতে যাইতেন। কোনও দিন বা তাস খেলিতে বসিতেন।

বাগান খানি বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনার পাড়ের নীচে দশ পনর বিঘা জমির উপর তিনি এক উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। উদ্যানের নাম ছিল, ফুল-বাগান। বাগানের কিয়দংশ ভূমিতে ফুলগাছ ছিল; অবশিষ্টাংশ ফলের গাছে সমাচ্ছাদিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কালেজের উদ্যান হইতে ভাল ভাল গাছ আনিয়া 'ফুল বাগানে' স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন।

এই বাগানের মধ্যে অর্জ্জুনা দীঘীর তটে তিনি একখানি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গৃহটী ইষ্টক-নির্ম্মিত, লতাগুল্ম-সমাচ্ছাদিত। যেখানে গৃহ ছিল,

সেখানে এখন কয়েকখানি ইট পড়িয়া আছে; তদ্ব্যতীত সে মনোহর ফুল বাগানের—সে চারুদর্শন উদ্যান-বাটীর কোনও চিহ্ন নাই। আর চিহ্ন আছে, "কৃষ্ণকান্তের উইলে"; বারুণী পুষ্করিণীর বর্ণনা যখন পড়ি, তখনই আমার অর্জ্জুনা দীঘীর কথা মনে পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র এ উদ্যান ছাড়িয়া সময় সময় খালের ধারে বেড়াইতে যাইতেন। খাল, গঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শাখা মাত্র; ভাটপাড়া ও কাঁটালপাড়ার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া জলাভূমির মধ্যে দেহ সংগোপন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহ হইতে খাল বেশী দূর নয়,—অর্জ্জুনা দীঘীর কিছু দক্ষিণ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তার পথটি বড় দুর্গম, ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই দুর্গম পথ একাকী অতিক্রম করিয়া কখন কখন খালের ধারে সন্ধ্যার প্রাক্কালে লতাবিতান তলে বসিতেন।

বসিয়া কখন 'শস্যশ্যামল' প্রান্তর পানে চাহিয়া থাকিতেন, কখন 'স্তরপরম্পরাবিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদমালা-বিভূষিত' আকাশ পানে চাহিয়া থাকিতেন, কখন 'জ্যোৎস্না-প্রদীপ্ত সরোবরতুল্য স্থিরমূর্ত্তিতে' বসিয়া ক্ষুদ্র

বীচিমালার তরঙ্গভঙ্গ দেখিতেন। কখন কখন বিদ্যালয় হইতে ফিরিবার সময় খালের ভিতর নৌকা লইযা যাইতেন। তীরবর্ত্তী গাছ সকল ঝুঁকিয়া পড়িয়া নৌকার উপর একটা অবিচ্ছিন্ন খিলান নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত। সূর্য্যের আলোক তথায় অপরিস্ফুট। খালের দুই ধারের দৃশ্য কিছু কিছু ললিতায় আছে, কিন্তু এখানে বসিয়া বঙ্কিম-চন্দ্র কখন কবিতা লিখিতেন না।

কবিতা লিখিতেন গৃহে, কবিতা লিখিতেন ফুল-বাগানে। লিখিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। যখন ইচ্ছা হইত তখনই লিখিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই রাত্রি জাগিয়া লেখাপড়া করিতেন। শুনিয়াছি, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তিনি পুস্তক ফেলিয়া শয়ন করিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র কৈশোরে ও নবযৌবনে ক্ষীণ ও দুর্ব্বলকায় ছিলেন। দুর্ব্বল হইলেও তিনি সাহসী ছিলেন। শুধু সাহসী নয়; আমার মনে হয়, তিনি বাল্যকাল হইতে অদৃষ্টবাদী ছিলেন। খালের দুর্গম পথে সন্ধ্যার পর বড় একটা কেহ যাইতে সাহস করিত না, সর্প শৃগাল তথায় যথেষ্ট ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কোন কোন দিন এই

পথে নির্ভীক হৃদয়ে সন্ধ্যার পর একাকী গৃহে ফিরিতেন। তাঁহার এ সাহস গঙ্গাপার হইবার সময়ও দেখিয়াছি। বাল্যকালে একদিন অপরাহ্ণে হুগলি কালেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। সঙ্গে কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণ বাবু ও জনৈক দরিদ্র আত্মীয় ছিলেন। নৌকায় উঠিয়া দেখিলেন, আকাশের উত্তর প্রান্তে নিবিড় মেঘ। মেঘ দেখিয়া অনেকেই নৌকা খুলিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মাঝি মহেশ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, নৌকা ছাড়িব কি?"

বঙ্কিমচন্দ্র আকাশপানে নেত্রপাত করিয়া বলিলেন, 'ছাড়" ! আত্মীয়টি তখন সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল; বলিল, "না মহেশ, নৌকা ছেড় না—মেঘ উঠেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রতিবাদের কোনও উত্তর করিলেন না। মহেশ নৌকা ছাড়িয়া দিল।

আর একদিন প্রাতঃকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া হুগলি কালেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। বৈশাখ মাস। কালেজ সকালে বসিত। ফিরিতে বেলা সাড়ে দশটা, এগারটা হইত। বঙ্কিমচন্দ্র কোনও কোনও দিন গঙ্গা হইতে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেন। যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন

বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী যাইবার মানস করিলেন; তদভিপ্রায়ে মাঝিকে তেল আনিতে পাঠাইলেন। ঘাটের উপরেই কলুর ঘর। মাঝি তেল আনিতে গেল। নৌকায় দুই ভাই ছাড়া আর কেহ রহিল না। বড় বড় ঢেউ আসিয়া নৌকায় লাগিতেছিল। এমন সময় একজন দুর্ব্বৃত্ত চুপি চুপি আসিয়া খোঁটা হইতে নৌকার দড়ি খুলিয়া দিল। দুই ভাই অন্যমনস্ক ছিলেন; প্রথমে তাঁহারা কিছু বুঝিতে পারেন নাই। তার পর নৌকা যখন তীর ছাড়িয়া চলিল তখন তাঁহারা কিনারার পানে চাহিয়া দেখিলেন। যে দুর্ব্বৃত্ত এ কাজ করিয়াছিল, তাহার নাম আমার নিকট কেহ প্রকাশ করেন নাই। এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছি যে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ভদ্র সন্তান, এবং আজীবন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি হিংসাপরায়ণ ছিল। সে যাই হউক, নৌকা ক্রমে গভীরতর জলে গিয়া পড়িল; হালে বা দাঁড়ে মাঝি নাই। চারিদিক্ হইতে বড় বড় ঢেউ আসিয়া নৌকার উপর পড়িতে লাগিল। পূজনীয় পূর্ণচন্দ্র মহাভীত হইয়া পড়িলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ভয়ের লেশ নাই। নৌকা কেমন ঘুরিতেছিল, তিনি হাস্যবদনে তাহাই দেখিতেছিলেন। পূজ্যপাদ পূর্ণচন্দ্র

হাল ধরিতে জানিতেন ; তিনি হাল ধরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া তরঙ্গশিরে কর্ণধার হীন নৌকার উদ্দাম নর্ত্তন দেখিতে লাগিলেন। পরে অন্য নৌকা আসিয়া তাঁহাদের বিপন্মুক্ত করিল। এ বিপদেও তাঁহাকে ভীত বা বিচলিত হইতে দেখি নাই।

যৌবনে খুলনায় অবস্থান কালে তাঁহার সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়াছি। রূপসা নদীর মোহানা পার হইবার সময় একদা আকাশে মেঘাড়ম্বর করিল। বঙ্কিমচন্দ্র ভীত না হইয়া নৌকায় উঠিলেন। দীনবন্ধু বাবু ও জনৈক ওভারসিয়ার তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। সহযাত্রীরা মেঘ দেখিয়া নৌকায় উঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিষেধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের নিষেধ না শুনিয়া হাসিতে হাসিতে নৌকায় উঠিলেন ; এবং প্রবল ঝড়ের মধ্যে প্রশান্তচিত্তে গল্প করিতে করিতে মোহানা পার হইলেন। প্রৌঢ়ে—বহরমপুরে অবস্থান কালে—তাঁহার সাহস ও তেজের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এইরূপ দুর্ব্বল ক্ষীণকায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহস ও তেজ বরাবর দেখিয়া আসিয়াছি। আমার মনে হয়, এটা শুধু সাহস নয়, এটা অদৃষ্টের উপর নির্ভরতা।

বঙ্কিমচন্দ্র কখনও ঘোড়ায় চড়েন নাই। ভয়-প্রযুক্ত যে চড়েন নাই, এরূপ আমার মনে হয় না। একবার ঘোড়ায় চড়িয়া যদি ভয় পাইয়া দ্বিতীয়বার চড়িতে বিরত হইতেন, তাহা হইলে বুঝিতাম, তিনি ভীরু। আসল কথা, আমাদের গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় ঘোড়া আদৌ ছিল না। ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটের পরীক্ষাও তাঁহাকে দিতে হয় নাই। সুতরাং ঘোড়ায় চড়িবার সুযোগ বা প্রয়োজন তাঁহার কোন কালে উপস্থিত হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বড় পাহাড়ে কখন উঠিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু বিখ্যাত কুতব মিনারে একবার উঠিয়াছিলেন। উড়িষ্যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে যে উঠিয়াছিলেন, তাহা "সীতারাম" পড়িয়া কতকটা বুঝিতে পারি. পর্ব্বতারোহণ তাঁহার শক্তিতে কুলাইত না ; তাই বোধ হয় তিনি কখন উচ্চ পর্ব্বত-চূড়ে আরোহণ করেন নাই।

সাহিত্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলি কালেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন আরও দুইটি প্রতিভাবান্ যুবক বাঙ্গালার দুইটি সুবিখ্যাত কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। একজনের নাম দীনবন্ধু মিত্র, অপরের নাম দ্বারকানাথ অধিকারী। দীনবন্ধু বাবু কলিকাতা হিন্দু কালেজে পড়িতেন, দ্বারকানাথ কৃষ্ণনগর কালেজে পড়িতেন। দুই জনেই বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। দীনবন্ধু বাবু, বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা নয় বৎসরের বড়। দ্বারকানাথের বিশেষ কোনও পরিচয় জানি না।

এই তিনজন শক্তিশালী নবীন যুবকের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় না থাকিলেও সাহিত্যক্ষেত্রে সত্বর পরিচয় হইল। সে কথা ক্রমে বলিতেছি।

তখনকার দিনে সাহিত্যের অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই তখন সাহিত্য-সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন একমাত্র সম্রাট। তাঁহার একখানি কাগজ ছিল; তাহার নাম, "সম্বাদ প্রভাকর।" প্রভাকর

সংবাদ সাধুরঞ্জন	সাপ্তাহিক	সংবাদ পত্র।
রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ	ঐ	ঐ।
বর্দ্ধমান জ্ঞান-প্রদায়িনী	ঐ	ঐ।
সংবাদ বর্দ্ধমান	ঐ	ঐ।
সংবাদ জ্ঞানোদয়		ঐ।
কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা	ঐ	ঐ।
রসরাজ	অর্দ্ধ সাপ্তাহিক	ঐ।
নূতন সমাচার চন্দ্রিকা	ঐ	ঐ।
উপদেশক	মাসিক	ধর্ম্মপত্র।
সত্যার্ণব	মাসিক	ধর্ম্মপত্র।
বিবিধার্থ সংগ্রহ	মাসিক	নানা বিষয়ক।
ধর্ম্মরাজ	ঐ	ঐ।

এই সতর খানি কাগজ ১২৬০ সালের বৈশাখ মাসে বাঙ্গালা দেশে বিদ্যমান ছিল। এতৎ পূর্ব্বে ৭৬ খানি বাঙ্গালা কাগজ ছিল; তাহারা জলবুদ্বুদের মত উঠিয়া কালস্রোতে মিলাইয়া গিয়াছিল। আমি তাহাদের তালিকা দিয়া পাঠকদের আর জ্বালাতন করিলাম না।

এই শুধু বাঙ্গালার কথা। এতদ্ব্যতীত উর্দ্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত কাগজ ছিল। উল্লিখিত তালি-

কার উপর নির্ভর করিলে রিভিউয়ের হিসাবে অবিশ্বাস করিতে হয়। যে হিসাবটাই সত্য হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, তখনকার দিনে সংবাদপত্রের অবস্থা শোচনীয় ছিল। শোচনীয় হইলেও প্রভাকর সকলের উপর স্থান লইয়াছিল। এই শ্রেষ্ঠ কাগজ প্রভাকরে কিরূপ ভাবে পদ্য লেখা হইত, নিম্নে তাহার একটু পরিচয় দিলাম।—

জনৈক কবি লিখিলেন,—

পাপানল খর খর, জ্বলিতেছে গর গর
সর সর ওহে বন্ধুগণ।

গুপ্ত-কবি লিখিলেন,—

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর,
পরিমাণে ধন দানে গৌরব প্রচুর,
বাবা গৌরব প্রচুর।

পরে আবার লিখিলেন,—

দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়,
বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকার ময়,
বাবা অন্ধকার ময়॥

প্রভাকরে তখন অনেকেই কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রভাকর-সম্পাদক সেই ছাত্রমণ্ডলীর গুরু এবং উৎসাহদাতা ছিলেন। সকল ছাত্রের নাম করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা কিরূপ লিখিতেন তাহাও জানাইবার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু তিন জন ছাত্র লিখিত কাব্যের একটু পরিচয় দিব। তৎপূর্ব্বে গুরু ঈশ্বরচন্দ্র কিরূপ লিখিতেন, তাহা তাঁহার প্রভাকরের দুই তিন স্থান হইতে একটু একটু তুলিয়া দেখাইব।

১। প্রভাকর, ১২৬০ সাল, ১লা বৈশাখ।—

অম্বুদ অম্বর, গহন শিখর,
দৃষ্টি করি আমি যাহে।
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়,
বিরাজিত তুমি তাহে॥
পৃথিবী সলিল, অনল অনিল,
রবি শশী আর তারা।
নিয়ম তোমার, করিয়া প্রচার
পরিচয় দেয় তারা॥

২। প্রভাকর, ১৭৭৫ শকাব্দা, ৯ই জ্যৈষ্ঠ।—

ভাবি মনে, স্নিগ্ধ হ'ব, সরোবরে নেয়ে।
পুকুরে ফুকুরে কাঁদি, জল নাহি পেয়ে॥
সে জলে অনল জ্বলে পুড়ে হই খাক্।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি, গায়ে মেখে পাঁক॥

৩। প্রভাকর, ১২৬১ সাল, ১লা জ্যৈষ্ঠ।—

কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায়।
জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায়॥
আর কত ঘুরিবে হে মেলায় মেলায়।
এই বেলা পথ দেখ বেলায় বেলায়॥
ভুতে করে হাড় গুড়া, ঢেলায় ঢেলায়।
জান না কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায়॥

৪। প্রভাকর, ১লা শ্রাবণ ১২৬০ সাল,—

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীসর্ব্বাধ্যক্ষ পরমেশ্বর পরম পিতা ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।

সেবকানুসেবক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য প্রণামা শত সহস্র নিবেদঞ্চ বিশেষঃ—মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ প্রণত সেবকের সমস্তই মঙ্গল জানিবেন। বিশেষতঃ আপনার মঙ্গলেই আমারদিগের মঙ্গল। ইত্যাদি।

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বারকানাথের কবিতার একটু পরিচয় দিব।

১। এখন যেরূপ সাজ, প্রকাশিতে হয় লাজ,
তথাপি শুনহ গুণধাম।
ধর্ম্ম ত্রিলোকের স্বামী, তাঁহার তনয়া আমি,
জগতে সতীত্ব মর্ম নাম॥

২। একদিন স্বপ্নে কোন অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এক পরম সুন্দরী নারী জীর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক মস্তকে হস্ত দিয়া বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্টা আছেন, এবং তাঁহার নয়ন যুগল অজস্র অশ্রু নিস্রাব করিতেছে।

৩। কেবল তোমার পাশ, যাইয়া করিবে বাস,
সদা এই অভিলাষ, মন মোর করে লো,
ভবে নাই হেন জন, বিনে তুমি প্রাণধন,
আর করে নিবেদন, তাপিত অন্তরে লো॥

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী দীনবন্ধু বাবুর রচনা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব।

১। কৃষকেরা বীজ বপনাগ্রে কর্ষণ দ্বারা এবং বারি সেচনে ভূমিকে কোমল করে, কেহ তাহাতে

প্রস্তর বা অঙ্গার ক্ষেপণ করে না। সদুপদেশ বীজ-স্বরূপ, জনগণের মনঃক্ষেত্রে রূপিত হয়, সুতরাং উপদেশরূপ বীজ বপনাগ্রে মিষ্ট কথা রূপ বারি বপন-দ্বারা মনঃক্ষেত্র নরম করা আবশ্যক।

২। জামাই ষষ্ঠী।

(যুবকের) তাপ বাড়ে, কমে যত, তপনের তাপ।
রবি অস্ত দেরি দেখে, বাড়িছে বিলাপ॥
—মনের আঁধার যায়, দেখিয়া আঁধার।
নিশিতে প্রণয় নীরে দিবেন সাঁতার॥
—মেয়ের মায়ের মন, রসে টল মল।
ভূষণে ভূষিতা করে তনয়া কমল॥
জামাই সোহাগি টিপ্ ভালে কেটে দিল।
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল॥
—নির্জ্জনে নলিনী সনে, কর প্রেমালাপ।
আমরা থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ॥
—কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে ভাবিয়া না পাই।
পরিণত বিধুমুখ তাহে কথা নাই॥
রূপের গৌরবে বুঝি হ'য়ে গরবিনী।
প্রেমাধীন জনে, দুখ দেও আদরিণী॥

—তব সনে প্রণয়িনী এই দরশন।
বল দেখি আমি তব হই কোন্ জন॥
রসিকা বালিকা করে সরস উত্তর।
তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর॥
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুরঝির ঠাঁই।
তুমি প্রাণ হও মোর ঠাকুর জামাই॥
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল।
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল॥*

* এই "জামাই ষষ্ঠী' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "জামাই ষষ্ঠী" যে সংখ্যক 'প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়, তাহা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, প্রভাকর হইতে আর তাহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। দুই চারি বৎসর পরে হয়ত প্রভাকরও আর পাওয়া যাইবে না। আমি তাঁহার বাল্য রচনাগুলি রক্ষা করিবার মানসে নিম্নে একে একে উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা বিরক্তি বোধ করিবেন, তাঁহারা যেন এ অংশটুকু বাদ দিয়া যান। আমি কোনও রচনার পরিবর্ত্তন বা বর্ণশুদ্ধি না করিয়া যথাযথ প্রকাশ করিলাম।

প্রথম কবিতা।

শিশির বর্ণনা ছলে স্ত্রী পতির কথোপকথন।

লঘুললিত।

স্ত্রী। "হইয়াছে জল, বড়ই শীতল,

ছুঁইলে বিকল হইতে হয়।

আগে যে জীবন, জুড়াত জীবন,

সে বন এখন, নাহিক সয়॥

সুখদ মলয়, হইলেক লয়,
এলো হিমালয় শীতল অতি।
পদার্থ সকল, সমীরণ জল,
কি কাল শীতল হলো সম্প্রতি ॥
সকল শীতল, করয় বিকল,
কিন্তু অপরূপ, নিরখি তায়।
সমস্ত শীতল, প্রতপ্ত কেবল,
বোধ হয় প্রাণ, তোমার গায় ॥

পতি। মোরে নিরন্তর, তব নেত্রকর,
পাবক প্রখর, দাহন করে।
মম দেহোপর, বহ্নি খর তর,
তাই উষ্ণভাব এ দেহে ধরে ॥

স্ত্রী। কেন বিভাবরী, দীর্ঘ দেহ ধরি,
ধরায় বিরহি রহে এখন।
ত্যজিতে ধরণী, না চায় রজনী,
বল গুণমণি, শুনি কারণ ॥

পতি। নয়ন মুদিয়ে, থাক ঘুমাইয়ে
তখনি হেরিয়ে, তোমার মুখ

সতী বিভাবরী, শশীজ্ঞান করি,
হেরি প্রাণপতি পায় কি সুখ ॥
আছে যতক্ষণ, শশী প্রাণ ধন,
পাইয়ে রতন না ত্যজে তায়।
তাই বিভাবরী, পতি বোধ করি,
বহুক্ষণ ধরি রয় ধরায় ॥
কিন্তু লো যেক্ষণে নিদ্রার ভঞ্জনে,
চাহিয়া নয়নে, উঠ প্রভাতে।
হেরি ও নয়নে নিশা ভাবি মনে,
কুমুদী সতিনী, পালায় তাতে ॥

স্ত্রী। অতিশয় ঘন, বল কি কারণ,
নিরখি প্রভাতে এ কুজ্ঝটিকা।
কেন সব হয়, ধূমাকার ময়,
কি ধূম হইল, ধরা ব্যাপিকা ॥

পতি। এবে আর দর্প, না করে কন্দর্প,
তাহার কারণ শুন ইহায়।
তব নিকেতন, আসিল মদন,
আপন যাতন, দিতে তোমায় ॥

কিন্তু তব স্থান হরের সমান,
যে বহ্নি নয়নে সে ভস্ম হয়।
তাই ধনি তার, শক্তি সে প্রকার,
অবনীতে আর নাহিক রয়॥

ভস্ম হইল শর, তার কলেবর,
প্রবল দহনে, দাহন হয়।
দাহনের ধূম, ব্যাপে নভোভূম
ভ্রমেতে কুআশা, লোকে কয়॥

স্ত্রী। কি কারণ প্রাণ, শঙ্কর সমান,
মোরে কর জ্ঞান উন্মত্ত প্রায়।
কোথায় কি মম, হের হর সম,
তোমারে বুঝাতে হইল দায়॥

পতি। বিবেচনা করি, তোরে প্রাণেশ্বরী,
বলি ত্রিপুররি, প্রলাপ নয়।
হরের ভূষণ, সব বিলক্ষণ,
তোমার অঙ্গেতে, তুলনা হয়॥
হরের ইন্দুর, সমান সীন্দুর
শিরেলো তোমার, কি শোভা পায়।

সদা শিরোপরি,　　আছ সিঁথিপরি,
　তিন ধারা ধরি, গঙ্গা খেলায়॥

স্কন্ধ শিরোপরে,　　হরের বিহরে,
　সদা ফণিবরে,ভীষণ অতি।
বেণী ফণিবর,　　তব নিরন্তর,
　স্কন্ধ শিরোপর,বয় তেমতি॥

যেই মত হরে,　　কণ্ঠে বিষধরে,
　তেমতি গরল তুমিও ধর।
কিন্তু কণ্ঠে নয়,　　কিছু অধো রয়,
　বিশেষিয়া বলি, ও পয়োধর॥

যে গরল হরে,　　কণ্ঠ দেশে ধরে
　কাছে না এলে সে নাশিতে নারে।
কিন্তু পয়োধরে　　যে গরল ধরে,
　দূর হইতেই মানবে মারে॥

যদি বল প্রিয়ে,　　কণ্ঠে না রহিয়ে,
　অধোভাগে কেন, গরল রয়।
কণ্ঠে রৈলে তবে,　　মুখ কাছে রবে
　মুধামৃতে বিষ নিস্তেজ হয়॥

স্ত্রী। কি মূঢ় মানব কোলে নিজ সব,
দুরন্ত পাবক, লয়েছে টানি।
বিশ্বাসঘাতক, সেই সে পাবক,
করিবে দহন তাহা না জানি॥

পতি। দোষ দাও পরে, নিজ দোষাপরে,
দৃষ্টি নাহি কর কি অপরূপ।
আপনি কেমনে আপন নয়নে,
রেখেছো অনল, কহ স্বরূপ॥

স্ত্রী। তবে প্রেমাধার রাখিব না আর,
নয়নে আমার, কাল অনল।
দেখ প্রাণ ধন, মুদিয়া নয়ন,
তাড়াই আগুন, শয্যায় চল॥

পতি। যদি তুমি প্রাণ নাহি দিলে স্থান,
কোথায় অনল যাইবে আর।
পৃথিবীতে আর স্থান নাহি তার,
তাহে বলী শীত বিপক্ষ তার॥
যাইবে যথায়, যাইবে তথায়,
দুরন্ত শাত্রব, শীত ধাইয়ে।

এমতে ধরায় নাহি স্থান পায়,
শেষে জলে যায়, রয় ডুবিয়ে॥
তাই দেখ কাল, নিশা শেষকাল,
উঠে জল হোতে ধূমের রাশি।
তাই বলি প্রিয়ে, স্থান না পাইয়ে,
হয়েছে অনল সলিল রাশি॥

দ্বিতীয় কবিতা।

বর্ষা বর্ণনা ছলে দম্পতির রসালাপ।

কামিনী

ত্রিপদী।

দেখি কি হে ভয়ঙ্কর, গরজিয়ে গর গর,
ব্যাপিল গগনে নবঘনে।
নবনীল নিরুপম, অর্দ্ধ-তমস্বিনী সম,
দুলিছে দামিনী ক্ষণে ক্ষণে॥
ঘন ঘোর গরজনে, বিদারে গগনে বনে,
তীক্ষ্ণ তীর সম বরিষয়।
বল বল প্রাণনাথ, কেন কেন অকস্মাৎ,
গরজন বরিষণ হয়॥

পতি

প্রাণেশ্বরী শুন শুন, যে কারণে পুন পুন,
গরজন বরিষণ হয়।
অতিশয় দম্ভ ভরে, বর্ষা আগমন করে,
সঙ্গে সব সহচর হয়॥
ভেবেছিল যুবরাজ, নাহি ভুবনের মাঝ,
রূপবান তাহার সমান।
সে গর্ব্ব হইল নাশ, হারিল তোমার পাশ,
বরষার পূর্ণ অপমান॥
নিবিড় চাঁচর তব, তাহে কাদম্বিনী নব,
রূপেতে কি রূপে তোমা সমা।
'তব মৃদু হাসি স্থানে, পদে পদে অপমানে
দুখিনী দামিনী নিরুপমা॥
মরি কি সুন্দর পশি, মুদিতা সুন্দরাবসি,
কোমল কমল কলি জলে।
তাহে পরাজিত করে, তোমার হৃদয়োপরে,
নব কুচ কলিকা যুগলে॥
বর্ষার পল্লব নব, তা' হ'তে অধর তব,
শতগুণে সুকোমল শোভা।

নদ নদী জলে টলে, তা' হ'তে যৌবন জলে,
তব দেহ কিবা মনোলোভা॥

আর দেখো করিবরে, বরষায় মত্ত করে
দ্বিগুণ উন্মত্ত তুমি কর।
হেরিয়া তোমার করে, হেরি তব পয়োধরে
চিৎকার করিছে কুঞ্জর॥

যে দাড়িম্ব বরষার, সকল গর্ব্বের সার,
তব কুচে পূর্ণ মান নাশ।
মেঘে রবি ঢাকা ঢাকি, কেশেতে সিন্দূর মাখি,
তাহা হতে লাবণ্য প্রকাশ॥

পদে পদে এইরূপে, হারিয়া তোমার রূপে,
কত অপমান বরষার।
এত দুখ সহিবারে, বরষা নাহিক পারে,
রোদন করিছে অনিবার॥

সে রোদনে অনিবার, পড়ে বৃষ্টি ধার তার,
ঘননাদ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
তাই প্রাণ নিরন্তর, বরষিছে জলধর,
তাই মেঘ গর্জ্জে অনিবারে॥

কামিনী

বিঘোর নীরদোপরে কত হাব ভাব ভরে,
চপলা চঞ্চলা চমকায়।
কেন কেন ক্ষণপ্রভা, ক্ষণেক প্রকাশি প্রভা,
ক্ষণপরে বারিদে লুকায়॥

পতি

গিরির শিখর পরে, থাকে যত জলধরে,
দেখিল তোমার কুচগিরি।
পরিহরি সে ভূধরে, রৈতে পয়োধর পরে,
আসিতে লাগিল ধিরি ধিরি॥
এসে দেখে হায় হায়, নীলবস্ত্র মেঘে তায়,
বসিয়াছে মনের পুলকে।
ক্রুদ্ধে মেঘ নাহি রক্ষে, অগ্নি শিখে উঠে চক্ষে
তাই সখি বিদ্যুৎ চমকে॥
জলধর ক্রোধ মনে, আদেশি[illegible] সমীরণে,
উড়াইতে বুকের বসন।
তাই বায়ু আসে ডেকে, যাবে বুক খুলে রেখে,
ধরিয়ে রাখিবে কতক্ষণ॥

কামিনী

আগে ছিল সুধাকর, বিমল কোমল কর
নিরমল গগন মণ্ডলে।
এখন কেন গো শশী, গগন মণ্ডলে পশি
ঢাকিয়াছে জলদ সকলে॥

পতি

তোমার সমান হতে, শশধর বিধিমতে,
বাঞ্ছা করে আকাশে থাকিয়া।
দেখে তুমি কর মান, জেনে সে মানের মান,
মুখ মেঘ বসনে ঢাকিয়া॥
বৃষ্টি ধারে ধারে ধীরে, ফেলিয়া অশ্রুর নীরে,
ম্লানমুখে করিয়াছে মান।
হলো কিনা তোমা মত, দেখিবারে অবিরত,
ক্ষণে ক্ষণে হয় দৃশ্যমান॥

কামিনী

খর কর ধরি রবি, মেঘে ঢাকা দেখে ছবি
নহে প্রকাশিত প্রভাকর।
না হেরি পতির মুখে, নয়ন মুদিয়া দুখে,
কমলিনী কতই কাতর॥

সাধে কি সকলে কয়, পুরুষ পরস-ময়,
কি কঠিন তাদের হৃদয়।
এই দেখ দিনকর, কেমন নিদয়ান্তর,
রমণীরে কেমন নির্দ্দয়॥
কমলিনী যাঁর তরে, সতত বিলাপ করে,
মৌনমুখী মুদিত নয়ন।
দয়া করি সেও তায়, ফিরিয়া নাহিক চায়,
সদা করে প্রাণে জ্বালাতন॥

পতি

গুণমণি দিনমণি, কেন লো রমণি মণি,
না বুঝিয়ে দোষ দিবাকরে।
নলিনীর পেয়ে দোষ, দিনেশ করেছে রোষ,
তার সনে দেখা নাহি করে॥
তব মুখে কমলিনী, কোলে ধরে বিনোদিনী,
সিন্দুরের বিন্দু প্রভাকর।
কোলে অস্ত দিবাকর, কমলিনী কলেবর,
দেখিয়ে মলিন দিনেশ ঈশ্বর॥
মনে জানিলেন দড়, নলিনী অসতী বড়,
নাহি করে মুখ দরশন।

গুণমণি, দিনমণি, কেন লো রমণি মণি,
না জানিয়া দোষলো তপন॥

কামিনী

এ সময় মধুকরে, কি জ্বালায় জ্বলে মরে,
মুদিত সকল শতদল।
যদি কোন পদ্ম পায়, অপ্রফুল্ল দেখে তায়,
মধুহীন যতন বিফল॥
ভ্রমে ভ্রমি সে ভ্রমরে, যদ্যপি গমন করে,
অন্য কমলিনী নিকেতন।
মৃণাল কণ্টকে লেগে, ছিন্নঅঙ্গ হয়ে রেগে,
অন্য পদ্মে করিলে গমন॥
অপ্রকাশ্য সেই কলি, বাতাস লাগিল বলি,
হেলে দুলে ফেরে তাহা হতে।
নিরুপায় নিরাশায়, শেষে মধুকর যায়,
কলিকা উপরে স্থান লতে॥

পতি

আ মরিলো এ অধীনে, সেই মত একদিনে,
ঘটাইলে প্রাণের রতন।

তুমি লো কমলবন, ছয় পদ্ম সুশোভন,
কর পদ হৃদয় বদন ॥
যবে প্রিয়ে মান করি, মজাইলে প্রাণেশ্বরি,
লক্ষ্য করি মুখ শতদল।
গিয়ে তার মধুপানে, তৃপ্ত করিবারে প্রাণে,
অপ্রফুল্ল দেখি সে কমল ॥
তাহাতে বঞ্চিলে ছলে, যাই কর শতদলে,
হাতে ধরে ঘুচাইতে মান।
গহনা মৃণালে কাঁটা, অঙ্গুলি যাইল কাটা,
পরে পাদ পদ পড়ি প্রাণ ॥
হেলে দুলে সে কমলে, লুটাইয়া শতদলে,
ফিরাইলে প্রাণের ললনা।
শেষে যাই কলিপরে, শোভিছে যা' হৃদি পরে,
দূরে গেল মানের ছলনা।

কামিনী

বল বল তারাচয়, কেন কেন ম্লান হয়,
ছিল কিবা শোভাকর কর।

পতি

যামিনী কামিনী সতী, লইয়ে যামিনী পতি,
বিলাসিছে মেঘের ভিতর ॥

পাছে বা দেখিতে পাই, নিভাইয়ে দেছে তাই,
আকাশের দীপ তারাগণে।
তবুও তো নিরন্তর, স্থির নহে শশধর,
উঁকি মেরে দেখে ক্ষণে ক্ষণে॥

কামিনী

পেয়ে নীর ধর নীর, পূর্ণাকার ধরে নীর,
আহা মরি শোভা তার কত।
জলপূর্ণ সরোবর, যদ্যপিহে মোহকর,
কমলিনী বিনে শোভা হত॥

পতি

নালো প্রাণ মনোহর, দেখিতেছি সরোবর,
সরোজিনী সহ শোভা পায়।
ধরণী সলিলাবৃতা, যেন সরো সুশোভিতা,
তুমি প্রাণ কমলিনী তায়॥

কামিনী

এর বা কারণ কিবা, এই বরষার দিবা,
দীর্ঘ দেহ করেছে ধারণ।
কমে গেছে তমস্বিনী, তবু তাহে বিষাদিনী
বিরহিনী বিনোদিনী-গণ॥

পতি

সুমেরু শিখর আর, ও কুচ ভূধরাকার,
এ তিন শিখর নিরখিয়ে।
হইল তপন ব্যস্ত, কোন্‌টায় যাবে অস্ত,
তাই ভাবে বিলম্ব করিয়া॥
ঘন ঘোর ঘন অতি, ঢেকেছে যামিনী পতি,
বিরহিনী বিষাদে রজনী।
কেঁদে কেঁদে বুক ফাটি, দুখে দেহ করে মাটি,
যৌবনেই মরে গেল ধনী॥

তৃতীয় কবিতা।

দূরদেশ গমনের বিদায়।

পতি

ললিত।

একবার দেখি আর, দেখি দেখি এইবার,
দেখি ফিরে বিধুমুখ, দেখি আঁখি ভরি-গো।
আজিকার নিশী ভোরে, লয়ে যাবে কোথা মোরে,
কতদিন তোমা বিনে রহিব কি করি-গো॥

বিদরে বিদরে বুক, হেরিব না বিধুমুখ,
বিধুমুখ হাসি ভরা, রব স্বপ্নে স্মরি-লো।
আসি কিনা আসি ফিরে, হেরি কিনা প্রেয়সীরে,
জানিনে জানিনে কিছু, বাঁচি কিনা মরি-লো॥
হেরি কিনা হেরি আর, শশিমুখে ফিরে বার,
জনমের মত তাই হেরি ভাল করি-লো।
সেই শেষ সুখ মরি, বিধি বুঝি লয় হরি,
বুঝি নিশি পোহাইল, তাই হৃদে ডরি লো॥
কি শুনি কি শুনি ধনি, কুহু কুহু করি ধ্বনি,
হৃদয়ে শিহরি মরি, যে শুনেছি কাণে-রে।
বুঝেছি বুঝেছি মরি, পোহাইল বিভাবরী,
পোহাইল পোহাইল, মন তা না মানে-রে॥
হা রজনি একবার, রহ রহ রহ আর,
একবার চাহি আমি, চন্দ্রমুখী পানে-রে।
মুখ পানে চেয়ে রই, নয়নে নয়নে হই,
একবার দীর্ঘশ্বাস, সলিল নয়নে-রে॥
একবার মরি মরি, হৃদয়ে হৃদয়ে করি,
অধরে অধর ধরি, জুড়াইব প্রাণে রে।
ধরি হৃদি হৃদি পরে, কত দিবসের তরে,

জনমের মত কিনা, কে জানে কে জানে রে ॥
নালো নালো মিছে বলি, যামিনী গিয়াছে চলি,
ফিরিবে না, ফিরিবে না, ফিরিবার নয়-লো।
ওই দেখ নীল নিশী, মৃদু আলো সনে মিশি,
করিছে বিঘোর আলো, চারিদিগ্ ময়-লো ॥
অসীম আকাশে পশি, নাহি রবি নাহি শশী,
গগনে নিভেছে যেন, যত তারাচয়-লো।
কি বলি গগনোপরে, একাকি মধুর করে,
প্রভাতের সুখতারা, কিবা শোভা হয় লো ॥
এখনি আকাশোপর, প্রকাশিবে প্রভাকর,
এখনি যাইব কোথা, ভেবে হৃদি দয়-লো
আসিলো আসিলো প্রিয়ে, আসিলো বিদায় নিযে,
চলিলাম কতদূরে কি কপালে রয় লো ॥
যথা যাব তথা রব, প্রেমডোরে বাঁধা তব,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা, প্রণয়েরি পাশে লো।
স্বপনে নয়নে মনে, হেরিব সে চন্দ্রাননে,
হেরিব সে বিধুমুখ, মৃদু মৃদু হাসে-লো ॥
তোমা চিন্তা সর্ব্বক্ষণে, শয়নে স্বপনে মনে,
এক আশে রবে প্রাণ, ফিরে দেখা আশে-লো।

মুখ শশী হলে হারা, একা প্রভাতের তারা,
হবে মোর অন্ধকার, হৃদয় আকাশে-লো॥

স্ত্রী

ত্রিপদী।

কেন অরে বিভাবরি, পোহাইল মরি মরি,
পোহাইল দিবারে যাতনা।
কেন রে যামিনী ভাগে, স্বপ্নে জানিবার আগে,
কেন কেন মরণ হলো না॥
জেনেছি জেনেছি আগে, যখন যামিনী ভাগে
হৃদি মোর হইল চঞ্চল।
তখনি জেনেছি মনে, পাইব প্রাণেরি জনে
যাবে মোর যা আছে সকল॥
তখনি ভেবেছি মনে, কেন কেন কি কারণে
হৃদি মোর চঞ্চল বিকল।
কেন রে অস্থির হিয়া, ক্ষণে উঠি শিহরিয়া,
কেঁদে কেঁদে উঠিছে কেবল॥
প্রাণনাথ হৃদি পরে, হৃদি পরশিলে পরে,
অস্থির হৃদয় হব স্থির।

স্বর্গসুখ সম হিয়ে, তদুপরে হৃদি দিয়ে,
কত সুখে ঘুমাই গভীর ॥
মরি মরি সে প্রকারে, যাইতে পাবনা আর,
নিদ্রা তব হৃদির উপর।
হৃদিপরে হৃদি দিয়ে, পয়োধরে পরশিয়ে,
জুড়াব না কাতর অন্তর ॥

সেখানে যতেক জ্বালা, নাহি করে ঝালাপালা,
শুধু যত সুখের স্বপন।
আর কি মধুরাকার, হেরিব না ফিরে বার,
শশধর সমান বদন ॥
নয়নে নয়নে করি, অধর অধরোপরি,
করিব না কি আর চুম্বন।
আর কিহে করে করে, মিলাব না পরস্পরে,
স্কন্ধে কর করিয়ে ধারণ ॥

নাহে নাহে সুখকাল, হয়েছে অতীত।
বিরহ বারিধি মাঝে, হয়েছি পতিত ॥
জানি জানি সেই জ্বালা, অহরহ ঝালাপালা,
করিবে আমারে মনে মনে।

না দেখে প্রিয়ের মুখ, একেলা দাহিবে বুক,
মানাগুণে গোপনে গোপনে ॥
শুধু প্রাণনাথ আশা, রবে এক হৃদে আশা,
শপ্রবল সয়নে স্বপনে।
আসা দিন অনুরাগী, রব প্রাণে তার লাগী,
শুধু সেই দিন আসামনে ॥
যেন যবে বিভাবরী, তমসা বসন পরি,
শশধর না করে প্রকাশ।
যদ্যপি তাহারোপরে, ভয়ঙ্কর জলধরে,
তাহা সহ ঢাকয়ে আকাশ ॥
নিবিড় তিমিরময়, শুধু দরশন হয়,
শশী তারা নাহিক আকাশে।
শুধু ভেদি জলধর, যদি হয় ক্ষীণ কর,
এক তারা একাকী বিকাসে ॥
তেমতি আমার বুকে, অন্ধকার দুখে দুখে,
গেছে যত আশা যত সুখ।
শুধু প্রাণনাথ আসা, তারি প্রাণভরা আশা,
একাকী বিহরে মোর বুক ॥

সে মুখ বাসর কবে, বল বল কবে হবে,
কবে হবে ফিরে দরশন।
করি তাহা জপমালা, ভুলিব বিরহ জ্বালা,
যদি পারি ভুলিতে রতন।

পতি

চৌপদী।

যদি দেহে প্রাণ ধরি, আসিবহে ত্বরা করি,
তোরে ফেলে প্রাণ মরি, রহেনা লো রহেনা।
অন্তরে প্রণয় ডোরে, যে দৃঢ় গেঁথেছ মোরে,
প্রাণেতে ত্যজিতে তোরে, সহেনা লো সহে না।
কিন্তুলো তরুণ করে, প্রকাশিল প্রভাকরে,
আর কথা পরস্পরে কহেনা লো কহে না।
তবে যাই সুনয়নি, যাইলো হৃদয় মণি,
যাই কিন্তু পদ ধনি, বহেনা লো বহে না।

চতুর্থ কবিতা।

চন্দ্রদূত।

রূপক। ত্রিপদী।

ত্রিযাম যামিনী যায়, আমরি কি শোভা তায়,
নিরখি নির্ম্মল নদী তীরে।

নিরমল নিলাকাশ, সীমা বিনা সুপ্রকাশ,
মাঝে হেরি মধুর শশিরে ॥
যেন কোন নববালা, পাইয়া বিরহ জ্বালা,
মলিনতা মধুর বদনে।
গগন গহন বনে, মনোদুখে মরি মনে,
ভ্রমিতেছে গজেশ গমনে ॥
সেই রূপ মনোহর, রূপ ধরি শশধর,
আলো করে ধরণী আকাশ।
গগনের যত তারা, হইয়াছে কর হারা,
অল্প তারা আকাশ প্রকাশ ॥
মাঝে মাঝে শশধরে, ঢাকে ক্ষীণ জলধরে,
মরি যেন নাথ দরশনে।
যাহ গুরুজন মাঝে, মোহিনী মহিলা লাজে,
ঢাকা দেয় বদন বসনে ॥
চন্দ্রিকা বসন পরা, গভীর নিশীতে ধরা,
মোহ মন্ত্রে যেন নিদ্রা যায়।
ঘোর স্তব্ধ ত্রিভুবন, দেখিয়া চাহিছে মন,
আরাধিতে অচিন্ত্য স্রষ্টায় ॥

শুধু হয় শব্দ তায়, পরশি নিকুঞ্জ গায়,
চলিছে সমীর মৃদু স্বরে।
পূর্ণ নদী স্থির নীরে, শুধু শব্দ ধীরে ধীরে,
মধুর মলয় মন্দ করে॥
আহা মরি মরি কিরে, এমন নদীর তীরে,
কেরে শত শোভা ধরি বসি।
বুঝি এ বিরহ লাগী, প্রণয়িণী অনুরাগী
যুবক জনেক যেন শশী॥
তৃণের কুসুম কুঞ্জ, ললিত লতিকা পুঞ্জ,
ঘেরি তারে বারি ধারে রয়।
যেমন মলিন শশী, মলিন বদনে বসি,
দীর্ঘশ্বাসে বিদরে হৃদয়॥
আঁখি হতে বারে বারে, ধারা বহে ধারে ধারে,
তাহাতে কতই শোভা ধরে।
যেন সে নয়ন জলে শশী পশি ছায়া ছলে,
চুম্বন গণ্ডেতে তার করে॥
নিরখি নয়ন ভরি, মধুর চন্দ্রমাপরি,
শেষে শশী সম্বোধিয়া কয়।

আরে মনোহর শশী, গগন মণ্ডলে পশি,
পার যেতে ত্রিভুবন ময়॥
তাই বলি শশধর, আমার বচন ধর,
যাও সেই মোহিনীর কাছে।
যার তরে আশা পথে, আরোহিয়া মনোরথে,
আগে মোর পরাণ গিয়াছে॥

পয়ার।

কিন্তু কি হেরি তোর, হৃদয় মাঝায়।
কিরে সে কালীর রেখা, লেখা দেখা যায়॥
বুঝি মম মনোরমা, ভাবিয়া আমায়।
আসিবার কথা লিখে, দেছে তোর গায়॥
নারে আর কেন মজি, মিছার স্বপনে।
জানি ভাল ভাবে না সে, অনুগত জনে॥

ত্রিপদী।

বুঝি মোর দুখে দুখী, নাহি দেখি বিধুমুখী,
বুঝি চাঁদ করেছ রোদন।
হৃদয়েরি রেখা চয়, আঁখি ধারা চিহ্ন রয়,
ও যে নহে কলঙ্ক কখন॥

বুঝি তারি দেখা তরে, আকাশ রোদন করে,
তারারূপ সহস্র নয়নে।
নীহার নয়ন ধারা, ফেলিছে যতেক তারা,
শতশত বিন্দু বরিষণে॥
তাই বলি নিশাপতি, রতনে যতনে অতি,
ঝটিতি করহে দরশন।
এই ভাষা কহ গিয়ে, আশা বিনে ফাটে হিয়ে,
তার লাগি মলো একজন।

পয়ার।

শশি হে বসিয়ে আর, বিলম্ব না কর।
এমন অচল কেন, রও শশধর॥
বুঝেছি বুঝি হে তব, যেই ভাব মনে।
যে কারণে যেতে নারো, নারী নিকেতনে॥
মোহিনীর মুখরূপ, করি দরশন।
কত লাজ কত জ্বালা, পেয়েছ তখন॥
তত আর নাহি দুখ, তার অদর্শনে।
সুখেতে আকাশ মাঝে, প্রকাশ আপনে॥
সাধেতে সাধিতে বাদ, আপনার প্রতি।
যাবে না যামিনী নাথ, যথায় যুবতী॥

ইহা যদি নিশানাথ, না মান আপনি।
আদি অন্ত জানি আমি বলিব এখনি ॥

চৌপদী।

ললনা লপনে লাজ, পেয়ে মানে দ্বিজরাজ,
লুকালে মেঘের মাঝ, ঘোমটা ধরিয়া রে।
এই কথা মূঢ়ে কয়, তাই অমানিশা হয়,
কেহ কহে তাহা নয়, গিয়াছে মরিয়া রে॥
মহিলার মুখাকারে, অভিমানে আপনারে,
একেবারে নাশিবারে, গমন করিয়া রে।
মহেশ ললাট স্থলে, ধিকি ধিকি বহ্নি জ্বলে,
ঝাঁপ দিলে সে অনলে, পরাণ হরিয়া রে॥
বিমল বারাধি জলে, ডুবেছিলে কেহ বলে,
মূঢ়ে বলে বারি তলে, ছায়া সে পড়িয়া রে॥
ভয় এই পাছে তায় কামিনী তথায় যায়,
ছিল কম্পমান কায়, সলিলে লড়িয়া রে॥
পুরেতে জানিয়া ভাল, করেছে বিরহ কাল,
কামিনী বদন কাল, তাই ফিরে আইলে।
ফিরে এলে সিন্ধু হতে, বলে নর শতে শতে,
যে তুমি এমনি মতে, সমুদ্রে জন্মাইলে॥

বিধুমুখ মহিলার, দেখ নাহি ফিরে বার,
নাহি দেখি শোভা তার, আজ্ঞা না পাইলে।
যেতে বলি যতবার, তত কর অস্বীকার,
বুঝেছি কারণ তার, জ্বালা পাবে যাইলে॥

পয়ার।

নাহি ডর শশধর, ধর হে বচন।
চরণে শরণ তার, করিও গ্রহণ॥
প্রমদার পদতলে, পড়ি নিরন্তর।
তোমার সদৃশ আছে দশ শশধর॥
বিশেষত পদে যদি, না পড় প্রথমে।
মুখের সম্মুখে কথা কহ যদি ভ্রমে॥
তখনি ঘটিবে কুহু, যেন নিশাকর।
ললনা ললাটে আছে সিন্দুর ভাস্কর॥

ত্রিপদী।

তাহে যদি বল তবে, কেন দিন-পতি রবে;
ললনার ললাট উপর।
প্রেয়সীর পদদ্বয়, সদা কিবা শোভা হয়,
যুগল কমল মনোহর॥

নখর নিকর তায়, শশি সম শোভা পায়,
কমলের কোলে শশধর।
ক্রোধে রক্ত দিবা-পতি, জানিল অসতী অতি,
পদরূপা নলিনী নিকর॥
ঠেকে শিখে নারীরীতে, আর পদ্ম আগুলিতে,
বদন কমল কামিনীর।
সিন্দুর বিন্দুর রূপ, নারী মুখে অপরূপ,
দিনেশ বসিল হ'য়ে স্থির॥
যদি বল কি প্রকারে, চিনিবে তুমি হে তারে,
দেখ নাই আগেতো সে জনে।
জান যদি আপনার, কুমুদিনী প্রেমাধার,
তারে তবে চিনিবে নয়নে॥

চৌপদী।

যাও যাও সুধাকর, কেন হে বিলম্ব কর,
একবার শশধর, যাও যাও যাও রে।
প্রাণের প্রেয়সী পাশে, বল গিয়ে যদি আসে,
ধরিব পরাণ আশে, বধিও না তাও রে॥
রহ রহ এই স্থলে, অহরহ কোন ছলে,
যেও না হে অস্তাচলে, এই ভিক্ষা দাও রে।

মোহিনীর মুখ তোরে, জ্ঞান করি প্রেম ডোরে,
বাঁধিয়া বাঁচাব মোরে, যেওনা কোথাও রে॥
মনে হয় সে রজনী, যখন রমণী মণি,
অধরে অধরে ধনী, ধ'রিল আমায় রে।
সে কি এই নদী তীরে, এই সে নিকুঞ্জ কিরে,
তোরি করে কলঙ্কী রে, দে'খেছি কি তায় রে॥
হা নিকুঞ্জ মনোহর, হা মধুর শশধর,
হে তটিনী স্থিরতর, ধরি সবে পায় রে।
ফিরে দেখা একবার, মোহিনী মধুরাকার,
একবার দেখা আর, হৃদি ফেটে যায় রে।
ফিরে দরশন করি, তটিনীর তটোপরি,
চম্পকের শাখা ধরি, আমা পানে চায় রে।
কি শুনি কি শুনি মরি, মোহন স্বরেতে করি,
কেরে মোর নাম ধরি, ডাকিল কোথায় রে॥
বুঝি মোর প্রাণেশ্বরী, এহো অনুগতে স্মরি,
রাখি গে হৃদয়োপরি, আঁখি আঁখি করি রে।
নারে মিছে কেন আর, স্বপ্ন দেখে বারে বার,
মজি সুখে মিছে কার, যাতনায় মরি রে॥
নাহিক কপাল তার, প্রাণেশ্বরী পাইবার,

এত আশা অভাগার, সম্বরি সম্বরি রে।
যত সুখ আশা আর, সব করি পরিহার,
শেষ আসা আশা সার, তা কিসে পাসরি রে॥
যদিও জানিরে মনে, পাইব না প্রিয়জনে,
গোপনেতে প্রাণপণে, তবু আশা ধরি রে।
যদ্যপি স্বপ্নে বা ভ্রমে, ছায়া সুখে কোন ক্রমে,
পাই যদি প্রিয়তমে, হৃদয় ভিতরি রে॥
দারুণ বিধির বিধি, চেতনে হরিল নিধি,
জ্বালা জ্বালাইল বিধি, মরি মরি মরি রে।
কিন্তু আশা পাছে পাছে, তাই চাঁদ তোর কাছে,
যেতে বলি যথা আছে, আমার সুন্দরী রে॥ *

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে কিরূপ গদ্য রচনা করিতেন, তাহা জানিতে লোকের কৌতূহল জন্মিতে পারে আমি নিম্নে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়-মানা শম্প সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত

* এই কবিতা চারিটিতে যে সকল ভুল দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশ ভুল মুদ্রাঙ্কণের বলিয়া আমার মনে হয়।

মূঢ় মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিন্দূপম জীবনে চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না, যে সে সব উৎসব শব হইলে কি হইবে এবং পরমনিধি প্রিয় পিতা পরাৎপরের প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব করে, বিবেচনা করে না যে তাঁহার সম্পীপে উত্তরকালে কি উত্তর করিবে। কদাপিও মূঢ় মানবমণ্ডলী মনোমধ্যে মুহূর্ত্তেকও বিবেচনা করে না যে তাহারা কি অনিত্য পদার্থ প্রযত্ন পুরঃসর প্রতিপালন করিতেছে। এখন যে দেহ ধূলিকণা পতনে পাষাণ প্রহার প্রায় বোধ হয়, আশু সেই দেহ শ্বসমূহের করাল পদাঘাতে বিদীর্ণ হইবেক। এখন যাহার রাজীব রাজী বিরাজিত শয্যাতেও নিদ্রা হয় না, জীবনান্তে সে ধূলি কর্দ্দম অস্থিকণাকীর্ণ লক্ষ লক্ষ রক্ষো, যক্ষ, ভূত প্রেতাদির বাসস্থান শ্মশানে চিরনিদ্রিত হইবেক। এবং যে অঙ্গ কোমল কমল স্পর্শনে বিশীর্ণ হয় সে অঙ্গে গৃধিনী চঞ্চু আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবেক। যে বদনেন্দু শত শত শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে,

সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত মৃন্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অম্বুরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রসনা পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। যে নাসিকা স্থলে চন্দনও বন্দনা পায় না, সে নাসিকা দুর্গন্ধ কীটাদি এবং গলিত শব মাংসের ঘ্রাণ গ্রহণে বাধ্য হইবেক, যে শ্রবণ কামিনী কাকলী শ্রবণে সন্তোষ প্রাপ্ত হয় না, সে শ্রবণ শিবাগণের চীৎকার শ্রবণ করণে বাধ্য হইবেক, দিবাকর কর প্রকাশে মধুকর নিকর যে করে কমলিনী ভ্রমে মকরন্দ লোভে ভ্রমিত সে কর কদর্য্য কীট নিকরে ব্যাপ্ত হইবেক। যে পদ কখন বিপদ্ গ্রস্থ হয় নাই, এবং যে পদ কখন সম্পদ সংরক্ষণেও ধূলি সহ সাক্ষাৎ করে নাই, সে পদ স্বপদ পরিত্যাগ পুরঃসর ধূলি হইয়া যাইবেক। ধরাবাসিদিগের এই ধারা দর্শনে অশ্রুধারা ধারে ধারে ধারণ হয়, অতএব হে মানবগণ অনিত্য যত্নে ক্ষান্ত হও।” *

* বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে এই গদ্য-প্রবন্ধ লিখিত ও প্রকাশিত হয়। ইহা তাঁহার প্রথম গদ্য-রচনা।

এই রচনার নিম্নে প্রভাকর-সম্পাদক একটু টীকা কাটিলেন। তিনি লিখিলেন,—

"ইঁহার লিপি নৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন এবং অক্ষর গুলীন স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।"

কবির লড়াই।

—:০:—

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় বাঙ্গালায় কবি, হাফ্ আখ্ড়াই ও পাঁচালীর বড়ই প্রাধান্য। রাম বসু, হরুঠাকুর, ভোলানাথ, যজ্ঞেশ্বরী, কৃষ্ণকমল তখন লোকান্তরে গমন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি লুপ্ত হয় নাই; দাশরথি রায়ও তখন জীবিত। দাড়া-কবিরা একদিন বাঙ্গালা মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাব, তখনকার কবিদিগের রচনার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলি এতদ্বিষয়ে জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনিও ছড়া ও গান বাঁধিতেন। এক পক্ষ, অপর পক্ষকে গালি দিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা করিত। দীনবন্ধু বাবু, দ্বারকানাথ অধিকারী ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এইরূপ কবির লড়াই চলিত। আমি নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এ যুদ্ধে যোগদান করিতেন না। তবু দ্বারকানাথ তাঁহাকে চট্টো কবি বলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই; দীনবন্ধু বাবুকে সহুরে কবি

নাম দিয়া পাঁচালী সাজাইয়াছেন। দীনবন্ধু বাবু পাণ্টা গাহিয়া দ্বারকানাথকে বুনো কবি নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

দ্বারকানাথ লিখিলেন ;—

পয়ার।

শহুরে কবি।

আমার কশুর কিছু নাই গতবারে।
কথায় কথায় কটু কহিয়াছি তারে॥
সে যদি মানুষ হয় জ্ঞান থাকে তার,
আমার সহিত রণ করিত না আর॥

চট্টো।

তাই তাই তাই বটে, অতি সুখ ময়।
এমন কবিতা আর হইবার নয়॥
ভাগ্যে তুমি বেঁচে আছ, তাই ভাই মোরা।
কবিতা দেখিতে পাই মূর্খ মন চোরা॥
কিন্তু কবিবর আমি, তার ঠাঁই ঠাঁই।
তব মনোগত কটু, ভাব বুঝি নাই॥
কৃপা করি কহ শ্বীয়, সরল স্বভাবে।
"শাখায় কুরঙ্গ" তুমি বলেছ কি ভাবে॥

শহুরে।

হা হা ভাই বুঝিতে পারনি, এই গাল।
এর ভাব ঠিক যেন পাড়াগেঁয়ে ডাল॥
শাখায় কুরঙ্গ আমি, এভাবে লোয়েছি।
কৌশল করিয়া মিত্র, বানর বোলেছি॥
আর এক ঠাঁই দেখ, করি অনুমান।
কহিয়াছি তারে আমি, বীর হনুমান॥
বুক চিরে রাম লিখে, কে বেঁধেছে ঋণে।
রামচন্দ্র, দীনবন্ধু, হনুমান বিনে॥

চট্টো।

জান কেন অধিকারী, কবিতা মাঝারে।
মোরে আদি কবি বলে, দ্বিতীয় তোমারে॥

* * *

তোমার সহিত কভু, না পারিবে বুনো।
তার চেয়ে তুমি ভাই বুদ্ধি ধর দুনো॥

* * *

শহুরে।

বুনোরে যদ্যপি আমি বলি কুবচন।
তাহাতে ঈশ্বর রুষ্ট হবেনা কখন॥

কারণ ভূলোক মাঝে ইহা জানে কে না।
ঈশ্বর আমার কাছে চিরকাল কেনা॥

তার পর দ্বারকানাথ কবিতা ছাড়িয়া গদ্যে ধরিলেন, "হে মিত্র, বারম্বার এরূপ চিত্র করিয়া আর স্বীয় কালেজের সুখ্যাতি বিস্তার করিবেন না।" ইত্যাদি।

কিছু দিন বাদে কবিবর দীনবন্ধু উত্তর করিলেন, "আমাদিগের বুনো কবিটি * * * চপল। দ্বারিক বাবু, আর একটি অনুরোধ, এই শ্লোকটি পড়িবেন,—

দিব্যং চূত ফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দম পানীয়ং ভেকো মক মকায়তে॥

* * *

বুনো কবির গালাগালি মনে না করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলাম, কারণ গালাগালির সহিত উপদেশ থাকিলে উপদেশের মহত্ত্ব যায় না, নীচ লোকে যদি মুদ্রা দান করে তবে কি মুদ্রার মূল্য কম হয়? নারিকেলের মালাস্থ অমৃত পান করিলেও অমর হওয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহার গালাগালির উত্তর না দিয়া তাঁহার সদুপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার মন্দ কথায় রাগান্ধ হইয়া

যদ্যপি সৎকথা না শুনি তবে shakespeare আমাকে বলিবেন,—"you are one of those that will not serve God if the devil bid you."

১২৫৯ সালের ২রা চৈত্রের প্রভাকরে বিঘোষিত হইল,—"হিন্দুকালেজের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, হুগলি কালেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ অধিকারী এই ছাত্রত্রয়ের বিরচিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত তিনটি প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকল রচনার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ও সংশোধন না করিয়া অবিকল প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমারদিগের সহযোগীগণ এবং গুণগ্রাহক গ্রাহকগণ বিশেষাভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া যাঁহার রচনা যে রূপে ও যে ভাবে উৎকৃষ্ট বোধ হইবেক, তাঁহাকে সেইরূপে সেই ভাবে পুরস্কৃত করিবেন। আমরা এ বিষয়ে অগ্রে কোন কথাই উল্লেখ করিব না।"

প্রথমে দীনবন্ধু বাবুর "দম্পতি-প্রণয়" নামে এক দীর্ঘ কবিতা প্রভাকরে মুদ্রিত হইল। তার পর দ্বারকানাথের

গদ্য কাব্য সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ প্রকাশিত হইল। সর্ব্বশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হইল। এ যুদ্ধে, এ পরীক্ষায় দ্বারকানাথকে শ্রেষ্ঠ আসন ও পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল।

হায়, সে দ্বারকানাথ আর নাই। যৌবন ফুটিবার পূর্ব্বেই "কৃষ্ণকান্তের উইল" বা "লীলাবতী"র তুল্য পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বেই তিনি সহযোগীদের ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ বৎসর।

[রচনা।]

উপরে যে সকল কাব্যের পরিচয় দিয়াছি, তাহার ভূরিভাগ বঙ্কিমচন্দ্রের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হইয়াছে; ষোড়শ বৎসরেও কিছু হইয়াছে। কোন কোন ভাব ঋতুসংহার হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; তবু বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত কাব্যনিচয়ে যে কবিত্ব, যে ভাবের

সৌন্দর্য্য স্থানে স্থানে দেখাইয়াছেন, তাহা পঞ্চদশ বৎসর বয়সে কয় জন লোক পারিয়াছেন?

আর এক কথা। উপরের কবিতাগুলির ভাব প্রণিধান করিতে না পারিলে কাহারও তাহা ভাল লাগিবে না। কবিতাগুলি বালকের রচিত বটে, কিন্তু সে বালক বঙ্কিমচন্দ্র। কাব্যাংশের ভাব গভীর ও সুন্দর, বাক্যার্থ কঠিন ও জটিল। নিম্নে একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। প্রথম কবিতার প্রথম চরণে আছে—

হইয়াছে জল, বড়ই শীতল,
ছুঁইলে বিকল হইতে হয়।
আগে যে জীবন, জুড়াত জীবন,
সে বন এখন নাহিক সয়॥

এখন জীবন ও বন অর্থে জল। এ অর্থ না জানিলে ভাব হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই তরুণবয়স্ক কবি সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"বঙ্কিমচন্দ্রের বিরচিত কবিতার সুবঙ্কিম ভাব কৌশল সকল অতিশয় সন্তোষজনক, ইনি রূপক বর্ণনাস্থলে নায়ক নায়িকার কথোপকথন ছলে যে সমস্ত প্রগাঢ়ভাব ব্যক্ত

করেন তদ্দৃষ্টে সুপণ্ডিত ভাবুক মাত্রেই প্রীত হইয়া থাকেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রবীন সুরসিক জনের ন্যায় মন হইতে অতি আশ্চর্য্য নূতন নূতন ভাব সকল উদ্ভূত করিতেছেন। এ অংশে ইঁহার প্রশংসা বর্ণনে বর্ণাবলী বলহীনা, ফলে এই স্থলে একটি অনুরোধ এই যে, বঙ্কিম পদরচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাব গুলীন্ প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত শব্দে পদ বিন্যাস করিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেক।"

আমার ধারণা, এই সকল কবিতা-রচনার পর 'মানস' ও 'ললিতা' লিখিত হয়। যদি তাই হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের তখন অন্যূন যোড়শ বৎসর বয়স। উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল অপ্রকাশিত কাব্যনিচয় উদ্ধৃত করিয়াছি, তদপেক্ষা মানস ও ললিতা কোন কোন ব্যক্তির মতে উৎকৃষ্টতর হইতে পারে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই উভয় কাব্য বঙ্কিমচন্দ্রের অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সংশোধিত অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ললিতা সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে একদিন সন্ধ্যার সময় খালের ধার হইতে

কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ বহিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। তখন আকাশ নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন। গৃহে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ঝড় উঠিল। ঝড়ের বর্ণনা ললিতা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।—

গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাঁদ,
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর,
হুঙ্কারে গরজে প্রাণপণে॥
বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘ গায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্ত বন।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে,
বড় বড় মহীরুহগণ॥

এই স্তব্ধ বনে অন্ধকারে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। ঝড় বৃষ্টির ভয় নয়,—ভূতের ভয়। তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাঁথিতে ভূতের অনুসরণ করিতে দেখিয়াছি। এই ভয় বাল্যকালে কিছু বেশী থাকাই সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র এই জনশূন্য দুর্গম পথে যাইতে যাইতে প্রকৃতির যে ভাব চারি দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ ললিতায় অঙ্কিত করিয়াছেন। ললিতা কাব্যটিকে

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে ভৌতিক গল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অন্ধকারাবৃত নির্জ্জন পথে ভৌতিক বিভীষিকা মনোমধ্যে সঞ্জাত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পাত্রবিশেষে কার্য্য কারণের ফল ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কত জীব-হত্যা হইয়া আসিতেছে, জীবহত্যা দর্শনে কত লোকের হৃদয় কাঁদিয়া আসিতেছে; কিন্তু কয় জনের শোকোচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে গুরুগম্ভীর রবে ধ্বনিত হইয়াছে,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।"

পৃথিবীর আবহমান কাল হইতে কত আপেল, কত আম্র প্রভৃতি ফল বৃক্ষদেহ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু কয় জন লোক Law of Motion হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন? বিভীষিকায় অনেকেরই হৃদয় বিচলিত হয়, কিন্তু কয় জনের ভয়কম্পিত চিত্ত হইতে ললিতার সৃষ্টি হয়? অনেকেই কাপালিক সন্দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কয় জন কপালকুণ্ডলা লিখিয়াছেন?

ললিতায় স্থানে স্থানে বিদেশী ভাব দেখা যায়। মানসে তা' নাই; আছে শুধু সুপ্ত প্রতিভার অস্ফুট গর্জ্জন। অপ্রকাশিত কাব্যগুলি খাঁটী দেশী,—সৌন্দর্য্যময়, ভাব-

পূর্ণ। কিন্তু ভাষার জন্য, শব্দের জন্য বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে আকুলি-বিকুলি করিতে হইয়াছে। ভাবের সঙ্গে ভাষা পদক্ষেপ করিয়া যাইতে পারে নাই।

আর এক কথা; বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাব-কবি ঈশ্বর গুপ্তের নিকট কবিতা লিখিতে শিখিয়াও কখন তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-শিষ্য ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকাল হইতে একা দূরে বসিয়া, কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিয়া কাব্য ও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

হুগলি কালেজে শেষ কয়েক বৎসর।

—*—

বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কালেজে এক জন দেশ-বিশ্রুত শিক্ষকের সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। আমি যশস্বী ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বলিতেছি। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী

কালেজের হেডমাষ্টারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তৎ-পূর্ব্বে উক্ত বিদ্যালয়ে তৃতীয় ও দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতা মহেশচন্দ্র কলিকাতা হিন্দু কালেজে শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা—ঈশান ও মহেশ—বহু পূর্ব্বে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যশ,কীর্ত্তি আজও অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহারা দুই ভাই দুই কালেজে থাকিয়া যে দুই জন মহাপণ্ডিত গড়িয়া রাখিয়া ছিলেন, তাহা তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে চিরকাল পরিগণিত হইবে।

ঈশান বাবুর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি সাহিত্য শিখিয়াছিলেন। সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, কাঁটালপাড়া নিবাসী শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নিকট। পুঁথী বগলে করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় প্রতিদিন তাঁহার নিকট পড়িতে যাইতেন। চারি বৎসর ধরিয়া—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য পড়িয়াছিলেন। চারি বৎসরে দশ বৎসরের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রকে ষোড়শ বৎসর বয়সের পর হইতে প্রভাকরে পদ্য বা প্রবন্ধ লিখিতে দেখি নাই। আমি

শুনিয়াছি,* কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তুমি পদ্য না লিখিয়া গদ্য লিখিবে।"

এ উপদেশ কোন্ সময়ে দিয়াছিলেন, তাহা আমি অবগত নহি। যে সময়েই দিয়া থাকুন, বঙ্কিমচন্দ্র এ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। ইহা অনেকেই বিদিত আছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন গুপ্ত-কবির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কিন্তু ইহা অনেকে জানেন না, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে কাঁচড়াপাড়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহ একবার জন্মের মতন দেখিতে গিয়াছিলেন; সেখানে গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয়স্বজনের নিকট বসিয়া কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এতৎপূর্ব্বেও বঙ্কিমচন্দ্র, কবির সে আশ্রম দেখিতে—সে আশ্রমে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে একবার গিয়াছিলেন। তখন তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনী লিখিতেছিলেন। যিনি এমন করিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে পারেন—এমন করিয়া শ্রদ্ধা দেখাইতে পারেন, তিনি কত উচ্চে অধিষ্ঠিত।

এবার আমি একটি ক্ষুদ্র গল্প বলিব।—'মিউটিনী'র

* গুপ্ত-কবির দৌহিত্রের নিকট শুনিয়াছি।

সময়ের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও শেষ পরীক্ষা দিয়া হুগলী কালেজ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বয়স তখন ঊনবিংশতি বর্ষ মাত্র।

সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষ অশান্ত। বিদ্রোহ-বহ্নি বারাকপুর ও বহরমপুরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মান্দ্রাজ ও অযোধ্যা সমিধ্ সংগ্রহ করিতেছে; দিল্লী মশাল জ্বালিতেছে; কানপুর চাপাটি পাঠাইয়া শিশু ও রমণীর জন্য চিতা সজ্জিত করিতেছে।

বাঙ্গালী আগুন জ্বালাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—দূরে দাঁড়াইয়া পশ্চিম আকাশের গায় লাল চিত্র নিরীক্ষণ করিতেছে। মোগল আশা-উৎফুল্ল—মহারাষ্ট্র প্রতিহিংসা-পরায়ণ—বাঙ্গালী দর্শক।

বাঙ্গালী দর্শক, বাঙ্গালী আবার পথপ্রদর্শক; বাঙ্গালী সকল বিষয়ে অগ্রণী। বাঙ্গালীই ইংরাজের প্রথম দেওয়ান—বাঙ্গালীই ইংরাজের ফাঁসিকাষ্ঠে সকলের আগে ঝুলিয়াছে—বাঙ্গালীই সর্ব্বাগ্রে খ্রীষ্টান হইয়াছে—বাঙ্গালীই সকলের আগে বিলাত গিয়াছে। বাঙ্গালী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগুন প্রধূমিত করিয়াছে—বাঙ্গালী ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহবহ্নি জ্বালাইয়াছে—আবার

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের 'বয়কট' অনলেও ফুৎকার দিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, ভাল বা মন্দ সকল কার্য্যেই বাঙ্গালী পথপ্রদর্শক।

যখন সিপাহী-বিদ্রোহ চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিল, তখন চুঁচুড়ায় Martial Law জারি হইল। চুঁচুড়ায় সে সময় এক দল হাইল্যাণ্ডার সেনা থাকিত। এক্ষণে আর সেনা থাকে না, কিন্তু যে বৃহৎ অট্টালিকায় তাহারা বাস করিত, সে অট্টালিকা আজও আছে। এক্ষণে তাহা আদালত ও আফিসের কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই গোরানিবাসের নিম্নে গঙ্গা। তথায় একটি ঘাটও আছে; তাহাকে ব্যারাকের ঘাট বলে।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্রকে লইয়া এই ঘাটে আসিয়া নামিলেন। উদ্দেশ্য—থিয়েটার দর্শন। চুঁচুড়ার জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি একটি থিয়েটারের দল সংগঠিত করিয়াছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রকে এই দলে যোগ দিবার জন্য তিনি অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই সম্মত হ'ন নাই। অবশেষে সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া

কাঁটালপাড়ার অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ যুবা, কেহ প্রৌঢ়, কেহ বা বৃদ্ধ; কিন্তু সকলেই ভদ্র ও শিক্ষিত।

বঙ্কিমচন্দ্র একখানি স্বতন্ত্র নৌকায় ছোটভাইকে লইয়া আসিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ৩।৪ বৎসরের ছোট। ব্যারাকের ঘাট হইতে ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটী নিকট নহে; ঘণ্টা ঘাট হইতে নিকট। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যারাকের ঘাটে নামিলেন; কাঁটালপাড়ার অন্যান্য ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র নৌকায় আসিয়া ঘণ্টা ঘাটে নামিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য একটু ভ্রমণ। রাস্তা, গঙ্গার ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সুরম্য পথ অবলম্বন করিলেন। রাস্তার ধারে—গঙ্গার দিকে বাঁশের রেলিং; মাঝে মাঝে থাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই পথ বহিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমভিব্যাহারে চলিয়াছেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে তিনি দেখিলেন, কয়েক জন ইংরাজ সৈনিক-কর্ম্মচারী পথের ধারে ঘাসের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুই একটা কুকুরও ছিল। একটা কুকুর পূজনীয় পূর্ণচন্দ্রের পিছনে লাগিল। আমরা দেখিতে পাই, সংসারে আমরা যে জিনিসটাকে বা যে

মানুষটাকে যত ভয় করি, সে জিনিষটা বা মানুষটা আমাদের তত চাপিয়া ধরে। কুকুরকে দেখিয়া পূর্ণ বাবু ভীত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাকে ভীত দেখিয়া কুকুর ও ভয় উভয়ই আরও চাপিয়া ধরিল।

কুকুরের প্রভু নিকটেই ছিলেন। তিনি দেখিলেন, রহস্য মন্দ নয়। তিনি তাঁহার চতুষ্পদ জীবটিকে আরও উৎসাহিত করিবার মানসে নানাবিধ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিলেন; কুকুর প্রোৎসাহিত হইয়া পূর্ণবাবুর সমীপস্থ হইল। তিনি তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া একটা থামের উপর লাফাইয়া উঠিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে কিছু লক্ষ্য করেন নাই, তিনি সাহেবদের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া গঙ্গা পানে চাহিয়াছিলেন। যখন লক্ষ্য করিলেন, তখন পূর্ণ বাবু থামের উপর, কুকুর লম্ফোদ্যত। ক্রোধে বঙ্কিমচন্দ্রের বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি সাহেবদের লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিলেন "Fine sport indeed ! Don't you feel ashamed ?"

বঙ্কিমচন্দ্র এত তেজের সহিত এমন সুন্দর কথা বলি-

য়াছিলেন যে, সাহেবেরা লজ্জিত হইয়া কুকুরকে অবিলম্বে ডাকিয়া লইয়াছিলেন।

থিয়েটার ভাঙ্গিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। কাঁটালপাড়া হইতে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে দল বাঁধিয়া একত্র ফিরিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও সে দলে ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চুঁচুড়ায় Martial Law জারি হইয়াছিল। এই সামরিক বিধান অনুসারে চুঁচুড়ার সীমা মধ্যে রাত্রি নয়টার পর কেহ পথে বহির্গত হইলে প্রহরী তাহাকে গুলি করিয়া নিহত করিতে পারিত। ঘণ্টা-ঘাটের উপর দুই জন প্রহরী ছিল। কাঁটালপাড়ার দল ঘণ্টা-ঘাটের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র এক জন গোরা অন্ধকারের ভিতর হইতে অগ্রসর হইয়া জনৈক অগ্রগামী ভদ্রলোকের বুকের উপর সঙ্গীন স্থাপন করিল। নিরীহ ভদ্রলোকেরা আনন্দসহকারে থিয়েটারের গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিলেন, সম্মুখে এই বিপদ! বঙ্কিমচন্দ্র একটু পিছাইয়া ছিলেন। সকলে থামিল দেখিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, এক জন গোরা বন্দুকহস্তে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে—অপর প্রহরী অগ্রগামী ভদ্রব্যক্তির বুকের উপর সঙ্গীন স্থাপিত করিয়া কি জিজ্ঞাসা

করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তখন সামরিক বিধানের কথা উদিত হইল। তিনি বুঝিলেন, এই বিধান অনুসারে প্রহরী তাঁহাদের সকলকে নিহত করিতে সমর্থ। বঙ্কিমচন্দ্র, কম্পিতকলেবর ভদ্রলোকটিকে সরাইয়া দিয়া নিজে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং সংযত ভাষায় তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহারা গঙ্গার অপর পার হইতে থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। গোরা বলিল, "How am I to know that?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "you may ask the District Magistrate. He was present." গোরা বলিল, "I believe you. Take yourselves off at once."

সাহেবেরা পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল; কম্পান্বিত-কলেবর ভদ্রলোকেরা ঝড়বেগে গঙ্গার দিকে ধাবিত হইলেন। ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, মহাবিপদ!—সেখানে নৌকা নাই। সাহেবেরা Take yourselves off বলিয়া খালাস; কিন্তু ভদ্রলোকেরা যান কিরূপে? সাঁতার কাটিয়া না গেলে ত উপায় নাই। ডাঙ্গায় সাহেবের ভয়, জলে কুমীরের ভয়। কেহ কেহ জলটাকে অধিকতর নিরাপদ মনে করিয়া কাপড় গুটাইতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র

তাঁহাদের নিরস্ত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কালেজের ঘাটে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, সম্মুখস্থ চড়ায় দুইখানা নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। চীৎকার করিয়া মাঝিদের ডাকিতে কাহারও সাহস হইল না। বঙ্কিমচন্দ্র ডাকিলেন। তাহারা আসিল, এবং ভীত, ক্লান্ত ভদ্রলোকদের লইয়া অপর পারে প্রস্থান করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি ডিপুটি কালেক্টর। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাই তিনি সি, আই, ই। বাঙ্গালার মাটির দোষ। তা'হউক, বঙ্কিমচন্দ্র যেন এই দূষিত মাটি-তেই শতাব্দীতে শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কালেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। হুগলী কালেজে Senior scholarship পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধি-কার করায় বঙ্কিমচন্দ্র একটা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বৃত্তি

কত টাকার, তাহা জানি না। তিনি এই বৃত্তি লইয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে আইন পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাদবচন্দ্র তখন চাকরী হইতে সবেমাত্র অবসর গ্রহণ করিয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাসা করিয়া কলিকাতায় থাকিতে হইল। তখন ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল পথ তিন বৎসর আগে খুলিয়াছে। কিন্তু হুগলী ঘুরিয়া কলিকাতায় প্রত্যহ যাতায়াত সুবিধাজনক নয়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে মাতাপিতা ছাড়িয়া কলিকাতায় একা গিয়া থাকিতে হইল। সঙ্গে ভৃত্য ও পাচক; সঞ্জীবচন্দ্র মধ্যে মধ্যে গিয়া থাকিতেন।

তখন কলিকাতার অবস্থা ভয়ানক। বিদ্রোহানল চারিদিকে প্রজ্বলিত। ইংরাজের সিংহাসন প্রবল স্রোতোমুখে জীর্ণ তরীর ন্যায় কাঁপিতেছে। ইংরাজের শিশু ও রমণীরা, বাঙ্গালার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা, ইংরাজের দুর্গ ও জাহাজে আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব আলিপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন। গভর্ণর জেনারল ক্যানিং নেটিভ গার্ড তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার প্রাসাদ দুর্গে পরিণত করিয়াছেন। ভলণ্টিয়ারদল

চারিদিকে সজ্জিত হইতেছে। কোম্পানির কাগজের দর অসম্ভাবিতরূপে নামিয়া গিয়াছে। কাজকর্ম্ম বন্ধ। দস্যু তস্কর মাথা তুলিয়াছে। কলিকাতাবাসীরা ভীত, ত্রস্ত; যে যেখানে পারিতেছে, পলাইতেছে।

এমনই দিনে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষার্থ আসিলেন। তিনি কিন্তু নির্ব্বিকার। বঙ্কিমচন্দ্র স্থির জানিতেন, ইংরাজদের কেহ তাড়াইতে পারিবে না,—মুসলমান ও হিন্দুরা দুই দিনের জন্য উপদ্রব করিতেছে মাত্র। তিনি ইংরাজি যেমন পড়িয়া যাইতেছিলেন, তেমনই পড়িয়া যাইতে লাগিলেন; ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণে ওকালতি করিবার জন্য যেমন আইন শিক্ষা করিতেছিলেন, তেমনই শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যারিষ্টার-অধ্যাপক Montriou সাহেবকে কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যদি একদিনের জন্যও ভাবিতাম, তোমাদের রাজত্ব যাইবে, তাহা হইলে তোমার আইন-পুস্তক গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতাম।"

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, বৎসর শেষ হইতে না হইতে ইংরাজের বুদ্ধি ও শক্তির প্রভাবে অনল নির্ব্বাপিত-প্রায় হইল। যে জাতি মুষ্টিমেয়

সৈন্য লইয়া ক্ষিপ্ত-প্রায় কোটী কোটী মনুষ্যকে দমন করিতে পারে, সে জাতি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হইল। পর বৎসর ইংরাজ বি,এ,পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিঘোষিত হইল যে, ৫ই এপ্রেল পরীক্ষা গৃহীত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র আইন ছাড়িয়া বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তখন পরীক্ষার দুই মাস মাত্র বিলম্ব। এত অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষোপযোগী পুস্তক পাঠ করিয়া প্রস্তুত হওয়া দুরূহ। অনেকে পিছাইয়া গেলেন,বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ তের জন পিছাইলেন না। তাঁহারা পরীক্ষার্থী হইলেন। তিন জন উপস্থিত হইতে পারেন নাই —দশ জন মাত্র পরীক্ষা দিলেন। ইংরাজীসাহিত্য ও ইতিহাস পরীক্ষা করিলেন, গ্রাপেল সাহেব; সংস্কৃতের পরীক্ষা করিলেন, সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পরীক্ষায় দুই জন মাত্র উত্তীর্ণ হইলেন; তাও আবার দ্বিতীয় বিভাগে। প্রথম স্থান গ্রহণ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র; দ্বিতীয় হইলেন, বাবু যদুনাথ বসু। *

* কেহ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

বি, এ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইল, মে মাসের মধ্য-ভাগে। পরীক্ষার ফল দেখিয়া ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য গ্রহণ করিবে?"

হইতে পারেন নাই,—গভমেণ্ট দয়া পূর্ব্বক তাঁহাদের Grace-Mark দিয়া পাস করিয়া দিয়াছিলেন। এ উক্তির পোষকার্থ তিনি সরকারী রিপোর্ট হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের Bengal Provincial Committeeর রিপোর্ট বলিতেছে,—

"The necessity for reducing the standard, as the Court of Directors had advised, was at once seen from the poor results of the first Examination, in which only two students from the Presidency College obtained degrees, and these were conferred by favour."

অপর পক্ষেও কিছু বলিবার আছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রকে ডিগ্রি দিবার সময় Vice Chancellor প্রসিদ্ধনামা ডফ্ সাহেব বলিতেছেন,—"At the first and only Examination for a degree in arts that has yet been held, thirteen candidates presented themselves, but that two only, being the gentlemen on whom I shall have the happiness

বঙ্কিমচন্দ্র। পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া উত্তর দিতে পারি না।

ছোটলাট। এতদপেক্ষা কি বড় চাকরী তুমি প্রত্যাশা কর?

---

of conferring their degrees to-day, *attained the standard required.* [Calcutta University's Minutes of the Senates, 1858; Page 108.]

আর যদি ডফ্ সাহেবের উক্তি অগ্রাহ্য করিয়া আমরা স্থির করি যে, গভর্মেণ্ট বঙ্কিমচন্দ্রকে 'গ্রেস-মার্ক' দিয়া পাস করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও আমাদের স্বীকার করিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্র বি, এ; কেন না, সে 'গ্রেস' বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্ব্বপ্রথমে প্রদত্ত হইয়াছিল, আর তিনি সেই 'গ্রেস' পাইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

আর এক কথা; আমাদের মধ্যে—শুধু আমাদের মধ্যে কেন, সকল দেশের সকল সভ্য জাতির মধ্যে এমন অনেক বি, এ, এম, এ, আছেন, যাঁহারা 'গ্রেস-মার্ক' প্রাপ্ত হইয়া পাস হইয়াছেন। তাঁহারা 'গ্রেসে' পাস হইয়াছেন বলিয়া কি বলিব, তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই?—ডিগ্রি পান নাই?—গ্র্যাজুয়েটের তালিকাভুক্ত নহেন? যাঁহারা পরীক্ষক—পরীক্ষার প্রবর্ত্তনকারী—যাঁহারা পরীক্ষার standard নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা যখন 'গ্রেস'-প্রাপ্ত ছাত্রকে
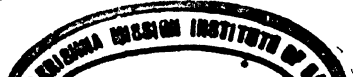
বঙ্কিমচন্দ্র। যত বড় চাক্‌রী আপনি আমাকে দিন না কেন, পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমি কোনও কার্য্য গ্রহণ করিতে পারি না।

ছোটলাট বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তি দর্শনে প্রীত হইলেন; বলিলেন, "ভাল, তোমায় আমি কিছু দিনের সময় দিলাম; তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া সত্বর আমায় সংবাদ দিবে।" *

চাক্‌রী গ্রহণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বড় বেশী ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পিতার আদেশে গ্রহণ করিতে হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ আগষ্ট তারিখে ডিপুটি

পাসের তালিকাভুক্ত করিয়া ডিগ্রি দিয়া বলিতেছেন, অমুক ছাত্র Required standard attain করিয়াছে, তখন কি আমরা বলিব, না সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই? এ প্রতিবাদ কি আমাদের শোভা পায়? প্রতিবাদ করিয়া কি আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথের নাম গ্র্যাজুয়েটের তালিকা হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিব?

* আমি ঠিক বলিতে পারি না, এ কথোপকথন হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে অথবা অন্য কোনও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে হইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর দুই মাস মাত্র।

এতদিনে বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হইল। এই ছাত্র-জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষভাগে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হ'তে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কালেজে এক আধটু শিখেছিলাম ঈশান বাবুর কাছে। ক্লাসে কখন থাকিতাম না। ক্লাসের পড়া শুনা কখন ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গ-দোষটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হ'য়েছিল। বাপ থাক্‌তেন বিদেশে, মা সেকালের উপর আর একটু বেশী; কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে কেন সিঁদ দিতে শিখিনি বলা যায় না।"

---

* সাধনা—১৩০১।

বঙ্কিম-জীবনী

দ্বিতীয় খণ্ড।

চাকরী।

—*—

যশোহর ও নাগোয়া।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কর্ম্মস্থল যশোহর। যশোহরের পথ তখন দুর্গম। রেল নাই, নৌকা বা পাল্কীতে যাইতে হইত। সময়ও বড় অল্প লাগিত না, তিন দিন, চারি দিন পথে অতিবাহিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মাতা পিতা, আত্মীয় স্বজনদের ছাড়িয়া সুদূর যশোহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আর এক জনকে ছাড়িয়া গেলেন; আমি তাহার রূপযৌবনশালিনী, সর্ব্বগুণময়ী সহধর্ম্মিণীর কথা বলিতেছি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণ ফাটিয়া গেল। তা'র ঠিক এক বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র সেই রমণীকুলভূষণ স্ত্রীকে হারাইলেন।

যশোহিরে দীনবন্ধু বাবুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আলাপ। উভয়ে উভয়কে ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের রচনা, 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জনে' পড়িয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এক্ষণে

এক প্রতিভা অপর প্রতিভার সহিত সাক্ষাৎ আলাপে প্রবৃত্ত হইল; এক বিদ্যুৎ অপর বিদ্যুতকে আলিঙ্গন করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নাগোয়াতে বদলি হইয়া গেলেন। নাগোয়া মেদিনীপুর জেলায়। কাঁথির নাম অনেকেই অবগত আছেন। কাঁথির সন্নি-কটেই নাগোয়া। পূর্ব্বে এইখানেই মহকুমা স্থাপিত ছিল; পরে স্থানটি অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়ায়, মহকুমা কাঁথিতে উঠিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নাগোয়া মহকুমার হাকিম হইয়া আসিলেন।

এখান হইতে সমুদ্র বেশী দূর নয়। সময় পাইলে বঙ্কিম-চন্দ্র মধ্যে মধ্যে সমুদ্র দেখিতে যাইতেন। নাগোয়া হইতেও সমুদ্রের চীৎকার সময় সময় শুনা যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিপত্নীক। নিস্তব্ধ নিশীথে শয্যায় শুইয়া সমুদ্রের রোদনে তিনি আপন হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনিতেন। চপল সমুদ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিত, গম্ভীর বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে কাঁদিতেন। সে নীরব রোদন বঙ্কিমচন্দ্রের মাতাপিতা ছাড়া আর কেহ দেখিল না, বুঝিল না। তাহারা বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র এক দিন রাজকার্য্যানুরোধে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। স্থানীয় জমিদার বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য তাঁহার উদ্যান-বাটী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকারোহণে উদ্যানগৃহে সমুপস্থিত হইলেন। আহারাদির উদ্যোগ হইতেছে; বঙ্কিমচন্দ্র একা একটি ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। এমন সময় সহসা সেই কক্ষে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকটির রূপ ও বয়সের কথা শুনি নাই; তবে সে শুভ্রবসনে সমাচ্ছাদিত ছিল, ইহা শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র এই স্ত্রীলোকটিকে নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" স্ত্রীলোকটি কোনও উত্তর করিল না। বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?" রমণী তথাপি নীরব। বঙ্কিমচন্দ্র উঠিলেন; এবং অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথার উত্তর দাও না কেন? তুমি মানুষ, না পেত্নী?"

বঙ্কিমচন্দ্রকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রমণী উন্মুক্ত দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইল; এবং গৃহ ছাড়িয়া উদ্যানে আসিয়া দাড়াইল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অনুসরণ করিলেন। উদ্যানে আসিয়া যখন তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন, তখন দেখিলেন, রমণীর শুভ্রবসন ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, অবশেষে রমণী-মূর্ত্তি বায়ুহিল্লোলে মিলাইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষণকাল স্তম্ভিতচিত্তে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে গৃহমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "আমি এখনি এ স্থান ছাড়িয়া যাইব—পাল্কী প্রস্তুত কর গে।"

নাগোয়াতে বঙ্কিমচন্দ্র বেশী দিন ছিলেন না; কয়েক মাস থাকিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে খুলনাতে বদলি হইয়া গেলেন। কিন্তু বদলি হইবার পূর্ব্বে তাঁহার এক শত টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। চাকরীতে প্রবৃত্ত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার পদোন্নতি হইল। এ সৌভাগ্য সকলের হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া খুলনায় চলিয়া গেলেন।

খুলনা।

—•—

খুলনা তখন যশোহরের অধীন একটি মহকুমা মাত্র; তখনও স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয় নাই। বেনব্রিজ সাহেব সে সময় যশোহর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। মিষ্টার বেন্‌ব্রিজের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এইখানে প্রথম আলাপ; এই আলাপ বহরমপুরে 'ডফিন' ঘটনার পর সখ্যয় পরিণত হইয়াছিল।

খুলনায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ঘোর অরাজকতার মধ্যে পড়িলেন। একদিকে নীলকরের অত্যাচার, অপরদিকে দস্যু তস্করের উপদ্রব। তখনকার নীলকরেরা বড় সামান্য ব্যক্তি নহেন। তাঁহারা কোটীপতি ব্যবসাদার, তাঁহারা-প্রবল জমিদার। বড় ছোট খাট জমিদার নয়,—কৃষ্ণনগরের হিল্‌স্ সাহেবের তিন লক্ষ বিঘা জমি ছিল। এই সাহেবই প্রজা ঈশ্বর ঘোষের নামে খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমা স্থাপন করিয়া Sir Barnes Peacock প্রমুখ হাইকোর্টের সমুদায় বিচারপতিদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন।

হিল্‌স্ সাহেবকে লইয়া আমাদের কোন প্রয়োজন

নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নীলকরদের বিবাদ বুঝা-ইতে হইলে আমায় কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইবে। নীলকরদের প্রতাপ কিরূপ ছিল, ইহা না বুঝিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না, তাহাদের অত্যাচার দমন করিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কতটা শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। আমি সে সময়কার সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দুই চারি কথায় বুঝাইতে প্রয়াস পাইব।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া লিখিয়াছিলেন, "The planter—denied laws, courts and police —like Englishmen all over the world became a law into himself."

সত্যই নীলকরেরা সে সময় মনে করিতেন, দেশে আইন নাই—আকাশে দেবতা নাই। প্রজাকে ধরিয়া বাঁধিয়া আনিতে, ভূমধ্যস্থ গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে, তাহাকে 'শ্যামচাঁদে'র * প্রহারে জর্জ্জরীভূত করিতে, তাঁহারা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। প্রজার গৃহে আগুন লাগাইতে, তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে, তাহার স্ত্রী

* চর্ম্মের কশা বিশেষ।

কন্যাকে পীড়ন করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না। পিপীলিকাও পদদলিত হইলে শত্রুকে দংশন করে। বাঙ্গালী আত্মরক্ষার্থ, দংশনার্থ দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। উপযুক্ত নেতার অভাব হইল না। নেতার অভাব বাঙ্গালায় কখনও হয় না। সে দিনও তাহা দেখিয়াছি। কত ওয়াট টাইলার, হ্যামডেন্, ওয়াশিংটন নিরন্তর বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিতেছেন—ক্ষুদ্রবনফুলের মত মনুষ্য-নয়নান্তরালে ফুটিয়া ঝটিকাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছেন, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না—আমরা তাহার চিত্র তুলিয়া রাখি না; কেন না, আমরা ইতিহাস লিখিতে জানি না,—চিত্র আঁকিতে সবে শিখিতেছি।

বাঙ্গালী মার খাইয়া অবশেষে মারিবার জন্য বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইল। একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের * দুই জন সামান্য প্রজা † নীলকরের চাক্‌রী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীয়মান করিল। এই দুই স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ বাঙ্গালার নিঃস্ব সহায়শূন্য প্রজাদের একপ্রাণে বাঁধিল—

* নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী চৌগাছা গ্রাম।

† বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস।

সিপাহী-বিদ্রোহের সদ্যোনির্ব্বাপিত অনলের ভস্মরাশি লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইতে লাগিল। বরিশালের বিখ্যাত লাঠিয়ালেরা আসিয়া যোগ দিল। ক্রমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে—জেলা হইতে জেলান্তরে—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইল। বাঙ্গালীরা দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া সাহেব ঠেঙ্গাইতে লাগিল—তাহাদের ঘরদ্বার লুণ্ঠন করিতে লাগিল—সাহেবদের আমীন, গোমস্তা, ভৃত্যদের মারপিট করিয়া মাঠ হইতে তাড়াইতে লাগিল—কল কারখানা, কাগজপত্র পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিতে লাগিল। দেশময় আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু এ আগুন কয়েকটি নীল-আবাদী জেলা ছাড়া বড় বেশী দূর ছড়াইল না।

এমনই দিনে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু লং সাহেবের মোকর্দ্দমা উঠে নাই। কয়েক মাস পরে উঠিল। * এই মোকর্দ্দমা শেষ হইলে—লং সাহেবের জেল হইলে, নীলকর জমিদারদের বল বাড়িল। তাঁহারা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গবর্মেণ্টের নিকট অনুযোগ করিলেন যে, যশোহর

* ১১এ জুলাই, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ।

ও নদীয়া জেলার প্রজারা তাঁহাদের খাজনা দিতেছে না, এবং যাহাতে আদায় দেয় তাহার উপায় করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্ট আর স্থির থাকিতে না পারিয়া মরিস ও মণ্টেসারকে স্পেশ্যাল-কমিশনর নিযুক্ত করিয়া অনুসন্ধানার্থ পাঠাইলেন। কমিশনর সাহেবেরা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন, নীলকর-জমিদার সাহেবেরা নিরীহ ভদ্রলোক, কখনও কোনও প্রজার গায় হাত তুলেন নাই, বা কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই; যত দোষ বাঙ্গালী প্রজার। তাহারা কিছুতেই খাজনা দেয় না। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় ছোটলাটে ও বড়লাটে বিবাদ বাধিল। প্রজাপালক গ্রাণ্ট সাহেব কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; বড় লাট ক্যানিং সাহেব নিরীহ নীলকরদিগের আবদার রক্ষার্থ নূতন আইন গড়িতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েই সত্বর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই সকল নিরীহ সাহেবদের মধ্যে মরেল নামধেয় এক জন শান্ত শিষ্ট নীলকর জমিদার ছিলেন। অন্যান্য নীলকরদিগের তুলনায় প্রকৃতই তিনি শান্ত শিষ্ট। অনেকেই তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। এমন

কি, তদানীন্তন প্রজাবৎসল ছোটলাট Sir J. P. Grant তাঁহার Indigo minutesএ মরেল সাহেবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"He is a model settler and an example to all Indigo planters."

এই Model settler ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক দাঙ্গা করিয়া বসিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি; আগে মরেল সাহেবের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের একটু পরিচয় দিই। মরেল সাহেব একটা নগর বসাইয়া তাহার নাম রখিলেন, "মরেল-গঞ্জ"। সাহেব এই নগরের রাজা। তাঁহার কিছু সৈন্যও ছিল। লাঠিয়ালের সংখ্যা বড় অল্প নয়,—পাঁচ সাত শত হইবে। লাঠিয়ালেরা যে শুধু লাঠি ঘাড়ে করিয়াই লড়াই করিত, তা নয়,—তাহাদের কাহারও কাহারও হাতে বন্দুক, সড়্‌কি প্রভৃতি অস্ত্রও থাকিত।

এই দলের কর্ত্তা বা ক্যাপ্টেন ছিলেন ডেনিস্ হিলি। হিলি আইরিস—হিলি যুবক। হিলি পূর্ব্বে Yeomanry Cavalryতে ছিলেন। সেখানে নরহত্যা বা গৃহদাহের তেমন সুবিধা ছিল না; বেতনও সামান্য। হিলি সাহেবের

ভাল লাগিল না; অথবা সে কাজ করিতে পারিলেন না। সে চাক্‌রী ছাড়িয়া দিয়া তিনি অবশেষে মরেল সাহেবের লাঠিয়াল-দলের নায়কতা গ্রহণ করিলেন।

মরেল সাহেবের অধিকাংশ সম্পত্তি যশোহর জেলার মধ্যে অবস্থিত। মরেলগঞ্জ বঙ্কিমচন্দ্রের এলাকাভুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় আসিয়া দেখিলেন, মরেল সাহেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; তিনি আদর্শ প্ল্যাণ্টার-রূপে দেশ শাসন করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় আসিয়া চার্জ্জ লইবার ঠিক এক বৎসর পরে মরেল সাহেব একটা দাঙ্গা করিয়া বসিলেন। তৎসম্বন্ধে Friend of India কাগজ কি লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"In November 1861, an affray took place at Surulia, a village in the Sunderbuns between a Zamindar and a party belonging to Mr. Morell, an enterprising landlord in the vicinity. Such affrays have been only too common, and Mr. Morell having applied in vain for the protection of the police, was obliged to protect himself. * * * This last affray was headed by a Mr Hely and by a native."

Friend of India অম্লানবদনে লিখিলেন, মরেল সাহেবকে পুলিস রক্ষা করিল না, কাজেই তিনি আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। কিছুকাল পরে Friend of Indiaকেও সুর বদলাইতে হইয়াছিল। আমি কাগজ পত্রে যাহা দেখিয়াছি, তাহা হইতে সারসঙ্কলন করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দ ২৬এ নভেম্বর তারিখে কয়েকখানা মানুষ বোঝাই নৌকা আসিয়া বড়খালি গ্রামের তটে আশে পাশে লাগিল। তখনও রজনী প্রভাত হয় নাই—অল্প অল্প অন্ধকার ঝোপে ঝাপে চারি দিকে লুকাইয়া রহিয়াছে। নৌকার লোকেরা নিঃশব্দে উঠিয়া গ্রামখানি ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা সংখ্যায় বড় কম নহে,—প্রায় তিন শত হইবে। কাহারও হাতে লাঠী, কাহারও হাতে সড়কি, কাহারও হাতে বা বন্দুক। ইহারা সকলেই মরেল সাহেবের লাঠিয়াল। ডেনিস হিলি তাহাদের নেতা। হিলি মরেল সাহেবের জমিদারির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট; সুতরাং তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে জমিদারীর হিতার্থ লাঠিয়াল লইয়া বিদ্রোহী প্রজা দমন করিতে হইত।

বড়খালির প্রজারা বড়ই দুরন্ত। তাহারা বৃদ্ধি-খাজানা দিতে গোল করে, নীল চাষ করিতেও আপত্তি করে। তাহারা বলে, গলা কাটিয়া ফেলিলেও নীল চাষ করিব না। কাজেই তাহাদের শাসন আবশ্যক হইয়া উঠিল; কিন্তু মরেল সাহেব সহজে তাহাদের শাসন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রজারা সংখ্যায় অনেক, একতাসম্বদ্ধ ও বলবান্।

বলবান্ হইলেও তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। এক মাঠ ধান বা এক গোলা চাল লুণ্ঠিত হইলে তাহাদিগকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত; সাহেবের দুই একটা লাঠিয়াল জখম হইলে, সে সংবাদ সাহেবের কাণেও পৌঁছিত না। এইরূপে বহুকাল হইতে মরেল সাহেবের সঙ্গে বড়খালির প্রজাদের বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। সাহেব অবশেষে তাহাদের বিশেষরূপে শিক্ষা দিবার মানসে হিলি সাহেবের অধ্যক্ষতায় ১২০ নৌকা লাঠিয়াল পাঠাইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার পুলিস পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হিলি সাহেব একটা দাঙ্গা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু কোথায় যে দাঙ্গা করিবেন,

তাহা পূর্ব্বাহ্ণে কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সাহেবেরা ভাণ করিলেন, সরুলিয়া আক্রান্ত হইবে; পুলিস সেই দিকে ছুটিল। সাহেবেরা এ দিকে রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া বড়খালি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রত্যুষে যখন বড়খালি আক্রান্ত হইল, তখন গ্রামবাসীরা সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারাও লাঠী ও সড়্‌কি লইয়া 'মার্' 'মার্' শব্দে ছুটিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, এবার সাহেবেরা সংখ্যায় অনেক। তাহাদের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কেহ ফিরিল না। রহিম উল্লা নামধেয় জনৈক বলবান্ পাঠান লাঠী লইয়া অগ্রসর হইল। তাহার লাঠীতে মরেলগঞ্জের কয়েক জন অস্ত্রধারী ধরাশায়ী হইল। হিলি সাহেব তাহা দেখিলেন। সত্য মিথ্যা জানি না—এই জনশ্রুতি যে, হিলি সাহেব বন্দুক ছুঁড়িলেন, রহিম আহত হইল। মোকর্দ্দমা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল আমি তখনকার কাগজ হরকরা, ইংলিশম্যান, ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি হইতে ভাবার্থ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রহিম আহত হইয়া পলায়ন করিল; এবং গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া ক্ষতস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

উঠানের চারি দিকে উচ্চ গাছ, গাছের পাশে দরমার উঁচু বেড়া, তার নীচে খাদ। রহিম যখন বসিয়া পায়ের ক্ষত বাঁধিতেছে, তখন দ্বিতীয় গুলি আসিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিল। রহিম তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এ গুলি প্রথম গুলির ন্যায় হিলি সাহেবের বন্দুক হইতে ছুটিয়াছিল বলিয়া সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয়।

রহিম গ্রামের এক জন মান্য গণ্য ব্যক্তি। সে যখন মরিয়া গেল, তখন গ্রামবাসীরা ভীত হইয়া জঙ্গলের দিকে পলাইতে লাগিল। সে সময়ের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর। লাঠিয়ালেরা মহা উল্লাসে গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহা লইয়া যাইতে পারে, তাহা লুণ্ঠন করিল; যাহা লইয়া যাইতে অসমর্থ, তাহা ভস্মীভূত করিল; যাহা আগুনে পুড়াইবার নয়, তাহা জলে ফেলিয়া দিল। যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকে মারিল। রমণীরাও নিস্তার পাইল না। যাহাদের বয়স আছে, তাহারা বন্দী হইল। রহিম উল্লার স্ত্রী ভগিনী কেহই পরিত্রাণ পাইল না।—বিজয়ী দল তাহাদের সঙ্গে লইয়া চলিল। আর একটা জিনিস তাহারা সঙ্গে লইল, সেটা রহিম উল্লার মৃতদেহ।

যে গ্রাম অরুণোদয়ে হাসিতেছিল, সে গ্রাম মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে হৃতসর্ব্বস্ব হইল। গ্রাম বেষ্টন করিয়া রমণীর হাহাকার-ধ্বনি, আর অনলের গর্জ্জন উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ণে সে ধ্বনি পৌঁছিল,—তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

তিনি পুলিস লইয়া স্বয়ং তদন্ত করিতে আসিলেন। মরেলগঞ্জে আসিয়া দেখিলেন, সাহেবেরা পলাতক। আমি বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, লাইটফুট নামধেয় জনৈক সাহেব, মরেলের অংশীদার ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনে মরেল, লাইটফুট, হিলি, সকলে পলায়ন করিলেন। ধরা পড়িল, বাঙ্গালী লাঠিয়ালরা। তন্মধ্যে দৌলত চৌকীদারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র হিলি সাহেবের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া আসামীদের বিচারার্থ যশোহরে পাঠাইলেন। নিজে বিচার করিলেন না; কেন না, আইনানুসারে তদন্তকারী বিচার করিতে অসমর্থ।

দায়রার বিচারে দৌলত চৌকীদারের উপর ফাঁসির হুকুম হইল, এবং চৌত্রিশ জন আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাদেশ হইল।

সাহেবেরা নিরুদ্দিষ্ট। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে মরেল ও লাইটফুট বিলাতে পলাইলেন। হিলি ছদ্মবেশে নামান্তর গ্রহণ করিয়া বোম্বাই হইতে পলাই-তেছিল, এমন সময় পুলিস গিয়া তাহাকে ধরিল, এবং টানিয়া আনিয়া জেলে পুরিল। হিলি অনেকদিন জেলখানায় পড়িয়া রহিল। অবশেষে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হাইকোর্টের বিচারে হিলি খালাস পাইল।

খালাস পাইবারই কথা। হিলিকে কেহ সনাক্ত করিতে পারিল না; তা' ছাড়া, রহিম উল্লার মৃতদেহ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

যখন সাহেবেরা পলাতক, তখন খুলনায় রাষ্ট্র হইল, বঙ্কিমচন্দ্রকে মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছে। যে তাহাকে মারিতে পারিবে, তাহাকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। কে ঘোষণা করিল, ও কে যে টাকা দিবে, তাহা আমি জানি না। জনবর যে, এক জন সাহেব নাকি এক পকেটে রিভলভার ও অন্য পকেটে এক লক্ষ টাকার নোট লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। সাহেব নাকি উক্ত

জিনিস দুইটি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিয়াছিল, "তুমি কোন্ জিনিসটি চাও? যদি অর্থ গ্রহণ করিতে সম্মত না হও, তবে এখনি তোমায় হত্যা করিব।" বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিলেন, "আমার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কথার উত্তর দিব।"

বঙ্কিমচন্দ্র উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন; এবং দ্বার বন্ধ করিয়া ভৃত্যদের ডাকিতে লাগিলেন। সাহেব তখন পলাইল। *

তার পর ঘোষণা প্রচার হইল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ মারিতে পারিল না; ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পেস্‌কার মরেলগঞ্জের লোকদের হাতে পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎ-সম্বন্ধে হরকরা লিখিলেন,—"Another affray has taken place at Morellganj. The Police

* এ গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়স্ক ভাগিনেয় স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্রের লিখিত একখানি পুস্তিকায় আছে।

were rather severely handled in an attempt to seize the missing Peshkar."

পেস্‌কারকে উদ্ধার করিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং এমন শোধ লইয়াছিলেন যে, মরেলগঞ্জকে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল। যশোহর জেলার অন্যান্য মহকুমায় গোলযোগ চলিতে লাগিল; কিন্তু খুলনা শান্ত। বেন্‌ব্রিজ সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্য-দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া গবর্মেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। কর্ত্তা বিডন সাহেব ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বঙ্কিম-চন্দ্রের এক শত টাকা বেতনবৃদ্ধি করিয়া দিলেন। এইরূপে চারি বৎসর পাঁচ মাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দুইবার প্রোমোশন পাইলেন। পঠদ্দশায় তিনি যেমন এক এক ক্লাস ডিঙ্গাইয়া প্রোমোশন পাইয়াছিলেন, কর্ম্মক্ষেত্রেও তেমনই অনেককে অতিক্রম করিয়া প্রোমোশন পাইয়াছিলেন। চব্বিশ বৎসর পাঁচ মাস বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

জলদস্যু দমন করিতেও বঙ্কিমচন্দ্র সাহস ও তেজের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু মরেলগঞ্জ-ঘটিত

ব্যাপারের তুলনায় সে সব কথা অতি তুচ্ছ। যে নীলকর জমিদারেরা বাঙ্গালার Unofficial Parliament বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে,যে নীলকরেরা ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেবের নামেও Libel case* আনিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই,সে সব ব্যবসাদার বড় সহজ লোক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের কয়েকজনকে দমন করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাই ঘটনাটি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম।

আর একটা কথার উল্লেখ না করিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতে পারিলাম না। বঙ্কিমচন্দ্রের চারি দিকে যখন দস্যু তস্কর—যখন তাঁহার সঙ্গে নীলকরদের ঘোরতর বিবাদ চলিয়াছে, তখন তিনি স্থিরচিত্তে বসিয়া দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছেন। জানি না, খুলনায় কি দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পাঠান ও মোগলের লড়াই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খুলনায় প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু পাঠান বা মোগলের উল্লেখযোগ্য কোনও কীর্ত্তি নাই।

* ম্যাক্ আর্থার সাহেব, ছোটলাটের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনিয়াছিলেন। বিচারপতি, Sir Barnes Peacock বিচার করিয়া ছোটলাটের এক টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বদলী হইয়া বারুইপুরে গেলেন। খুলনায় তাঁহার স্থলে এক জন সাহেব আসিল; সাহেবকে সাহায্য করিবার জন্য এক জন দেশীয় ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। যে কাজ বঙ্কিমচন্দ্র একা করিতেন, সে কাজ দুই জনে চালাইতে লাগিলেন।

বারুইপুর।

—:*:—

বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে প্রথম বার বেশীদিনের জন্য ছিলেন না; বোধ হয় সাত মাস হইবে। এখানে এমন কিছু করেন নাই, যাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। বারুইপুরের কোন ভদ্র ব্যক্তি, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কোনও মাসিকপত্রে কিছু লিখিয়াছিলেন; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

সাইক্লোনের সময় বঙ্কিমচন্দ্র দুঃস্থ প্রজাদের নানারূপে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন অপরাহ্ণে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে কীটাণু, উদ্ভিদের সূক্ষ্মভাগ প্রভৃতি পরীক্ষা

করিতেন। পরীক্ষিত পদার্থনিচয়ের অপরূপ শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"জগতের মধ্যে কেবল আমরাই কুৎসিত, * আর আর সমস্তই সুন্দর।"

লেখক বলিতেছেন, "এই সমস্ত পরীক্ষার সময় আমি কখনও তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরভক্তির অপার উচ্ছ্বাস দেখি নাই—কখনও ঈশ্বরের নামগুণ শুনি নাই, বা ঈশ্বর বিশ্বাসের কোন পরিচয় কখনও পাই নাই।"

লেখক অতি দক্ষতার সহিত বলিয়া যাইতেছেন,—"আমাদের বারুইপুরে অবস্থান সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্বন্ধে উভয়ের ঘনিষ্ঠতার কতকটা পরিচয় পাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সময়ে সময়ে বারুইপুরে আসিয়া কনিষ্ঠের অতিথি হইতেন। উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। শ্যামাচরণ বাবুতে জ্যেষ্ঠত্বের কোন অভিমান দেখি নাই, বঙ্কিম বাবুতেও কনিষ্ঠত্বের কোন সংস্কার অনুভব করি নাই। তাঁহারা ঠিক যেন পরস্পর পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাদের আলাপের মধ্যে কোন লজ্জা সরম প্রকাশ পাইত না।

* কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না; মানুষ কুৎসিত!

সকল বিষয়ে পরস্পরে খোলাখুলি আলাপ ও আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

"মধ্যে মধ্যে বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও ২৪ পরগণার Assistant District Superintendent বাবু জগদীশ নাথ রায়, বঙ্কিম বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং সকলে কয়েক দিন অত্যন্ত আমোদ আহ্লাদে থাকি-তেন। * * * একবার বঙ্কিম বাবুর মজিলপুরে অবস্থিতি কালে একদিন এই বাবুদ্বয় রাত্রি ৮।৮॥০ টার সময় গাড়ী করিয়া মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবু পূর্ব্বাহ্লে তাঁহাদের আগমনের কোন সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না জানি না। তিনি তখন তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে অধ্যয়নে নিরত ছিলেন। তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বাসাবাটীর সম্মুখস্থ হইয়াই গান ধরিলেন, 'আমরা বাগবাজা-রের মেথরাণী।' বঙ্কিম বাবু তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ পাঠত্যাগ করিয়া, বারাণ্ডায় আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'কালুয়া নিকাল দেও,'— 'কালুয়া, নিকাল দেও'। এইরূপে সম্ভাষিত হইয়া তাহার বন্ধুদ্বয় তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন।

"বঙ্কিম বাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বর-বিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত। আমি থিওডোর পার্কারের Ten Sermons নামক পুস্তকখানি তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন, এবং সপ্তাহান্তে তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "Such worst English I have never read."

বারুইপুর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে ডায়মণ্ড হারবারে বদলী হইয়া যান। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া আবার বারুইপুরে ফিরিয়া আসেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আবার তাঁহার বেতনবৃদ্ধি হইল। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় দেড় মাসের ছুটী লইয়া গৃহে আসিয়া বসিলেন। অবকাশান্তে আবার বারুই-পুরে আসিলেন। এবার সেখানে বেশীদিন থাকিতে হইল না; ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার এক নূতন চাক্‌রী জুটিল। গবর্মেণ্টের আমলাদের বেতন-নির্দ্ধারণ জন্য পূর্ব্ব হইতে এক কমিশন বসিয়াছিল। হাইকোর্টের জজ প্রিন্সেপ সাহেব এই কমিশনের

সম্পাদক ছিলেন। এক্ষণে তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া যাওয়াতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থানে সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এটা বড় সামান্য গৌরবের কথা নয়। যে পদে এক জন হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদে বাঙ্গালী যুবক বৃত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ কাজে দেড় মাস মাত্র নিযুক্ত ছিলেন। তার পর ২৪-পরগণার সদর আলিপুরে বদলী হইয়া আসিলেন।

আলিপুরে বঙ্কিমচন্দ্র দশ মাস মাত্র ছিলেন। সেই দশ মাসের ভিতর তিনি মৃণালিনী লিখিয়া শেষ করিলেন। পরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে তিনি ছয় মাসের ছুটী লইলেন। ছুটীর কিয়দংশ গৃহে থাকিয়া আইন-পুস্তক-পাঠে ও মৃণালিনীর পাণ্ডুলিপি-সংশোধনে অতিবাহিত করিলেন; এবং অবশেষে মৃণালিনী ছাপিতে দিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। তখনকার দিনে ছাপার কার্য্য তত দ্রুত অগ্রসর হইত না। মৃণালিনী মুদ্রিত হইতে এক বৎসরের উপর লাগিয়াছিল। অবকাশান্তে বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে ফিরিয়া আসিলেন; তখনও মৃণালিনী ছাপা শেষ হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মৃণালিনী প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে

চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র B. L. পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বহরমপুর।

—:*:—

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। তখন তাঁহার বেতন হইল, সাত শত টাকা। কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে রাজসাহী ডিবিসনের কমিশনরের Personal Assistant স্বরূপ কার্য্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু স্থানান্তরে যাইতে হয় নাই, বহরমপুর তখন রাজসাহী ডিবিসনের অন্তর্গত ছিল; এবং বহরমপুরেই কমিশনর সাহেবের Head Quarters ছিল।

এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃহীন হইলেন। নগ্নপদে নগ্নদেহে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরীয়মাত্র সম্বল করিয়া কাছারীতে আসিয়া বসিতেন। দুই একদিন মাত্র এই ভাবে কাছারী করিয়াছিলেন। তার পর ছুটী লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের লুপ লাইন খুলিয়াছে, কিন্তু আজিমগঞ্জ বা লালগোলা রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে নলহাটীতে গিয়া ট্রেণে উঠিতে হইল। সেখানে এক বিপদ্। গাড়ীতে উঠিতে গিয়া দেখেন, দুই জন সাহেব মদ খাইতেছে। সময় নাই, সেকেণ্ড ক্লাস কম্‌পার্টমেণ্টও আর নাই। বাধ্য হইয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন।

সাহেবেরা দেখিল, এক জন নগ্নপদ, নগ্নদেহ বাঙ্গালী তাহাদের গাড়ীতে উঠিল। তাহারা ভাবিল, নেটিভটা বুঝি ভ্রমক্রমে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছে। তাহারা 'উতার যাও' 'উতার যাও' শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ট্রেণ কিন্তু তখন চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, বিপদ্ মন্দ নয়। তাঁহার সঙ্গে এক জন ভৃত্য ছিল, সেও তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। দুই জন মত্ত সাহেবের সম্মুখে ক্ষীণকায় দুর্ব্বল বঙ্কিমচন্দ্র একাকী। কিন্তু তিনি পিছাইলেন না; সাহেবদের বলিলেন, "চলন্ত গাড়ী হইতে কেমন করিয়া নামিয়া যাইতে হয়, তোমরা আগে তাহা দেখাইয়া দাও।"

সাহেবেরা দেখিল, 'নেটিভটা বেশ ইংরাজি জানে।

তাহাদের চক্ষু যদি মদের মোহে আচ্ছন্ন না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা দেখিতে পাইত, বঙ্কিমচন্দ্র সামান্য মনুষ্য নহেন। সাহেবেরা তাহা দেখিতে পাইল না; তাহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে নামিয়া যাইবার জন্য পীড়ন করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীপ্তনয়নে তীব্র ভাষায় সাহেবদের ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সাহেবেরা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এমন সময় পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র নামিয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন। তদবধি তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আর উঠিতেন না। তিনি বলিতেন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইতর সাহেবেরা উঠে। বাঙ্গালী ভদ্রলোক যদি আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ট্রেণে যাতায়াত করিতে বাসনা করে, তাহা হইলে প্রথম অথবা মধ্য শ্রেণীর গাড়ী যেন ব্যবহার করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরে অবস্থানকালে নফরবাবু তথায় মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার পূরা নাম—নফরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। এই নফর বাবুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের একটু প্রণয় হইয়াছিল। একদা স্থানীয় কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে নফর বাবু ও বঙ্কিমচন্দ্রের নিমন্ত্রণ

হইয়াছিল। উভয়ে যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, সহরের অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন।

সভাতে বসিয়া নফর বাবু একটা প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন; সেটা ডারউইনের থিয়রি। অন্য লোকে কেহ কিছু বলিল না দেখিয়া নফর বাবু এই থিয়রি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহারা ডারউইন পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারি-লেন, নফর বাবু ডারউইন কোনও কালে পড়েন নাই। কিন্তু নফর বাবুর বক্তৃতার বিরাম নাই। তিনি ক্রমেই পঙ্কে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি নফর বাবুকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন। নফর বাবু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "যাহা জান না, পড় নাই, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিও না।"

নফর বাবু নীরব হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ডারউইনের থিয়রি, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে বুঝাইতে লাগিলেন। নফর বাবু সে দিন আর একটীও কথা

কহেন নাই,—নীরবে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া একাকী প্রস্থান করিয়াছিলেন।

কিছু দিন পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়া 'সোম-প্রকাশে' এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহ করিলেন, বহরমপুর হইতে কোনও ব্যক্তি এই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছে। অনুসন্ধানে জানি-লেন, নফর বাবুরই কাজ। একদিন তিনি নির্জ্জনে নফর বাবুকে ধরিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "নফর বাবু, তুমি কি সোমপ্রকাশে প্রবন্ধ লিখিয়াছ?"

নফর বাবু একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া তদ্দণ্ডে অপরাধ স্বীকার করিলেন; এবং দুঃখপ্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিগলিতচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তদবধি তাঁহাদের প্রণয় অক্ষুণ্ন ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এবার এক জন সাহেবের বিবাদ বাধিল। সাহেব যে সে লোক নয়,—তাঁহার নাম Colonel Duffin (কর্ণেল ডফিন)। বহরমপুরে তখন সেনানিবাস ছিল;—অনেকগুলি গোরা তথায় থাকিত, কর্ণেল সাহেব তাহাদের সেনানায়ক অর্থাৎ

Commanding officer ছিলেন। এই প্রবল প্রতাপান্বিত সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুতর ঝগড়া বাধিল।

ঝগড়া গুরুতর হইলেও কারণটী তত গুরু নয়। একটা সরু পথ গোরানিবাস ব্যারাকের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের উপর দিয়া গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কাছারী যাতায়াত করিতেন, কখনও পদব্রজে, কখনও বা শিবিকারোহণে। অন্যান্য লোকও এই পথ দিয়া চলিত। আরও একটা পথ ছিল, কিন্তু সেটা অনেকটা ঘুরিয়া গিয়াছে ; তাই ব্যারাকের পথ ধরিয়া সকলে চলিত। কিন্তু গোরাদের তাহাতে আপত্তি।

এক দিন অপরাহ্ণে বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকারোহণে কাছারী হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। বাহকেরা এই পথ ধরিয়াছিল। পাল্কীর এক দিকের দ্বার বন্ধ ছিল। পাল্কী যখন মধ্যপথে, তখন পাল্কীর বন্ধ দ্বারের উপর সজোরে করাঘাত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকার দ্বার ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া ফেলিয়া লম্ফত্যাগে পাল্কী হইতে ভূতলে পড়িলেন। দেখিলেন, সম্মুখে এক জন সাহেব। একটু দূরে কয়েক জন সাহেব

ক্রিকেট খেলিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন, নিকটের সাহেবই পাল্কীর দ্বারে আঘাত করিয়াছে। এই সাহেব কর্ণেল ডফিন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে চিনিতেন কি না, জানি না। কিন্তু তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া মহারোষে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Who the Devil you are ?"

সাহেব উত্তর না দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরিয়া সবলে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ক্রীড়াভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন; এবং ক্রীড়ারত সাহেবদের সমীপস্থ হইলেন। দুই তিন জন সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত ছিলেন। তন্মধ্যে জজ বেন্‌ব্রিজ এক জন। বেন্‌ব্রিজ সাহেবকে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "Have you seen how I have been dealt with by that person ?"

বেন্‌ব্রিজ সাহেব উত্তর করিলেন, "O Babu, I am short-sighted—I have not seen any thing."

তিনি সত্য সত্যই চক্ষে কম দেখিতেন। ভগবান্ জানেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াছিলেন

কি না। কিন্তু তিনি ও কর্ণেল ডফিন পরে বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহারা চিনিতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র জজ বেন্‌ব্রিজ সাহেবের নিকট হইতে ফিরিয়া অন্যান্য সাহেবদের সমীপস্থ হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কিছু দেখিয়াছেন?"

তাঁহারা বলিলেন, "না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "উত্তম, আদালতে এই কথা বলিবেন।"

বলিয়া তিনি রোষে ক্ষোভে জ্বলিতে জ্বলিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন বঙ্কিমচন্দ্র কর্ণেলের নামে ফৌজদারীতে নালিস করিলেন। বিচারক, মাজিষ্ট্রেট সাহেব। তিনি ন্যায়বান্, বঙ্কিমচন্দ্রের গুণ-পক্ষপাতী। কর্ণেলের উপর সমন জারী হইল।

নগরের লোক কর্ণেলের বিরুদ্ধে এত উত্তেজিত হইয়াছিল যে, সাহেবকে গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া লুকাইয়া আসিতে হইয়াছিল। তবু সাহেব ঢিল খাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

সাহেব আসিয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইলেন। বিচার দেখিতে নগর ভাঙ্গিয়া লোক আসিতে লাগিল। বাঙ্গালী, সাহেবের নামে নালিশ করিয়াছে; তা আবার যে সে সাহেব নয়,—একটা সেনাদলের কর্ত্তা, গোটা কর্ণেল। তখনকার দিনে এ দৃশ্য নূতন। সুতরাং বিস্মিত, স্তম্ভিত অধিবাসীরা অশ্রুতপূর্ব্ব মোকর্দ্দমার বিচার দেখিতে আদালত-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। কেহ ডিপুটী বঙ্কিমকে, কেহ কর্ণেল সাহেবকে, কেহ বা বিচারককে দেখিতে আসিল; কেহ বা সকলে আসিতেছে দেখিয়া আসিল। উকীল, মোক্তার, কর্ম্মচারী নিজ নিজ কাজ ফেলিয়া মোকর্দ্দমা দেখিতে আসিল। এইরূপে আদালত-প্রাঙ্গণ জনতায় পরিপূর্ণ হইল।

এই মোকর্দ্দমার একটু বিশেষত্ব ছিল। বহরমপুরে সে সময় প্রায় দেড় শত উকীল মোক্তার ছিলেন। এই দেড় শত উকীল মোক্তার উপযাচক হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ওকালতনামায় দস্তখত করিলেন। সেই হেতু কর্ণেল সাহেব বড় বিপাকে পড়িলেন, তিনি যে উকীলের কাছে যান, সেই উকীলই বলেন, "আমি বঙ্কিম বাবুর

ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছি।" অবশেষে তিনি উকীল ছাড়িয়া মোক্তারের দ্বারস্থ হইলেন। সেখানেও তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল। কোনও মোক্তার বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সম্মত হইলেন না।

তখন কর্ণেল সাহেব মহাভীত হইয়া পড়িলেন। গবর্মেণ্টেরও চমক ভাঙ্গিল। কমিশনার সাহেব ছুটিয়া আসিলেন। সাহেব-মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সে সময় বহরমপুরে অনেক সাহেব বাস করিতেন। কমিশনার মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বয়ং কোনও অনুরোধ করিলেন না। তিনি ও অন্যান্য সাহেবেরা বেন্‌ব্রিজ সাহেবকে ধরিলেন।

বেন্‌ব্রিজ সাহেবের নাম কেহ কেহ শুনিয়া থাকিবেন। তিনি এক জন ভাল জজ ছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় বেন্‌ব্রিজ সাহেব বহরমপুরে জজ-রূপে অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গুণ-মুগ্ধ পুরাতন বন্ধু। সাহেবেরা তাঁহাকে ধরিলে তিনি বলিলেন, "কর্ণেল ডফিন বঙ্কিম বাবুকে অপমান করিয়াছেন। যদি তিনি বঙ্কিম বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমি মধ্যস্থতা করিতে পারি।"

ডফিন তদ্দণ্ডে স্বীকার পাইলেন। বেন্‌ব্রিজ সাহেব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া দিলেন। কর্ণেল সাহেব প্রকাশ্য আদালতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিম বাবু, তোমার যে হাত ধরিয়া তোমায় বলপূর্ব্বক ফিরাইয়া দিয়াছিলাম, তোমার সেই হাত ধরিয়া আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইলেন।

এখনকার দিনে সচরাচর দেখিতে পাই, রাজকর্ম্মচারীরা রাজপ্রসাদলাভাশায় বিবেক-বুদ্ধিকেও পদদলিত করিতে সঙ্কুচিত হন না। দোষ ঠিক তাহাদের নহে; না করিলে অনেক সময়ে চলে না—চাকরী থাকে না, তাই তাঁহারা করেন। কিন্তু এক এক জন মহাপুরুষ আছেন, তাঁহারা চাকরী অপেক্ষা বিবেকটাকে বড় মনে করেন—রাজপ্রসাদ অপেক্ষা আত্মপ্রসাদ শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গের এক জন ডিপুটি নিজের বিবেচনা-বুদ্ধিমত কার্য্য করিতে গিয়া তদানীন্তন ছোটলাট কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। বিলাতের কমন্স সভাতেও কথাটা উঠিয়াছিল।

প্রবল ঝটিকাঘাতেও ব্রাহ্মণসন্তানের বিবেক অক্ষুণ্ণ ছিল।

এই সকল মহাপুরুষদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রও একজন। তিনি রাজপ্রসাদলাভাশায় কখনও নিজের বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দেন নাই। এ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এক সময়ে আঠারটি বাকি খাজনার মোকর্দ্দমা বিচারের জন্য তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। তখনকার দিনে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটেরা বাকি খাজনার মোকর্দ্দমার বিচার ও নিস্পত্তি করিতেন। পরে মুন্সেফদিগের উপর সে ভার অর্পিত হয়। উক্ত মোকর্দ্দমা কয়টি কিছু দিন হইতে পড়িয়াছিল; বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষ ধনশালী জমিদার। এক পক্ষে উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন মান্যবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অপর পক্ষে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ জজ স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস বাবু সে সময় বহরমপুরে ওকালতি করিতেন। এই প্রথিতমানা উকীলদ্বয় মোকর্দ্দমা কয়টি মুলতবী রাখিবার জন্য হাকিমের নিকট এক-

যোগে প্রার্থনা করিলেন। হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আপনারা সময়ের প্রার্থনা করিতেছেন ?"

উকীল বাবুরা উত্তর করিলেন, "মোকর্দ্দমা মিট্‌মাট হইবার কথা হইতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সময় দিয়া মোকর্দ্দমাগুলি মুলতবি রাখিলেন।

পুনর্ব্বার মোকর্দ্দমা শুনানীর দিন উকীলদ্বয় পুনরায় সময়ের প্রার্থনা করিলেন। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার সময় কেন?"

উকীল। মোকর্দ্দমা মিটাইয়া উঠিতে পারি নাই —আরও কিছু সময় পাইলে মিটাইতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।

হাকিম। আপনাদের সময় দিতে আমার কোনও আপত্তি নাই; কিন্তু কমিশনর সাহেবের বিশেষ আপত্তি আছে। গতবারে আপনাদের প্রার্থনামত সময় দিয়াছিলাম; তজ্জন্য কমিশনর আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মন্তব্যটা শুনুন।

বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্যটা পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

মন্তব্যে কটাক্ষপাত ছাড়া একটু ভয়প্রদর্শনও ছিল। পাঠান্তে তিনি বলিলেন, “কমিশনরের আদেশ চুলোয় যাক্। আপনাদের যাহাতে সুবিধা হয়, তাহা আমি করিব,—প্রার্থনামত সময় দিলাম।”

এরূপ সাহস ডিপুটিদিগের মধ্যে বিরল। সাধারণের সুবিধা-অন্বেষণ না করিয়া আমরা সচরাচর সাহেব-প্রীতি অন্বেষণ করিয়া থাকি। কর্ত্তার কর্ত্তা কমিশনরের হুকুম উপেক্ষা করিতে কয় জনের সাহসে কুলায়

কিন্তু এ তেজ থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহেবেরা সম্মান করিতেন। একবার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল বহরমপুর পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া ছোটলাট সাতিশয় তুষ্ট হইলেন; বলিলেন, “তুমি ষ্টীমারে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।”

সাহেব একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। লাট সাহেবের জাহাজ ‘রোটাস্’ তখন মাঝ গাঙ্গে। তথায় পঁহুছিতে হইলে নৌকা

ভিন্ন উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নৌকায় উঠিবার উদ্যোগ করিতে-ছেন। তিনিও লাট-দর্শনে চলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের নৌকায় উঠিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সাহেবের ইচ্ছা নয় যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এক নৌকায় যান। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়া বলিলেন, "আপনাকে রাখিয়া নৌকা ফিরিয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যাইবে—আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছোটলাটের নিকট পঁহুছিতে পারিব না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আর কোনও আপত্তি না করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি আগে ছোটলাটের কাছে কার্ড পাঠাইব।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা অচিরে 'রোটাসে' গিয়া লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্ড পাঠাইলেন—বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিশ্রুতি মত কার্ড পাঠাইতে বিরত থাকিলেন।

ছোটলাট সম্ভবতঃ জাহাজের গবাক্ষ-পথ দিয়া আগন্তুকদের দেখিয়া থাকিবেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্ড পাইয়া তাহার পৃষ্ঠে লিখিলেন, "তুমি এক্ষণে

অপেক্ষা কর—ডিপুটি বঙ্কিমবাবুকে আগে পাঠাইয়া দাও।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বঙ্কিমবাবুকে হুকুম দেখাইলেন। বঙ্কিমবাবু মুগ্ধ হইলেন। সম্মানটুকু বড় সামান্য নয়। বাঙ্গালীর পক্ষে এ সম্মান ঘটিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র ডিপুটির ভাগ্যে এরূপ সম্মান বিরল।

যাঁহার আত্মসম্মান বোধ আছে, তিনি সচরাচর সকলের নিকট সম্মান পাইয়া থাকেন; যাঁহার সে বোধ নাই, তিনি অনেক স্থলে লাঞ্ছিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র একবার মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিমের প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উপলক্ষ—বেরা। বেরা-উৎসব খুব ধূমধামের সহিত প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইত - এখনও হয়; তবে সে জাঁক জমক আর নাই। ভাগীরথী-বক্ষে প্রকাণ্ডকায় ভেলা ভাসাইয়া, তাহাকে পত্রপুষ্পে সমাচ্ছাদিত করা হইয়া থাকে। মাথার উপর স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ—স্তম্ভে স্তম্ভে উজ্জ্বল দীপালোক। মখমলমণ্ডিত ভেলার উপর, রূপ-যৌবনপ্রফুল্ল নর্ত্তকীবৃন্দ। নর্ত্তকীর ভেলার চতুর্দ্দিকে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের ভেলা; তার চারি দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকের ভেলা। শেষোক্ত ভেলার উপর মানুষ নাই—

শুধু কলাগাছ। কলাগাছের গায়ে, মাথায় অসংখ্য আলো। সুন্দর দৃশ্য! মাথার উপর ভাদ্রমাসের নির্ম্মল আকাশ—পদনিম্নে ভরা গাঙ্গের প্রেমময় উচ্ছ্বাস। ছোট ছোট ঢেউগুলির চুম্বন-আবেগে ভেলা নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

সমারোহ শুধু গঙ্গাবক্ষে নয়—সমারোহ নবাবের প্রাসাদে—ভোজে। ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া এই উৎসবে ও ভোজে যোগদান করিতেন। বাঙ্গালীরাও নিমন্ত্রিত হইতেন। জেলার বড় বড় জমিদার, রাজকর্ম্মচারী ও উকীল নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। তবে তাঁহাদের ভাগ্যে সম্মান আদর বড় একটা জুটিত না। সাহেবেরা প্রত্যেকে এক এক ছড়া জরির মালা পাইতেন—বাঙ্গালী অতিথিরা তাহা পাইতেন না। বাঙ্গালীর মধ্যে সব্‌জজ বাবু দিগম্বর বিশ্বাস ও নবাবের উকীল (স্যর) শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মালা পাইতেন। দিগম্বর বাবু হ্যাট কোট পরিয়া সাহেবদের দলে মিশিতেন বলিয়া পাইতেন, গুরুদাসবাবু, নবাবের উকীল বলিয়া পাইতেন। অন্যান্য উকীল, ডিপুটি ও মুন্সেফদের ভাগ্যে মালা

জুটিত না। মালা যে বহুমূল্য, তা নয়; তবে মালায় একটা সম্মান। তা' ছাড়া ভোজে ও অভ্যর্থনায় একটা পার্থক্য রক্ষিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসিয়া এ সকল ব্যাপার শুনিলেন।

তার কয়েক মাস পরে নবাবের কর্ম্মচারী যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন, "আপনি আমায় নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বলিয়া নয়—আমি রাজ-কর্ম্মচারী বলিয়া। শুনিতে পাই, আপনারা নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া রাজকর্ম্মচারীর উপযুক্ত সম্মান প্রদান করেন না। এরূপ অবস্থায় আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি না।"

কর্ম্মচারী বিস্মিত হইয়া কার্ড ফিরাইয়া লইয়া গেলেন; এবং নবাব ও দেওয়ানের নিকট সকল কথা বলিলেন। তাঁহাদের তখন নয়ন উন্মীলিত হইল। নবাবের আজ্ঞানুক্রমে দেওয়ান বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আসিলেন; বলিলেন, "আমাদের ত্রুটী হইয়াছে; ভবিষ্যতে আর হইবে না, সাহেবেরা যেরূপ সম্মান পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালীরাও তদ্রূপ পাইবেন।"

বাঙ্গালীরা পাইয়াছিলেনও তাই। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন, সকল হিন্দুই মালা পাইয়াছিলেন, এবং সাহেবদের সঙ্গে সমান আদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। *

১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে "বঙ্গদর্শন" প্রথম প্রকাশিত হয়। সে কথা পরে বলিব। এই সময়ে—"বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইবার পর—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের একবার সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎটা সম্ভবতঃ বহরমপুরেই হইয়াছিল। রমেশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" ও "বঙ্গদর্শন" পাঠে বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষা এত সুন্দর হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি তোমার যদি এতই অনুরাগ হইয়া থাকে, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন?"

রমেশ বাবু। আমি বাঙ্গালা লিখ্‌ব! আমি জীবনে কখনও বাঙ্গালা লিখি নাই—লিখিবার প্রণালীও জানি না।

---

* এই শেষোক্ত গল্প তিনটি স্তর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সম্প্রতি শুনিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র। লিখিবার প্রণালী আবার কি? তোমার মত শিক্ষিত ব্যক্তি যে ধারায় লিখিবে, সেই ধারাই প্রণালী।

কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় রমেশ বাবুকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ইংরাজি রচনা কখনও স্থায়ী হইবে না। অন্য লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। তোমার খুড়া গোবিন্দচন্দ্র, শশীচন্দ্র এবং মধুসূদন দত্ত, হিন্দু কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র; গোবিন্দ ও শশী যে সকল ইংরাজি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা অত্যল্প কালের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মধুসূদন দত্তের বাঙ্গালা কবিতা কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না,—বাঙ্গালা সাহিত্য যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহা বর্ত্তমান থাকিবে।" *

ইহার দুই বৎসর পরে রমেশ বাবুর "বঙ্গবিজেতা" প্রকাশিত হইল। তা'র পর তাঁহার আরও কত উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। সে সকল সহজে ধ্বংস হইবার নয়। কিন্তু তাঁহার "Lays of Ancient India" ধ্বংসোন্মুখ। গোবিন্দ দত্তের "Cherry Blossom", শশী দত্তের "Vision of Sumeru" বিলুপ্ত হইয়াছে। মধুসূদন দত্তের

* Dutt's Literature of Bengal. P, ২২১.

"Captive Ladie" কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার 'মেঘনাদবধ' অবিনশ্বর।

বঙ্কিমচন্দ্রও এক দিন "Rajmohan's wife" নামক গল্প ইংরাজি ভাষায় লিখিয়াছিলেন। গল্প শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি "Rajmohan's wife" ও "Adventures of a young Hindu" ছাড়িয়া "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই রকম ভুল অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির ঘটিয়া থাকে। তবে কেহ বঙ্কিমচন্দ্র বা মধুসূদন দত্তের ন্যায় ভুল শোধরাইয়া লয়েন, কেহ বা গোবিন্দচন্দ্র বা শশীচন্দ্রের মত, ভুলেই আজীবন বিভোর থাকেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসিয়া প্রথম প্রথম কাহারও সহিত মিশিতেন না — লোকেও তাঁহার সহিত মিশিত না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতই একটু দাম্ভিক। তাঁহার গর্ব্ব, তাঁহার তেজ দেখিয়া লোকে সরিয়া দাঁড়াইত; তিনিও লোকের প্রীতি কুড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেন না।

কিন্তু দুই এক বৎসর তথায় থাকিতে থাকিতে

বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের ভাগ্যে এতটা জনপ্রীতি সচরাচর জুটে না। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ছুটি লইয়া বহরমপুর হইতে বিদায় হইলেন। জন-সাধারণ সাতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে থাকিতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিল। শুনিয়াছি, প্রায় দেড় শত অনুরোধ-পত্র তাঁহার নিকট আসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি কিছুতেই থাকিতে পারিলেন না।

তখন তাঁহার বিনোদনার্থ অশ্রুতপূর্ব্ব বিদায়ভোজের আয়োজন হইতে লাগিল। স্থানীয় অধিবাসীরা চাঁদা তুলিয়া সাত দিন ব্যাপী আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র জঠরে বড় বেশী টাকা প্রবিষ্ট হইতে পারে না, কিন্তু বাঙ্গালী যেমন কাঙ্গালীভোজন করাইয়া, অনাথ কাঙ্গালকে বস্ত্র দান করিয়া অর্থব্যয় করিতে পারে, এমনটা বুঝি আর কোনও জাতি পারে না। সমবেত দীন দুঃখীরা উদর পূরিয়া খাইয়া যখন "বঙ্কিমচন্দ্রের জয়" রবে দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত করিল, তখন কি বিধাতার আশীর্ব্বাদ আকাশ হইতে বর্ষিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের শিরোদেশে পড়ে নাই?

সুধু যে দেশবাসীরা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা নহে; ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর সকলেই তাঁহাকে বহরমপুরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন ছুটীর দরখাস্ত করিলেন, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তোমায় আমি কোনও মতে ছাড়িয়া দিতে পারি না।" বঙ্কিমচন্দ্র তখন কমিশনর সাহেবকে ধরিলেন; বলিলেন, "সাহেব, আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, আমায় তিন মাসের ছুটী দাও।"

কমিশনর সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমায় আমি বা ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়িয়া দিতে পারি না। তবে তুমি যদি স্বীকৃত হও যে, ছুটীর পর আবার এখানে আসিবে, তাহা হইলে তোমায় ছাড়িয়া দিতে পারি।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "এখানে আসিতে আর ইচ্ছা নাই। আপনি জানেন ত এখানকার জলবায়ু বড় খারাপ।" *

* তখন বহরমপুরের জলবায়ু বড় অস্বাস্থ্যকর ছিল।

কমিশনর সাহেব উত্তর করিলেন, "তবে এক কাজ কর,—তুমি Casual leave (ছুটী) লও।"

বঙ্কিমচন্দ্র। Casual leave লইয়া কি হইবে? দুই চারি দিনের ছুটী পথেই ফুরাইয়া যাইবে।

কমিশনর। তুমি যতবার ইচ্ছা, Casual leave প্রার্থনা কর, আমি কোনও আপত্তি না করিয়া মঞ্জুর করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের অনুগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; এবং যত দিন পারিয়াছিলেন, ততদিন একদিনেরও ছুটী না লইয়া কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন আর পারিলেন না, তখন ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট লইয়া Medical leaveএর দরখাস্ত করিলেন। এ ছুটি না দিয়া কমিশনর থাকিতে পারেন না, তথাপি তিনি দরখাস্ত চাপিয়া রাখিলেন। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র, ড্যাম্পিয়ার সাহেবকে পত্র লিখিলেন। ড্যাম্পিয়ার তখন ছোটলাটের আফিসে সেক্রেটারি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গুণানুগত বন্ধু। ড্যাম্পিয়ার অবিলম্বে বঙ্কিমচন্দ্রকে ছুটী দিয়া মুক্তিপ্রদান করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে অবস্থান কালে বেশ সুখে

ছিলেন। ধন জন মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সকলই তাঁহার ছিল। এখানে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার তিন খানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং যশও যথেষ্ট হইয়াছিল। বহরমপুরে বদলি হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাসের ছুটী লইয়া একবার দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। বারাণসী-ধামে গিয়া প্রায় দেড়মাস বাস করেন। সেখানে কোন কাজ ছিল না, সুধু "মৃণালিনীর" প্রুফ দেখিতেন।

—:০:—

হুগলী।

—*—

বঙ্কিমচন্দ্র ছুটী লইয়া বহরমপুর হইতে বিদায় হইলেন। ছুটী-অবসানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে বারাসতে আসিলেন। সেখানে অতি অল্প সময় থাকিয়া সেই বৎসরেই মালদহে বদলী হইয়া আসিলেন। মালদহের জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইল না; তিনি কয়েক মাস মাত্র তথায় থাকিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২২এ জুন হইতে নয় মাসের ছুটী লইয়া গৃহে আসিলেন।

গৃহে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, “রাধারাণী” ও “কৃষ্ণকান্তের উইল” লিখিতে লাগিলেন। তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের ফুল-বাগান, উদ্যান-বাটী, অর্জ্জুনা দীঘী ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি সেই ছবি তুলিয়া লইয়া তাহাকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া “কৃষ্ণকান্তের উইলে” বসাইলেন।

বঙ্গদর্শন পূর্ণতেজে তখনও চলিতেছে। পরমারাধ্য যাদবচন্দ্র “বঙ্গদর্শনে”র হিসাব প্রভৃতি রাখিতেন; সঞ্জীবচন্দ্র মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরিদর্শন করিতেন; বঙ্কিমচন্দ্র সুধু সম্পাদন করিতেন।

১২৮২ সালের চৈত্র মাসে—ইংরাজি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে—বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলী হইলেন। কাঁটাল-পাড়া হইতে হুগলী একঘণ্টার পথও নয়। বঙ্কিমচন্দ্র গৃহ হইতে হুগলী যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক দিনের জন্য মাত্র। ১২৮৩ সালের প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র কোনও কারণবশত “বঙ্গদর্শন” উঠাইয়া দিয়া সপরিবারে চুঁচুড়ায় চলিয়া গেলেন।

১২৮২ সাল বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস “কৃষ্ণকান্তের উইল” লিখিত হয়; এই বৎসর বঙ্গদর্শন উঠিয়া যায়; এই সময়

তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সমুদিত হয়; এই বৎসরেই তাঁহার কোনও নিকটাত্মীয়ের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

১২৮২ সালের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভাব বদ্ধমূল হয়—আত্মীয়ের সহিত মনোমালিন্য বিদূরিত হয়—বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত করিবার আয়োজন হয়।

ধর্ম্মভাবের সূচনা পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু হইয়াছিল—কোনও কারণ অবলম্বনে সহসা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আসন্নপ্রসবা, তখন তিনি রাধাবল্লভের মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া সাশ্রুনয়নে ঠাকুরকে কত ডাকিয়াছিলেন। লোক-চক্ষুর সম্মুখে এই তাঁহার প্রথম ডাক। তার পর দুই তিন বৎসর যাইতে না যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আবার কাতর হইয়া রাধাবল্লভের চরণে পড়িতে দেখিলাম। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র কঠিন রোগ-গ্রস্ত—মরণাপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি-শেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রিতাবস্থায় নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম বংশীবদন রাধাবল্লভকে স্বপ্নে দেখিলেন। পরদিন ঠাকুরের নির্ম্মাল্য আনিয়া শিশুর মাথায় দিলেন। শিশু

অচিরে আরোগ্য লাভ করিল। তদবধি বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হইল—ভক্তির ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইল।

কিন্তু ইহা নির্ঝরিণী মাত্র। ঝঙ্কার নাই, শব্দ নাই, শক্তি নাই। প্রৌঢ়ে এই নির্ঝরিণী স্রোতস্বতীতে পরিণত হইয়াছিল। তার পর বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীকে বিশালতরঙ্গময়ী কূল-পরিপ্লাবিনী নদীতে পরিণত হইতে দেখিয়াছি। বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ হইতে আমরা "কৃষ্ণচরিত্র" ও "ধর্ম্মতত্ত্ব" কুড়াইয়া পাইয়াছি। আর শিক্ষা পাইয়াছি, স্বল্প জ্ঞান—অহঙ্কার ও নাস্তিকতায় পর্য্যবসিত হয়; আবার সেই জ্ঞান যত বাড়িতে থাকে, ততই আমাদের মন ঈশ্বরমুখী হয়।

দয়া ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে বরাবরই ছিল। একটা ছোট গল্প বলিব। চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর তলায় প্রতিবৎসর বৈশাখমাসে খুব জাঁক জমকের সহিত মেলা বসিত। এখন বসে কি না জানি না; কিন্তু আগে এই মেলা উপলক্ষে খুব ধূমধাম হইত। আমি চৌত্রিশ বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি। তখন বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। এক বৎসর মেলা উপলক্ষে বহু

যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। চুঁচুড়ার অপর পার হইতে অনেক লোক মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় অনেক লোক উঠিয়াছে। তিলধারণের স্থান নাই, তবু মাঝি বোঝাই লইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে নিষেধ করিলেন—আইনের ভয় দেখাইলেন, মাঝি তবু শুনিল না,—মনের মত বোঝাই লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিছু দূর যাইতে না যাইতে নৌকাখানি উল্টাইয়া গেল। নৌকারোহীরা কেহ মরিয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। ডাঙ্গা নিকটে ছিল, মাঝিরা নৌকা টানিয়া আনিয়া ডাঙ্গায় লাগাইল। বঙ্কিমচন্দ্র তদ্দণ্ডে মাঝিকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিলেন। পুলিস মোকদ্দমা রুজু করিল।

মাঝির নাম গোবিন্দ; লোকে সচরাচর তাহাকে গোবে বলিয়া ডাকিত। তাহার বাড়ী কাঁটালপাড়া ও ভাটপাড়ার মধ্যস্থল—মালাপাড়ায়। তাহার স্ত্রী ও দুইটি কন্যা ছিল। পুত্র হয় নাই।

মাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া মাঝিকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন, এবং তাহার প্রতি তিন মাস কারাবাসের

আদেশ প্রদান করিলেন। হতভাগ্যকে কারাবাহিরে আর আসিতে হইল না। তথায় তাহার মৃত্যু হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র সে সংবাদে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু যতদিন হতভাগ্য মাঝির বিধবা পত্নী বাঁচিয়া ছিল, ততদিন তিনি তাহাকে মাসে মাসে বৃত্তি প্রদান করিয়া আসিয়াছেন।

দয়া থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র সময় সময় বড়ই কঠিন হইতেন। একবারের একটি ঘটনা বলিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহার নাম রাখালচন্দ্র। রাখালচন্দ্র জিরেট বলাগড়ে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তথায় এক ব্যক্তি তাঁহার কুটুম্ব ছিলেন। কুটুম্বের নাম—দ্বারিকাদাস চক্রবর্ত্তী। তিনি প্রায়ই কাঁটালপাড়ায় আসিতেন। সেই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া-ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীতে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তিনি নৌকা করিয়া হুগলীতে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। দ্বারিকাদাস একদা আসিয়া বলিলেন, "বঙ্কিমবাবু, আজ আপনার নৌকায়

আমি হুগলী যাইব।" বঙ্কিমচন্দ্র সাহ্লাদে বলিলেন, "বেশ।" উভয়ে নৌকায় উঠিলেন। তাঁহারা দুই জন ছাড়া নৌকায় আর কোন ভদ্র আরোহী নাই। নৌকা যখন মধ্যপথে, তখন দ্বারিকাদাস একটি মোকর্দ্দমার গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। মোকর্দ্দমাটি—ফৌজদারী; ঘটনাস্থল—জিরেট; তাঁহার কোনও বন্ধু বা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি মোকর্দ্দমায় লিপ্ত। গল্পটি শেষ করিয়া দ্বারিকা-দাস বলিলেন, "বঙ্কিমবাবু, আপনার হাতে মোকর্দ্দমা—আসামীকে কিছু শাস্তি দিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া মাঝিদের আদেশ করি-লেন, "নৌকা ভিড়াও!" নিকটে চর ছিল, মাঝিরা অবিলম্বে নৌকা লাগাইল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন চীৎকার করিয়া আদেশ করিলেন, "লোকটাকে নৌকা হতে ফেলে দে।" দ্বারিকাদাস নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। কিরূপে তিনি গৃহে ফিরিয়াছিলেন, তাহা অবগত নহি। কাঁটালপাড়ায় তিনি আর দর্শন দেন নাই. বলিয়া শুনিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন—এমন কি সময় সময় আত্মবিস্মৃত হইতেন। কোন একটা বিষয়ে

তাঁহার মন আকৃষ্ট হইলে তিনি সেই বিষয়ে এতই নিবিষ্ট-চিত্ত, এতই তন্ময় হইতেন যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইতেন। একবার চুঁচুড়ায় "মৃণালিনী"র অভিনয় হয়। অভিনয় করেন, 'বেঙ্গল থিয়েটার' সম্প্রদায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আহ্বানে তাঁহারা চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন কি না, তাহা ঠিক জানি না। তবে যাঁহারা 'কন্‌সার্ট' বাজাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক-জনের মুখে শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের নিমন্ত্রণে সম্প্রদায় চুঁচুড়ায় অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন। অনেক গণ্য মান্য লোক অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও অবশ্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে ব্যোমকেশের অভিনয় দেখিতেছিলেন। যেখানে ব্যোম-কেশ, মৃণালিনীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, আর পদাঘাত খাইয়া বলিতেছে, "ও চরণস্পর্শে মোক্ষপদ পাইব। সুন্দরি! তুমি আমার দ্রৌপদী--আমি তোমার জয়দ্রথ"—সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র আত্মহারা ও বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইলেন। তারপর যখন অকস্মাৎ গিরিজায়া, ব্যোমকেশের পশ্চাতে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠ দংশন করিল, ও বলিল, "আর আমি তোমার অর্জ্জুন"—তখন বঙ্কিমচন্দ্র

সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া মহাবেগে লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার এ কার্য্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, লক্ষ্য করিবার বিষয়ও বটে। এ আত্মবিস্মৃতি, এ তন্ময়ত্ব সংসারে দুর্লভ। কিন্তু কবিদের নিকট, মহাপ্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট এ তন্ময়ত্ব অপরিচিত বস্তু নহে।

হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় পাঁচ বৎসর ছিলেন। এই পাঁচ বৎসর বৃথা যায় নাই। মান সম্ভ্রম অর্থসমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল। হুগলীর কলেক্টার, বঙ্কিমচন্দ্রের উপর জেলার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; ডিবিজন্যাল কমিশনর বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে Personal assistant করিয়া লইয়াছিলেন।

পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রচুরপরিমাণে আসিয়া তাঁহার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল; সাধের "বঙ্গদর্শন" আবার মাথা তুলিল; "কমলাকান্তের পত্রাবলী", "রাজসিংহ", "মুচিরামগুড়ের জীবন চরিত", "কমলাকান্তের জবানবন্দী", "আনন্দমঠ" প্রভৃতি লিখিত হইয়া বঙ্গদর্শনে একে একে প্রকাশিত হইতে লাগিল। "আনন্দমঠ",

"বঙ্গদর্শনে" বাহির হইবার অনতিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী ত্যাগ করিলেন।

হুগলীতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম, H. A. D. Phillips. তিনি বর্দ্ধমানে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ফিলিপস্ শুধু যে এক জন দক্ষ সিবিলিয়ন ছিলেন, তা' নয়—তিনি নানাভাষাভিজ্ঞ মহাপণ্ডিত ইংরাজ-কুলপ্রদীপ ছিলেন। এই ফিলিপস্ সাহেবই "কপালকুণ্ডলা" ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া যশ কিনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যানুরাগ জগতে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে লোকান্তরিত হইলেন।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দগোপাল ঘোষ মহাশয় একটী ঘটনার কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সুদেবচন্দ্রের পত্রখানি যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম —

আমি অনেক দিন আগেকার কথা বলিতেছি; বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে বাসা করিয়া থাকিতেন; ভূদেব বাবুর বাটীও

নিকটে ছিল। উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রণয় ছিল, বঙ্কিম বাবু মধ্যে মধ্যে ভূদেববাবুর বাটীতে আসিতেন, ভূদেব-বাবুও মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমবাবুর বাটীতে যাইতেন।

একদিন ভূদেববাবুর বাড়ীতে উভয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় ললিতবাবু * ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবুর সহিত মহেশ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। মহেশ ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি উপাধিতে ভূষিত হন নাই, বা ইডেন্ সাহেবের (ছোট লাটের) নিকট তখনও বিশেষরূপে সম্মানিত হন নাই। ভূদেববাবুর সহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিশেষ আলাপ ছিল। ভূদেব বাবু সহসা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাও বোধ হয় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে? তাই বুঝি বিদায় মারিতে আসিয়াছ?"

উত্তরে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না—না, ললিতবাবুর কাছে একটা বৈষয়িক কাজে আসিয়াছি।"

যদিও কথাটা সত্য, কিন্তু ললিতবাবু তামাসা করিবার

* রায় ললিতমোহন সিংহ বাহাদুর—বাঁশবেড়িয়ার জমিদার।

সুযোগটা ছাড়িলেন না,—বলিলেন, "বটে! এখনি বামাল ধরিয়া দিব, গাড়ীতে কলসী এখনও মজুত আছে।"

বাস্তবিক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গাড়ীতে তখন একটা নূতন পিতলের কলসী ছিল। বঙ্কিমবাবু আর থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন,—"অধ্যাপক মহাশয়, আপনি এখনও যদি শ্রাদ্ধে বিদায়ের কলসী গ্রহণ করেন, তবে সেই সঙ্গে একগাছি দড়ীও লইবেন।"

এইরূপে দড়ি কলসী লইয়া প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদ্বয়ের প্রথমালাপ হয়।

চুঁচুড়ায় যে বাটীতে বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন, সে বাটী আজও আছে। বাটীটি প্রশস্ত, দ্বিতল,—ঠিক গঙ্গার উপর। বারান্দার নীচে দিয়া জাহ্নবী বহিয়া চলিয়াছে। মাথার উপর নীলাকাশ, পদনিম্নে কুলু কুলু ধ্বনি, সম্মুখে ধবলতরঙ্গা জাহ্নবী। বঙ্কিমচন্দ্র সে দৃশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ-বীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল

চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল।" *

এই দৃশ্য—কাব্য-রাজ্যের এই মনোরম চিত্রপট বঙ্কিমচন্দ্রের নবোদ্গতপত্র-তুল্য কোমল হৃদয়ে অনপনেয় রাগে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। হুগলী ত্যাগের পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন "দেবী চৌধুরাণী" লিখিতেছিলেন, তখনও তাঁহার মানসপটে এ চিত্র অঙ্কিত ছিল। তিনি কোমল তুলিকা লইয়া ভিন্ন আধারে ভিন্ন বর্ণে সেই কাব্য-রাজ্য অঙ্কিত করিলেন। তবে সে চিত্র যেন আরও সুন্দর—বর্ণ যেন আরও উজ্জ্বল—কুলুকুলু ধ্বনি যেন আরও কোমল। একটু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এখন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে

* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত।

কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল ফল পাতা বাহিয়া তীব্রস্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে আঁধারে সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে।" *

হাবড়া।

—*—

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী হইতে হাবড়া আসিলেন। আসিবার পরই সি, ই, বক্‌লণ্ডের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোরতর বিবাদ বাধিল। তখন সাহেব,

---

* দেবী চৌধুরাণী—দ্বিতীয় খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হাবড়ার কলেক্টার। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কেন না, বঙ্কিমচন্দ্র পুলিস্-চালানি মোকর্দ্দমাগুলি প্রায় ছাড়িয়া দিতেন,—পুলিসের কোনও আব্দার রক্ষা করিতেন না। সুতরাং কোন্ পুলিসের কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেট, বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন?

ধূমায়মান বহ্নি ক্রমে জ্বলিয়া উঠিল। একটি ঘটনা উপলক্ষ হইল। ঘটনাটির একটু বৈচিত্র্য আছে, তাই সবিশেষ বিবরণ দিলাম।

হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটী হইতে নোটিস্ জারি হইল, কেহ combustible পদার্থ দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন করিতে পারিবে না; যদি করে, দণ্ডার্হ হইবে। এই নোটিস প্রথমে ইংরাজিতে লিখিত হয়; পরে বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া সহরময় প্রচার করা হয়। অনুবাদ করেন—ডনিথরণ সাহেব। তিনি তখন মিউনিসি-প্যালিটীর সেক্রেটরী। অনুবাদটি অতি সুন্দর,—Combustible শব্দের অর্থ করা হইল, জলীয়। তিনি জলীয় কি অলীয় লিখিয়াছিলেন, আমি তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।

এই 'জলীয়' নোটিস এক বুড়ীর মাথায় পড়িল। তাহার একখানি গোলপাতার আচ্ছাদন-যুক্ত ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। বুড়ী লেখা পড়া জানে না; জনৈক প্রতিবেশীকে দিয়া নোটিস পড়াইল। সে দিগ্‌গজ-জাতীয় পণ্ডিত, বৃদ্ধাকে পরামর্শ দিল, জল দিয়া ঘর ছাইও না। বৃদ্ধা আশ্বস্ত হইল। তাহার এবম্প্রকার কোনও অভিপ্রায় ছিল না। সে তাহার গোলপাতার ঘরখানিকে কোনও রকমে জলযুক্ত হইতে দিল না। আচ্ছাদনটি তখন বেশ Combustible.

কিছুদিন গত হইতে না হইতে মিউনিসিপ্যালিটীর অনুচরেরা বুড়ীকে আসিয়া ধরিল। চেয়ারম্যান সাহেব সেই অশীতিপর বৃদ্ধাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মোকর্দ্দমা বিচারের ভার বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অর্পণ করিলেন।

বিচার করিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, বৃদ্ধাকে অনর্থক পীড়ন করা হইয়াছে। যে নোটিসের অর্থ বিচারক স্বয়ং বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, সে নোটিসের অর্থ বুড়ী কিরূপে বুঝিবে? তিনি বৃদ্ধাকে অব্যাহতি দিয়া রায়ে লিখিলেন, "নোটিসের অর্থ বোধগম্য হইল

না। নোটিস insufficient বোধে আসামীকে মুক্তি দিলাম।"

বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে কি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিয়াছিল, কেন তাহাকে সরকার বাহাদুর ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেনই বা অবশেষে ছাড়িয়া দিয়াছিল? সে হয় ত ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল, কোনও রকমে এক আধ ফোঁটা জল চালের মাথায় পড়িয়া থাকিবে; অতঃপর জলবিন্দু রৌদ্রতেজে শুকাইয়া যাওয়াতে সে খালাস পাইয়াছিল।

বুড়ী খালাস পাইল দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বক্লণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে নথি তলব করিয়া তিনি জজমেণ্টের উপর মন্তব্য লিখিলেন,—"Bankim Chandra's vanity in the knowledge of Bengali language has misled the judgment—"

এই মন্তব্য পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় রোষান্বিত হইলেন; এবং ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিলেন, "You are not my judicial superior officer; and

you have no right to criticise my judgment." তিনি আরও লিখিলেন, "তুমি যদি এ জন্য আমার নিকট এক মাসের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না কর, তাহা হইলে তুমি কাগজপত্র কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইবে।"

এক মাস গত হইয়া গেল; বক্‌লণ্ড সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না—কাগজপত্রও কমিশনরের নিকট পাঠাইলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কমিশনর সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কমিশনর বুঝি তখন বিম্‌স সাহেব ছিলেন। কিছু দিন পরে বিম্‌স সাহেব হাওড়ায় আসিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

এদিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তাদার কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি অবিলম্বে প্রভু বক্‌লণ্ডের কাছে ছুটিয়া গিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন। সাহেব বোধ হয় একটু ভীত হইলেন। ভয়—মানের জন্য; তা'তে আবার তিনি পাকা ম্যাজিষ্ট্রেট নহেন—একটিং মাত্র। তিনি জানিতেন যে, জজ-

মেণ্টের উপর মন্তব্য লেখা তাঁহার অন্যায় হইয়াছে; কিন্তু অধীনস্থ নেটিভ ডিপুটি যে এতটা করিয়া তুলিবে, তাহা তাঁহার ধারণায় আসে নাই; এক্ষণে যাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত মিটিয়া যায়, তদভিপ্রায়ে তিনি সেরেস্তাদারকে বলিলেন, "অপরাহ্নে বঙ্কিমচন্দ্র যখন আদালত ত্যাগ করিয়া গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিবেন, তখন আমায় সংবাদ দিবে।"

সেরেস্তাদার তাহাই করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে লইতে যখন গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি ছুটিয়া গিয়া সাহেবকে সংবাদ দিলেন। সাহেব তৎক্ষণাৎ আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বারান্দায় ধরিলেন। বুদ্ধিমান্ বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাপারটা কি, কতক বুঝিলেন। সাহেব বলিলেন, "Have you seen, Bankim Babu, what remarks I have made about you in my annual report?"

Bankim:—It is not my habit to inquire what District Magistrates write about me in their reports.

Buckland:—I have spoken very highly of you.

Bankim :—I don't care to know that.

সাহেব একটু মুস্কিলে পড়িলেন। এ রকম কড়া কড়া উত্তর পাইবেন তাহা তিনি মনে করেন নাই। কথাগুলায় একটা ধন্যবাদ, বা একটুও কোমলত্ব নাই। সাহেব তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "বঙ্কিম বাবু, কিছু দিন পূর্ব্বে তোমার জজ্-মেণ্টের উপর একটা মন্তব্য লিখিয়াছিলাম বলিয়া তুমি কাগজপত্র গভর্মেণ্টে পাঠাইতে বলিয়াছিলে; আমি অনুরোধ করিতেছি বঙ্কিম বাবু, তুমি তোমার সে পত্র ফিরাইয়া লও।"

বঙ্কিমচন্দ্র। তুমি ক্ষমা (apology) না চাহিলে কিছুতেই ফিরাইয়া লইব না।

সাহেব। ম্যাজিষ্ট্রেটের একটা প্রেষ্টিজ আছে স্বীকার কর?

বঙ্কিম। আছে, কিন্তু সকলে তা' রাখিতে জানে না।

সাহেব। আচ্ছা বঙ্কিম বাবু, এক কাজ করা যাক্;—আমি আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করি—তুমিও তোমার পত্র উঠাইয়া লও।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্মত হইলেন। সাহেব তাঁহার মন্তব্যের

নিম্নে লিখিলেন,—" I regret I passed the above remarks ; I withdraw them."

বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় পত্রের প্রত্যাহার করিলেন। তদবধি মহানুভব বক্‌লণ্ড সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, এবং আজীবন তাঁহার হিতৈষী সুহৃদ্‌ ছিলেন। তাঁহার বঙ্গ-বিশ্রুত পুস্তকে (Bengal under the Lieutenant Governors) বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা তদানীন্তন ছোটলাট Sir Ashley Eden সাহেবের কাণেও উঠিয়াছিল। বোধ হয় কমিশনর সাহেব তুলিয়া থাকিবেন। উচ্চহৃদয় বঙ্গেশ্বর বিরক্ত না হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আরও সদয় হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বরাবর একটু স্নেহ নয়নে দেখিতেন। একদা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "তোমার বই খুব popular—বোধ হয় বেশ বিক্রয় হয় ?"

বঙ্কিমচন্দ্র। আমাদের দেশ বড় গরীব, বেশী বিক্রয় হয় না।

সাহেব। দাম কমাইয়া দুই তিন টাকায় বেচিতে পার না ?

বঙ্কিম। এক টাকা দামেও যে লোকে কিনিয়া উঠিতে পারে না।

আর একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বঙ্কিম বাবু, তোমার পিতা আজও জীবিত আছেন?"

"আছেন।"

"কতদিন তিনি পেন্‌সন ভোগ করিতেছেন?"

"পঁচিশ বৎসরের কম হ'বে না।"

বক্লেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ বঙ্কিমবাবু, পঁচিশ বৎসর চাক্‌রী করিলে আমরা পেন্‌সন্ দিয়া থাকি; তোমার পিতা পঁচিশ বৎসর পেন্সন্ পাইতেছেন, তাঁকে পেন্সনের পেন্সন দেওয়া আমাদের উচিত।"

তা'র কিছুকাল পরেই—অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের দেবোপম পিতা—পরমারাধ্য যাদবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। ১২০১ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১২৮৭ সালে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অপাপবিদ্ধ আত্মা, রাজতুল্য সম্মান লইয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি গল্প আছে, তাহা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পিতার মৃত্যু।

—:*:—

একজন সন্ন্যাসীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাদব-চন্দ্রের বয়স যখন আঠার বৎসর, তখন তিনি এই সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। যে অবস্থায় দীক্ষিত হন, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। মন্ত্র দিয়া বিদায় হইবার সময় সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, তিনি আরও তিনবার দর্শন দিবেন। দর্শনও দিয়াছিলেন; কিন্তু তিন বারের কথা অবগত নহি। শুনিয়াছি, প্রথমবার নাকি বর্দ্ধমানে দর্শন দিয়াছিলেন। অপর দুইবারের কথা এক্ষণে আমি বলিব।

যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে সন্ন্যাসী, কাঁটাল-পাড়ার বাটীতে আসিয়া দর্শন দিলেন। যাদবচন্দ্র তখন পূজার দালানে তক্তপোষের উপর ঢালা বিছানায় বসিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত দিন তিনি এই খানেই অতিবাহিত করিতেন। এইখানে বসিয়াই তিনি বঙ্গ-দর্শনের কার্য্যাদি করিতেন—প্রজা বা গ্রামবাসীদের

মামলা মোকর্দ্দমা করিতেন। তাঁহার ডাহিনে একখান স্বতন্ত্র তক্তপোষের উপর গালিচা বিছান থাকিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদি আসিয়া তাহাতে বসিতেন। বামে একখানা তক্তপোষ ছিল, তাহাতে ভদ্রলোকের উপযোগী শয্যা বিস্তৃত থাকিত। তাঁহার বিছানায় পৌত্র, পৌত্রী ছাড়া অপর কেহ বসিত না। পুত্রেরা যখন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তখন তাঁহারা প্রায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা যদি অনুমতি প্রদান করিতেন, তবে তাঁহারা বসিতেন; কিন্তু সঙ্কোচে, পৃথগাসনে। আমি কখন বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার পিতার সম্মুখে চেয়ারে উপবেশন করিতে দেখি নাই, পিতার সঙ্গে এক শয্যাতেও বসিতে দেখি নাই।

সন্ন্যাসীর কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। বলিতেছিলাম, যাদবচন্দ্রের গুরুদেবের কথা। তিনি যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিয়াছিলেন। দর্শনের বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। যাদবচন্দ্র দালানে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিলেন, এমন সময় গুরুদেব আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শুভ্রদেহ জটাজুটমণ্ডিত, তেজোদীপ্ত, দীর্ঘা-

কার মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া যাদবচন্দ্র বিস্মিত হইলেন। তিনি গুরুদেবকে চিনিতে পারিলেন না, অথচ যাদব চন্দ্র, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জানি না কোন্ দৈবী-শক্তি প্রভাবে যাদবচন্দ্র পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার আসন্নকাল সমুপস্থিত। তিনি কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। উইল করিয়া, ঘর-দ্বার সংস্কার করিয়া, চাঁদোয়া প্রভৃতি মেরামত করিয়া তিনি মিস্ত্রীদের বলিয়াছিলেন, "বাড়ীতে শীঘ্র একটা বড় গোছের কাজ হইবে।" মুগ্ধ আত্মীয়েরা তখন কেহ বুঝিলেন না, যাদবচন্দ্র নিজের শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়া রাখিয়া যাইতেছেন।

যাদবচন্দ্র স্থির জানিতেন, গুরুদেব মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিবেন। তিনি গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু গুরুদেবকে সম্মুখে পাইয়া তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী বলিলেন, "যাদব, আমায় চিনিতে পারিতেছ না?" সে স্বর যাদবচন্দ্রের মর্ম্মস্পর্শ করিল,—তিনি সন্ন্যাসীর পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

তারপর উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা আমরা কেহ অবগত নহি। সন্ন্যাসী প্রায় দুই দণ্ড কাল ছিলেন। তিনি এতদ্‌পূর্ব্বে যাদবচন্দ্রের কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু সেই দিন একটু দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স নির্ণয় করা অসম্ভব। যাদবচন্দ্র সত্তর বৎসর পূর্ব্বে দীক্ষিত হইবার সময় তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, আজও তাঁহাকে প্রায় তদ্রূপ দেখিলেন। তবে জটাভার যেন আরও বিশাল,—ভূপৃষ্ঠে লুটাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে; নয়ন ও ললাট যেন আরও প্রশান্ত; দেহের জ্যোতি যেন আরও উজ্জ্বল। দেবতুল্য গুরুদেব, যাদবচন্দ্রকে শেষ উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

গুছাইবার যাহা কিছু বাকি ছিল, যাদবচন্দ্র তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে সমাধা করিলেন। অবশেষে মহা-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। চিকিৎসক নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন, সামান্য জ্বর; বলিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই!" যাদবচন্দ্র সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আমায় গঙ্গায় লইয়া চল।" তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে

কাহারও সাহস হইল না। তাঁহাকে খাটের উপর শোয়াইয়া প্রথমে রাধাবল্লভের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে জাগ্রত দেবতার সম্মুখে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া যাদবচন্দ্র যুক্তকরে গলদশ্রুলোচনে. বিগ্রহ পানে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন। শুনিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র হয় নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

তারপর যাদবচন্দ্রকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে অনেক লোক। গঙ্গার তীরে রাধাবল্লভের ঘাটের উপর একটি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ আছে; সেই গৃহে যাদবচন্দ্রকে লইয়া যাওয়া হইল। গৃহের আশে পাশে তাঁবু পড়িল; আত্মীয়স্বজনেরা তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিন রাত্রি, পুণ্যময় দেবতা গঙ্গাতীরে বাস করিলেন। তৃতীয় দিবস গভীর নিশীথে যাদবচন্দ্র তাঁহার কন্যা ও পরিচারিকাদিগকে কক্ষবাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। কক্ষে অপর কেহ ছিল না। তাঁহারা দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন; এবং গবাক্ষ সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার অনতিকাল পরেই তাঁহারা কক্ষমধ্যে

মনুষ্যকণ্ঠ শুনিতে পাইলেন—স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, যেন দুইজন মানুষ ঘরের ভিতর মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে। তাঁহারা বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকে বলে, গুরুদেব যাদবচন্দ্রকে শেষ দেখা দিতে আসিয়াছিলেন; হইতেও পারে। কিন্তু সে সম্বন্ধে যাদবচন্দ্র কিছু বলেন নাই; সন্ন্যাসীকেও কেহ দেখেন নাই। লোকের অনুমান মাত্র।

অবিলম্বে যাদবচন্দ্রের আহ্বানে কন্যা ও পরিচারিকা কক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তাঁহারা কক্ষমধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তার ক্ষণকাল পরে যাদবচন্দ্রকে তাঁহার উপদেশ মত 'অন্তর্জলি' করা হইল। শত শত কণ্ঠোত্থিত হরিধ্বনির মধ্যে অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া পূর্ণজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে যাদবচন্দ্র জীর্ণ আধার ত্যাগ করিয়া মহামহিমময় লোকে প্রস্থান করিলেন।

আরও একটা কথা না বলিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতে পারি না। যাদবচন্দ্রের মৃত্যুসময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণ উপস্থিত থাকিতে পারেন

নাই। তিনি তখন জলপাইগুড়িতে। তাঁহাকে উপর্য্যুপরি তারে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, পিতৃদেবকে তীরস্থ করা হইয়াছে; কিন্তু যিনি দাসত্বে আবদ্ধ, তিনি কবে ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন? ম্যাজিষ্ট্রেট মফঃস্বলে—জেলার ভার তাঁহার উপর, তিনি সময়ে কাঁটালপাড়ায় আসিতে পারিলেন না। যখন আসিলেন, তখন চিতার অগ্নি নির্ব্বাপিত-প্রায়।

জলপাইগুড়ি হইতে আসিবার সময় পথে একজন তরুণ-বয়স্ক সন্ন্যাসীকে তিনি দেখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী বরাবর পূজ্যপাদ শ্যামাচরণের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন। বড় বড় ষ্টেশনে নামিয়া তিনি শ্যামাচরণকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অবশেষে শ্যামাচরণের দৃষ্টিও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কাঁটালপাড়ায় নামিয়া সন্ন্যাসীকে আর দেখিতে পান নাই।

চারি ভ্রাতায় মিলিয়া খুব ধূমধামের সহিত শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সে দিনের কথা আজও আমার বেশ স্মরণ আছে। এত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালীর সমাবেশ আমি আর কখন দেখি নাই।

শ্রাদ্ধান্তে একজন সন্ন্যাসীকে 'বৃষে'র নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল। পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ তাঁহাকে তখন লক্ষ্য করেন নাই। পরে যখন তিনি বৈঠকখানায় উপবিষ্ট, তখন উক্ত সন্ন্যাসী আসিয়া বলিলেন, "বাবু হাম চলে।"

সন্ন্যাসীকে দেখিয়া শ্যামাচরণের পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনিই কি কয়েক দিন আগে আমার সঙ্গে জলপাইগুড়ির দিক্ হইতে আসিয়াছিলেন?"

সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন মাত্র। শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি চান্?"

সন্ন্যাসী। কিছু না।

শ্যামাচরণ। তবে যাবেন কি না আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

সন্ন্যাসী। কারণ থাকিতে পারে।

শ্যামাচরণ, কার্য্যাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের আহার হইয়াছে?"

কার্য্যাধ্যক্ষ। সন্ধান লইয়া আসি।

বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন; এবং অনতিকাল পরে

ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "না, সন্ন্যাসী ঠাকুর কিছুমাত্র আহার করেন নাই—কেবল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন।"

তখন শ্যামাচরণ তাঁহাকে যত্নের সহিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া আহারাদি করাইতে চেষ্টা পান। কিন্তু সে সব চেষ্টা বৃথা হইয়াছিল। সন্ন্যাসী আহার করিলেন না। কোনরূপ দানও গ্রহণ করিলেন না। শ্যামাচরণ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসী উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি কি জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা পরে জানিতে পারিবেন।"

পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ পরে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানি না; তাঁহার নিকট কিছু শুনি নাই—কাগজপত্রেও কিছু দেখি নাই। তবে কাঁটালপাড়া-নিবাসী উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট শুনিয়াছি, যাদবচন্দ্রের গুরুদেব তাঁহার একজন চেলাকে যাদবচন্দ্রের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য পরিদর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন।

চেলাকে পাঠাইয়া তিনি হয়ত ভালই করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে একটা গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। বিঘ্নটি এত গুরুতর যে, শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছিল। জানি না কোন্ শক্তি প্রভাবে সমস্ত বিঘ্ন নিষ্কাসিত ও শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল!

কলিকাতা।

—:•:—

পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে, অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইলেন। লোকের ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্র এই পদ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন; এমন কি, যে সকল অনুমান-সিদ্ধ মহাত্মনিচয় কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও নিঃসঙ্কোচে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, Chief Secretary Macaulay সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ছোটলাটের দপ্তর হইতে অপমানসহকারে তাড়াইয়াছিলেন। এই সকল ভ্রান্তসংস্কার দূরীকরণার্থে Assistant Secretaryর পদ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত পরিচয় দিব।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের দুই জন মাত্র সেক্রেটারী ছিলেন। একজনের অধীনে Revenue ও General বিভাগ ছিল, অপরের অধীনে Judicial, Appointment এবং Political বিভাগ

ছিল। উভয়ের অধীনে একজন করিয়া Civilian Under Secretary ছিল; Assistant Secretary কেহ ছিল না—পদও ছিল না।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের decentralisation scheme অনু-সারে পরবৎসর Financial Department সৃষ্ট হইল। কিন্তু এই বিভাগের Secretaryর পদ সৃষ্ট হইল না। কিছুকাল বাদে Assistant Secretaryর পদ সৃষ্ট হইল, এবং সেই পদে রবার্ট নাইট নিযুক্ত হইলেন। নাইট সাহেব কিছুদিন চাকরা করিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদকতা করিতে চলিয়া গেলেন।

অবশেষে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সেক্রেটারির পদ সৃষ্ট হইল, এবং সেই পদে মেকেঞ্জি সাহেব নিযুক্ত হইলেন। মেকেঞ্জি সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মিত্র এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। বৎসরেকের উপর কাজ করিবার পর রাজেন্দ্রবাবু দীর্ঘকালের জন্য ছুটি লইলেন। তাঁহার স্থানে বাবু হেমচন্দ্র কর অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হইলেন। তিন মাস যাইতে না যাইতে কর্তৃপক্ষ, হেমবাবুকে-সরাইয়া বঙ্কিম বাবুকে সেই পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত করিলেন।

তখন মেকলে সাহেব, মেকেঞ্জির স্থানে সেক্রেটারি। Chief secretaryর পদ তখনও সৃষ্ট হয় নাই—আরও কিছুকাল বাদে হইয়াছিল। মেকলে সাহেব আসিয়া গভর্মেণ্টে প্রস্তাব করিলেন যে, এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ উঠাইয়া দিয়া অন্য দুই বিভাগে যেমন Under Secretary আছে, সেইরূপ Financial বিভাগে এক-জন সিভিলিয়ন অণ্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হউক। তিনি এই প্রস্তাব ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টে পাঠাইবার সময় রাজেন্দ্র বাবু, হেম বাবু ও বঙ্কিম বাবুর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ উঠিয়া গেল। এই পদ রাজেন্দ্র বাবুর—হেম বাবু ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থানে অস্থায়িভাবে কার্য্য করিতেছিলেন মাত্র।

মেকলে সাহেবের প্রস্তাবে, ছোটলাটের দপ্তর হইতে বাঙ্গালির অন্ন উঠিয়া গেল। উঠাইয়া দিয়া গভর্মেণ্ট একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তার কয়েক বৎসর পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে Public Service Commission স্থির করিলেন, তিন জন Under Secretaryর মধ্যে একজন উপযুক্ত ভারতবাসী নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু

এ প্রস্তাব বিশ বৎসর পরে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল—বিশ বৎসর পরে রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এই Under Secretary'র পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ সম্মানিত পদ পাইতে তিনিই প্রথম বাঙ্গালী।

মেকলে সাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যে এককালে ঝগড়া হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। একবার দস্তখত লইয়া উভয়ের মধ্যে সামান্য মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। সাহেব বলিলেন, "তুমি পূরা নাম দস্তখত করিবে।" বঙ্কিমচন্দ্র তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আগে তুমি পূরা দস্তখত কর, পরে আমি করিব। তুমি C. P. L. Macaulay বই Colman Patrick Louis Macaulay লেখ না। আমি B. C. Chatterji লিখিলে যত দোষ?"

মেকলে সাহেব হয়ত ছোটলাটের কান ভারি করিতে একটু আধটু চেষ্টা করিয়া থাকিবেন; কাগজ কলমে কিছু পাওয়া যায় না। বিচক্ষণ ইডেন সাহেব তখন আমাদের ছোটলাট। তিনি কর্ম্মদক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু স্নেহচক্ষে দেখিতেন বলিয়া শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত মেকলে সাহেবের মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে,

ছোটলাট প্রায় সকল সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের পোষকতা করিতেন। ইডেন সাহেব একদিন তাঁহার বন্ধু বাবু প্রসাদদাস দত্তকে বলিয়াছিলেন, "Bankim Chandra is an excellent officer. I always support him in his differences wlth Mr. Macau'ay."

এইত গেল আসল কথা; তা' ছাড়া বাজে কথাও কিছু আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জনৈক শত্রুর পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এই শত্রু মহাশয়ের একখানি কাগজ ছিল। তিনি এই সুযোগে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা রটনা করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। যাহা সাহেবেরা কখন করে না, বাঙ্গালী তাহা করিল। তাঁহার লিখিবার কৌশলটুকুও লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি লিখিলেন :—

"We understand that Baboo Bankim Chandra Chatterji, the offg. Assistant Secretary to the Bengal Government, received a short and sweet note from Mr. Secretary Macaulay, on the 22nd January. Mr. Macaulay is reported to have written:—"Very much

pleased with the manner in which you have done your work, but you must make over charge within an hour." The charge against Bankim Babu is that, during his time, office secrets oozed out from the office. This is the alleged charge, and which of course every body must regard as simply absurd. The story goes that when the appointment was given to Bankim Baboo, it was done in opposition to the wishes of some secretaries who objected to have a native again. These secretaries have now come forward with the charge that Bankim Babu permitted secrets to travel out of the office. His place has now been given to Mr. Blyth. So, after all, the place which was made over to the natives of Bengal with so much beat of drum, has now been again given to a European. We wonder when will men in

high position learn to be sincere, and to adhere to the pledges they give."

বাঙ্গালী-সম্পাদক তাঁহার ইংরাজি কাগজে যাহা লিখিলেন, ন্যায়পরায়ণ রবার্ট নাইট তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার (৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে) ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে লিখিলেন :—

"With respect to the statements made by our contemporary, we are informed that no "charge" of any kind has been made against Baboo Bankim Chandra Chatterji, and his transfer was accompanied by no reflection whatever on his character or his abilities. It is a singular thing that if "office secrets" were divulged during the period for which the Baboo acted as Assistant Secretary, the head of the office is unware of the fact, and the words which purport to be an extract from Mr. Macaulay's letter were never written by him.

Baboo Bankim Chandra Chatterji is a man of high character and attainments, and whatever may be the reason for his transfer, we are glad to be assured that it implies no reflection on him as a public servant, and is, in fact, not personal to him at all, nor to Baboo Rajendra Nath Mitter, whose character for ability and integrity stands equally high.

We agree with the * * in regretting that it has been deemed expedient to take away this important appointment from a native, and we confess our inability to understsnd the reasons that justify the step. That, however, is a question to be argued on its merits, and we are glad to know that no demerit on the part of either of the gentlemen mentioned, had anything to do with its decision."

যাঁহারা ষ্টেটস্‌ম্যান না পড়িয়া শুধু বাঙ্গালীর কাগজ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মেকলে সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রকে ছোট লাটের দপ্তর হইতে অপবাদ দিয়া তাড়াইয়াছিলেন। মেকলে সাহেব অপবাদ দেওয়া দূরে থাকুক, বঙ্কিমচন্দ্রের সাতিশয় সুখ্যাতি করিয়া ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টে লিখিয়াছিলেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মেকলে সাহেবের প্রস্তাবানুসারে Assistant Secretaryর পদ উঠিয়া গেল—Under Secretaryর পদ সৃষ্ট হইল। Civilian স্মাইথ সাহেব সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে একবার কথা উঠিয়াছিল, তাঁহাকে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট করা হইবে। কিন্তু সিবিলিয়নেরা আপত্তি করায় ছোটলাট সে প্রস্তাব চাপা দিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে—বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক পরে—বাঙ্গালীকে জেলার ভার দিবার প্রস্তাব আবার উঠিয়াছিল। তখন পূর্ণ বাবু, গোপাল বাবু প্রভৃতি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যাজপুরের পথে।

কলিকাতা হইতে বদলি হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে আসিলেন। কিন্তু তথায় বেশী দিন থাকিলেন না; তিন মাসের মধ্যে বদলি হইয়া বারাসতে গেলেন। বারাসতেও তিন মাসের অধিক থাকিতে হইল না, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে যাজপুরে বদলি হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাজপুরে ছয় মাস ছিলেন। ছয় মাস থাকিয়া যখন তথা হইতে ফিরিতেছিলেন, তখন সঙ্গে তাঁহার মধ্যম জামাতা। তখন রেল হয় নাই। পথ বড় দুর্গম। তা'র উপর আবার পথে ডাকাইতের ভয়। এই ভয়সঙ্কুল দুর্গম পথে বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকারোহণে চলিয়াছেন। জামাতা স্বতন্ত্র শিবিকায়। ভৃত্যাদি মাল পত্র লইয়া অন্য পথে গিয়াছে। সঙ্গে দুইজন মাত্র লোক; তাহারা লণ্ঠন ধরিয়া পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

রাত্রিকাল। চারিদিক্ নীরব। নিকটে জনমানব নাই। চাঁদ মাথার উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে; মাথ

মাসের সাদা মেঘ কখন চাঁদকে গিলিয়া ফেলিতেছে। আবার কখন উদ্গীরণ করিতেছে। চাঁদ যখন গিলিত হইতেছে, তখন কাঁদিতেছে; আবার যখন উগারিত হইতেছে, তখন হাসিতেছে। মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি হইতেছিল।

পথের দুইধারে জঙ্গল। সেই বিশাল অরণ্যমধ্যে দুইটি মাত্র লণ্ঠন-সাহায্যে বেহারারা চলিয়াছে। কখন চাঁদের আলোকে পথ দেখিয়া চলিয়াছে, কখন বা বৃষ্টিধারা মাথায় ধরিয়া লণ্ঠন সাহায্যে পথ দেখিয়া লইতেছে। কন্‌কনে শীত। বঙ্কিমচন্দ্রের পাল্কী আগে, জামাতার পাল্কী পিছনে।

দুইখানা পাল্কীর ষোলজন বাহক; কিন্তু তাহারা উড়ে, সুতরাং মিছা মানুষ। বাহকেরা শ্রুতিমধুর রব করিতে করিতে গন্তব্য পথ ধরিয়া চলিয়াছে। সহসা তাহাদের মধ্যে একটা ভীতি সঞ্চার হইল।—তাহারা সম্মুখে ও পার্শ্বে মানুষ দেখিল। স্থির করিল, তাহারা ডাকাইত। মৃদুকণ্ঠে আপনাদিগের মধ্যে কি বলাবলি করিল; তারপর থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্রহস্তে পাল্কী নামাইল। বঙ্কিমচন্দ্রের তখন একটু নিদ্রাকর্ষণ

হইয়া আসিতেছিল। পাল্কী সবেগে ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে ?"

উত্তর দিবে কে ? উড়িষ্যাদেশ-সম্ভূত বীরকুল-উজ্জ্বলকারী বাহকবৃন্দ তখন সদর্পে পলায়নতৎপর। সে পলায়নের বৃত্তান্ত রূপান্তরিত অবস্থায় 'দেবী চৌধুরাণী'তে লিপিবদ্ধ হয়। দেবী চৌধুরাণী এই ঘটনার কিছু পূর্ব্ব হইতে লিখিত হইতেছিল। একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম :—

"ডাকাইতের ভয়ে দুর্লভচন্দ্র আগে আগে পলাইলেন, ফুলমণি পাছু পাছু ছুটিয়া গেল। কিন্তু দুর্লভের এমনই পালাইবার রোখ যে, তিনি পশ্চাদ্ধাবিতা প্রণয়িনীর কাছে নিতান্ত দুর্লভ হইলেন। ফুলমণি যত ডাকে, "ওগো দাঁড়াও গো, আমায় ফেলে যেও না গো!" দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, "ও বাবা গো, ঐ এলো গো।" কাঁটাবনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, চাদরখানা একটা কাঁটাবনে তাঁহার বীরত্বের নিশানস্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে।" ইত্যাদি—

বাহকেরা ত পলাইল; লণ্ঠনধারী দুইজন লোক পালাইয়াছিল কি না, তাহা আমি স্মরণ করিয়া বলিতে পরিতেছি না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের অনুসন্ধান লইবার অবসর পাইলেন না, ডাকাইত আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিল। তাহারা সকলেই উড়িয়া। হাতে লাঠি ছাড়া তাহাদের আর কোন অস্ত্র ছিল বলিয়া শুনি নাই। যা'হউক, উড়িয়ারা যে বহুকাল অবসাদের পর লাঠি লইয়া ডাকাতি করিতে পারে, ইহা তাহাদের পক্ষে গৌরবের কথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের পাল্কীর এক দিকের কপাট বন্ধ ছিল, অপর দিকের কপাট খোলা। বঙ্কিমচন্দ্র মুখ বাহির করিয়া দেখিলেন, দশ পনর জন ডাকাইত, দুই খানা পাল্কী ঘিরিতেছে। তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া পথের উপর দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতে একটা যষ্টি বা লাঠি ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। তিনি সেই যষ্টি উঠাইয়া অগ্রবর্ত্তী ডাকাইতকে পরিষ্কার উড়িয়া ভাষায় বলিলেন, "যে আগু হইবে তাহাকে গুলি করিয়া মারিব।" ডাকাইতেরা দাঁড়াইল। বঙ্কিমচন্দ্র ভয়শূন্য। সেই নির্জ্জন বন-পথে বিংশতি জন দস্যু-সম্মুখে দুর্ব্বল, সহায়শূন্য বঙ্কিমচন্দ্র স্থির, নির্ব্বিকার। নিশাকালে এই ভয়সঙ্কুল

বনপথ অতিক্রম করিতে সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ না মানিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া এই পথে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে দস্যুরূপী অদৃষ্টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি নির্ভীক হৃদয়ে বলিলেন,· "সাধ্য থাকে, মার।" ভাগ্য, পরীক্ষায় তুষ্ট হইল,—দস্যুগণ পলাইল।

এই সময় হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোরতর মসী-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সে যুদ্ধের কথা শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় এই মসী-যুদ্ধ চলিয়াছিল, সমগ্র বাঙ্গালা ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদের পত্রাবলী পাঠ করিত। শুনিতে পাই, এই সকল পত্রের জন্য ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের বিক্রয় এত বাড়িয়াছিল যে, কাগজখানা কোন কোন দিন দুইবার ছাপিতে হইয়াছে। বিবাদ বাধিবার কারণ অতি সামান্য। সে সময় হেষ্টি সাহেবের হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না; তাই তিনি হিন্দুদিগের গালি পাড়িতে আরম্ভ করিলেন। উপলক্ষ হইল, শোভাবাজার রাজ-বাটীর শ্রাদ্ধ। আমি সে সকল বৃত্তান্ত পুস্তকশেষে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

এই মসী-যুদ্ধ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহেবেরা

অনেকেই চিনিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজি লিখিবার শক্তি ও পাণ্ডিত্য দৃষ্টে রিয়াক সাহেব বিস্মিত হইয়া লোকনাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পত্রগুলা সত্যই কি বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা?"

হাবড়া—দ্বিতীয়বার।

যাজপুর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় বদলি হইয়া আসিলেন। তখন E. V. Westmacott সাহেব হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট। কয়েক দিন যাইতে না যাইতে সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ বাধিল। ঘটনাটি এইরূপ;—একটা রেলওয়ে-মোকর্দ্দমা বিচারার্থে বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে অর্পিত হয়। মোকর্দ্দমার ঘটনাটি আমার স্মরণ নাই; অনুসন্ধানেও তাহা জানিতে পারি নাই। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, মোকর্দ্দমার ফলাফল জানিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলেন, প্রতি-

নিম্নস্ত মোকর্দ্দমা-নিষ্পত্তি সম্বন্ধে সংবাদ লইতেন। সহসা তিনি একদিন শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বিচার করিয়া আসামীদের অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। সাহেবের তাহা সহ্য হইল না,—তিনি মহারুষ্ট হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে আসিয়া উপস্থিত।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন অন্য একটি মোকর্দ্দমার বিচার করিতেছিলেন। সাহেবকে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উঠিলেন না, বা বাক্যালাপ করিলেন না। সাহেব, এজলাসের সম্মান রক্ষার্থ মাথা হইতে টুপি খুলিয়া হাতে লইলেন, এবং প্ল্যাটফর্মের নীচে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "Bankim Babu, you have let off the accused in the Railway case!"

বঙ্কিমচন্দ্র সমভাবে চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়া উত্তর করিলেন, "What of that?"

সাহেব। You ought to have convicted the accused.

বঙ্কিমচন্দ্র। You are uttering what constitutes contempt of court. I now represent Her Majesty.

সাহেব। You have done wrong, and you ought to be told so.

বঙ্কিমচন্দ্র আর কোন বাদানুবাদ না করিয়া সাহেবের বিরুদ্ধে Proceedings লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব দেখিলেন, মহা বিপদ! যাহা কখন শুনেন নাই, দেখেন নাই, তাহা একজন নেটিভ ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিতে উদ্যত! বুদ্ধিমান্ আইনজ্ঞ সাহেব বুঝিলেন, তাঁহার কাজটা আইনবিগর্হিত হইয়াছে। তিনি অচিরে ক্ষমা প্রার্থনা (apologise) করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, সাহেবকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সাহেবদের সহিত ঝগড়া করিতে করিতে কোন দিন হয়ত তাঁহাকে চাকরী ছাড়িতে হইবে। তাই তিনি আইন পরীক্ষা দিয়া ওকালতির পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন।

ঝগড়ার দুই তিন মাসের মধ্যেই ওয়েষ্টমেকট সাহেব স্থানান্তরিত হইলেন। তিনি আরও কিছুদিন হাবড়ায় থাকিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে হয়ত বেশ একটু বেগ পাইতে হইত। সাহেব একটু বেগও দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসা তখন কলিকাতায়। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা

হইতে হাবড়ায় প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। সাহেব আদেশ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে বাসা করিয়া হাবড়ায় থাকিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

হাবড়ায় দুই বৎসর থাকিতে না থাকিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। বেতন হইল, মাসিক আটশত টাকা। পুস্তকের আয়ও তখন যথেষ্ট। জীবনের কোন সময়ে অর্থের অভাব তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় নাই।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র তিন মাসের ছুটি লইয়া হাবড়া হইতে দ্বিতীয়বার বিদায় লইলেন কিন্তু কাঁটালপাড়ায় গেলেন না, কলিকাতায় রহিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি কাঁটালপাড়ার বাস তুলিয়া দিয়াছিলেন, তবে রথ ও দুর্গোৎসব উপলক্ষে দুই চারি দিনের জন্য মধ্যে মধ্যে কাঁটালপাড়ায় গিয়া বাস করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এবার যশোহর জেলার ঝিনাদহ মহকুমায় বদলি হইলেন। কিন্তু বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। জ্বরে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং তিন মাসের

ছুটি লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ঝিনাদহ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ভদরকে বদলি হইলেন। ভদরক বালেশ্বর জেলার একটি মহকুমা। বঙ্কিমচন্দ্র দুইবার উড়িষ্যা গিয়াছিলেন; প্রথমবার জাজপুরে—দ্বিতীয়বার ভদরকে। সেখানে গিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার ছায়া "সীতারামে" কিছু কিছু দেখিতে পাই।

ভদরকে গিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এক মাস মাত্র তথায় ছিলেন। ফিরিয়া হাবড়ায় আসিলেন। কিন্তু সেখানে থাকিলেন না, পূর্ব্বকথিত ওয়েষ্টমেকট সাহেব তখন তথায় ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। পাছে উভয়ের মধ্যে আবার কলহ বাধে এই আশঙ্কা করিয়া বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাসের ছুটী লইলেন। ছুটীর পর মেদিনীপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানে ছয়মাস মাত্র ছিলেন। চারি মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। অবকাশান্তে চব্বিশ পরগণা আলিপুরে বদলি হইলেন। আলিপুর হইতে তাঁহাকে আর স্থানান্তরে যাইতে হয় নাই।

আলিপুর ও বিদায়।

বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে বদলি হইয়া আসিলেন। কিছু কাল পরে মহামতি বেকার সাহেবও তথায় আসিলেন। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, অপর উঁহার অধীন ডিপুটি। উভয়ের মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম সাক্ষাতেই সঙ্ঘর্ষণ; কিছু অগ্নিস্ফুলিঙ্গও উঠিয়াছিল। শুধু একদিনের কথা বলিব।

একদা বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে এক মোকদ্দমার বিচার চলিতেছিল। মোকদ্দমাটি সামান্য—Excise case—আবগারি বিভাগ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। তবে দণ্ড অতি সামান্য—কুড়ি পঁচিশ টাকা হইবে। কিছু পরে ম্যাজিষ্ট্রেট বেকার সাহেব আসিয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিলেন। দেখিলেন, দণ্ড অতি লঘু হইয়াছে। তিনি জরিমানার টাকাটা কম হইয়াছে বলিয়া জজমেণ্টের উপর মন্তব্য লিখিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন দণ্ড যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার

বিশ্বাস। আসামী দরিদ্র, এই টাকাটা দিতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে।"

সাহেব। অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড হওয়া উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র। Sir, you were in cradle when I entered service—

সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হাততালি দিতে দিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। সাহেব অন্তরে অন্তরে রাগিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি কোনও কালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তুষ্ট ছিলেন না।

আর একবার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। চব্বিশ পরগণার রেভিনিউ বিভাগের ১০ নং বাৎসরিক statement দিবার সময় সমাগত হইল। রেভিনিউ বিভাগ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। Statement সময়ে প্রস্তুত হইয়া উঠিল না। অবশেষে তাগিদ আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি শুধু দেখিতে লাগিলেন, আমলারা statement প্রস্তুত করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করিতেছে কি না। তাঁহারা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছেন দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেন।

ক্রমে বোর্ড হইতে, গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে, চারিদিক্ হইতে তাগিদ আসিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না—তাগিদের উত্তরও দিলেন না। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসন নড়িল। বোধ হয় গভর্মেণ্ট হইতে তাগিদ দিয়া তাঁহার নামে পত্র আসিয়াছিল। মহামতি বেকার সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে আসিয়া উপস্থিত। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "statement প্রস্তুত হইয়াছে?"

বঙ্কিমচন্দ্র। না।

সাহেব। কেন হয় নাই?

বঙ্কিমচন্দ্র। আমলারা যথাসাধ্য করিতেছে; আমি তাহাদের মারিয়া ফেলিতে পারি না।

সাহেব উঠিয়া আমলাদের কাজ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিয়া বোধ হয় সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি কাহাকেও কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে কি লিখিয়া দিলেন।

আলিপুরে যখন বঙ্কিমচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এ ক্ষুদ্র লেখক মধ্যে মধ্যে আদালতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বিচার-কার্য্য দেখিয়াছে। দুই একবার

বড় বড় কৌন্সিলের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রকে তর্ক বিতর্ক করিতে দেখিয়াছি। একবার হাইকোর্ট হইতে একজন সাহেব-ব্যারিষ্টার আসিয়া আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে-ছিলেন। অপর পক্ষে মিষ্টার টি, পালিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তারক বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনিতেন; কিন্তু সাহেব চিনিতেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, একটা নগণ্য নেটিভ ডিপুটির সম্মুখে অবধানতার সহিত বক্তৃতা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি টেবিল চাপড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া নানা ভঙ্গীতে সাক্ষীকে জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি ফিরিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের ললাটে মেঘ উঠিয়াছে—সহাস্য নয়ন জ্বলিয়া উঠিয়াছে—ওষ্ঠ-প্রান্ত কুঞ্চিত হইয়াছে। আমি বুঝিলাম, মেঘ গর্জ্জন না করিয়া ছাড়িবে না। একটু অপেক্ষা করিলাম,—অচিরে অশনিপাত হইল। সাহেব, সাক্ষীকে কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সাক্ষী উত্তর দিবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র সহসা বলিয়া উঠিলেন, "The question is irrelevant—I disallow it."

সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "Irrelevant !"

তারক বাবু বলিলেন, "Certainly irrelevant."

বঙ্কিমচন্দ্র, তারকবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন, "Don't waste your time on him, Mr. Palit."

এই ক্ষুদ্র কথায় সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু আর বাদানুবাদ করিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিয়া থাকিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ ক্ষুদ্র কথায় মর্ম্মান্তিক তিরস্কার করিতেন—যেরূপ ক্ষুদ্র কথায় গুরুতর উপদেশ দিতেন, সেরূপ আমি অন্য কাহারও মুখে শুনি নাই। তিনি ক্ষুদ্র কার্য্য দেখিয়া মানুষের বিচার করিতেন—ক্ষুদ্র কথার উপর নির্ভর করিয়া কখন কখন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ক্ষুদ্র কথায়, ক্ষুদ্র কার্য্যে মানুষকে যতটা চেনা যায়, বড় বড় বক্তৃতায় বা বড় বড় কার্য্যে ততটা চেনা যায় না। বৃহৎ অনুষ্ঠানে মানুষ তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া থাকে—সে তখন প্রস্তুত, সতর্ক।

একবার একটা সামান্য মোকর্দ্দমা তাঁহার আদালতে উঠিয়াছিল। মোকর্দ্দমার বিবরণ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাদীপক্ষীয় উকিলের জিজ্ঞাসাবাদে অনেক সাক্ষী বলিতেছিল, "চেক্ দিতে মুই দেখেছিলাম।"

সাক্ষীটা নিরক্ষর ও ইতর জাতীয়। কিন্তু মোকর্দ্দমাটা তাহার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতেছিল। উকিল মহাতেজে হাকিমকে বলিলেন, "হুজুর, লিখিয়া রাখুন, সাক্ষী চেক্ দিতে দেখিয়াছিল।"

হাকিম কথাটা পরিষ্কার করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ জিনিষ দিতে দেখিয়াছিলে?"

সাক্ষী। হুজুর, চেক্।

হাকিম। কে তোমায় এ কথা শিখাইয়া দিয়াছে?

সাক্ষী। কেহ নয় হুজুর।

হাকিম। চেক্ কা'কে বলে জান?

সাক্ষী উত্তর না করিয়া উকিলের মুখপ্রতি চাহিল। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "চ্যাক্ কা'কে বলে জান?"

সাক্ষী। তা' জানি হুজুর; খাজনা দিলে জমিদার চ্যাক্ দেয়।

হাকিম তখন বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি নিজে মোকদ্দমার কিছু জান না, অপরের উপদেশ মত সাক্ষ্য দিতেছ; তোমার মুখ দিয়া চেক্ শব্দ বাহির হ'ত না— তুমি চ্যাক্ বলিতে। এখন সত্য করিয়া বল, কে

তোমায় শিখাইয়া দিয়াছে, নইলে তোমায় ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিব।"

সাক্ষী তখন কাঁদিতে কাঁদিতে উকিল বাবুর নাম করিল। উকিল বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইলেন। এইরূপে একটা ক্ষুদ্র কথা, একটা জটিল মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তির হেতুভূত হইল। *

বঙ্কিমচন্দ্র যেমনই দক্ষতার সহিত কাজ করুন না কেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত তাঁহার কোনমতে বনিল না। অবশেষে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি পেন্‌সনের দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু সে দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল। অগ্রাহ্য হইবারই কথা। তাঁহার বয়স তখন তিপ্পান্ন বৎসর মাত্র। পঞ্চান্নর পূর্ব্বে অবসর লইবার যো নাই। তবে পীড়িত হইলে স্বতন্ত্র কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমূত্র ছাড়া আর কোনও রোগ ছিল না। দেখিতে তিনি সুস্থকায়, সবল, বলিষ্ঠ। গবর্মেণ্ট বঙ্কিমচন্দ্রের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন।

* এই মোকদ্দমার বিবরণ আড়িয়াদহনিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি।

তখন তাঁহার জেদ আরও বাড়িয়া উঠিল। আমি দেখিয়াছি, কোনও ঈপ্সিত কার্য্যে বাধা বা প্রতিবন্ধক পাইলে তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন। যতক্ষণ না সে বাধা তাঁহার পদতলে বিমর্দ্দিত হইত, ততক্ষণ তাঁহার জেদ ও শক্তি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বাড়িতে থাকিত।

গভর্মেণ্ট যখন তাঁহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন, তখন তিনি কার্য্য হইতে অপসৃত হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রোগের ভান করিলে সহজেই তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি অসত্য পথ অবলম্বন করিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন সত্যাশ্রয়ী ছিলেন; আমি কখনও তাঁহাকে কোনও কথা অতিরঞ্জিত করিতে দেখি নাই—এক বর্ণ মিথ্যা বলিতে শুনি নাই। যৌবনে কি করিতেন, তাহা আমি জানি না—জানিবার প্রয়োজনও নাই। আমি একবার রমেশ বাবুর নিকট একটা অসত্য কথা বলিয়াছিলাম। সে জন্য আমি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসিত হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "এই বয়সেই মিথ্যা কথা শিখিলে, এর পর কি শিখিবে?" সে তীব্র তিরস্কার আজও আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা রহিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অসত্য পথ অবলম্বন না করিয়া ছোট লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বাঙ্গালার মসনদে তখন ইলিয়ট সাহেব অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী বঙ্কিমচন্দ্রকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। লেডী ইলিয়ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষের স্থান বিশেষ স্বয়ং অনুবাদ করিয়া পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন।

একদিন অপরাহ্নে বঙ্কিমচন্দ্র লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অভিবাদনান্তে তিনি রাজপ্রতি-নিধির নিকট তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন। সকল কথা শুনিয়া লাট সাহেব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বয়স কত বঙ্কিমবাবু ?"

"ছিপ্পান্ন বৎসর।"

"এই বয়সেই অবসর লইতে ইচ্ছা কর ?"

"তেত্রিশ বৎসর চাকরী করিয়া আসিতেছি, আর পারি না।"

"তোমার শরীরে কোনও রোগ আছে ?"

"বিশেষ কিছু নাই।"

সাহেব একটু অন্যমনস্ক হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "তুমি বই লিখিবার জন্য কি অবসর খুঁজিতেছ?"

বঙ্কিমচন্দ্র। কতকটা তাই বটে।

ছোটলাট। উত্তম; আমি তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময় ছোটলাট জিজ্ঞাসা করিলেন, —"বঙ্কিমবাবু, তুমি তেত্রিশ বৎসর দক্ষতার সহিত চাকরী করিয়া আসিতেছ—গভর্মেণ্ট তোমার প্রতি তুষ্ট; তোমার কোনও প্রার্থনা নাই কি?"

বঙ্কিমচন্দ্র ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "না।"

সাহেব। তোমার আত্মীয় স্বজন কাহারও জন্য কোনও অনুগ্রহ (favour) চাহিবার নাই কি?

বঙ্কিমচন্দ্র। সাহেব, আপনি যদি এতই কৃপাপরবশ, তবে আমার ছোট ভাইকে ডায়মণ্ড-হারবার হইতে আমার নিকটে কোন স্থানে আনিয়া দিন।

সাহেব। এ ত অতি সামান্য কথা; আর কোনও প্রার্থনা নাই কি?

বঙ্কিমচন্দ্র। আপাততঃ নাই।

বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন। কয়েক দিন পরে পূর্ণবাবু আলিপুরে বদলী হইয়া আসিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের জন্য কখনও রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী হয়েন নাই; আত্মীয় স্বজনের জন্য তিনবার ভিক্ষা চাহিতে হইয়াছিল। একবার জ্যেষ্ঠ জামাতার জন্য; দ্বিতীয়বার, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রের জন্য; তৃতীয়বার এ ক্ষুদ্র লেখকের জন্য। অপরের কৃপাপ্রার্থী হইতে তিনি বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পেন্‌সনের দরখাস্ত অবশেষে মঞ্জুর হইল। তেত্রিশ বৎসর এক মাস চাক্‌রী করিবার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্‌টেম্বর অপরাহ্ণে চার্জ বুঝাইয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করিলেন। চারি শত টাকা পেনসন মঞ্জুর হইয়াছিল। দুই বৎসর ছয়মাস তেইশ দিন পেন্‌সন ভোগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, গভর্মেণ্টের নিকট চার হাজার টাকার কিছু বেশী পাইয়াছিলেন। তখন পুস্তকের বাৎসরিক আয় অন্যূন ছয় হাজার টাকা।

বঙ্কিম-জীবনী।

তৃতীয় খণ্ড।

শেষ জীবন।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"অপরিচিত লোকের প্রতিও তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) কখনও বিনয়, নম্রতা ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই। সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন ও গুণীর প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রকাশ তাঁহার চরিত্রের আর একটি প্রধান গুণ ছিল। একদিন কোন একটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে আমি তাঁহার শিষ্টাচার ও গুণীর প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া একান্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। প্রায় ৫ বৎসর গত হইল আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর পরে একদিন আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি এক খানি সোফায় বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। আমি তাঁহার চরণতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামান্তর তাঁহার

পদধূলি গ্রহণ করিতে উদ্‌যোগী হইলে তিনি শিষ্টাচার বশতঃ তদীয় চরণযুগল বস্ত্রাবৃত করিয়া লুকাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং বলিলেন, "পদধূলি পাইবে না।" তখন আমি তাঁহাকে বিনম্রভাবে বলিলাম, "আমি হিন্দুর সন্তান—হিন্দু প্রথানুসারে আপনাকে বিজয়া দশমীর প্রণাম করিতে আসিয়াছি—পদধূলি গ্রহণে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

তিনি হাসিমাখা-মুখে বলিলেন, "প্রণাম করিয়াছ, তাহাতেই আমি যথেষ্ট সুখী হইয়াছি—পদধূলি পাইবে না—বিশেষ আত্মীয় ও গুরুজন ভিন্ন যার তার পদধূলি গ্রহণ ভাল নয়।" আমি বলিলাম, "সত্যই কি আপনার পদধূলি গ্রহণে আমার অধিকার নাই?—বিদ্যালয়ে আপনার নিকট শিক্ষা লাভ করি নাই সত্য, কিন্তু গৃহে বসিয়া আপনার পুস্তকরাশি হইতে অপূর্ব্ব শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহা চিরজীবন মনে থাকিবে। আপনার বঙ্গ-দর্শন যৎকালে প্রকাশিত হয়, তখন আমি ক্ষুদ্র বালক —তখন উহার প্রকৃত মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বুঝিতাম না, কিন্তু পরে বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে কত গভীর তত্ত্বের শিক্ষা লাভ করিয়াছি। আপনার 'চন্দ্রশেখর' ও 'প্রতাপ'

আমার নিকট দেবতার ন্যায় আরাধ্য। আপনার 'আনন্দমঠ' হইতে গভীর স্বদেশভক্তি ও স্বদেশের প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য শিক্ষা পাইয়াছি। অতএব আপনার পদধূলি গ্রহণে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তবে যদি আপনি আমাকে উহা গ্রহণের অযোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে কাযেকাযেই আমি নিরস্ত হইব।" এই কথা বলিবামাত্র তিনি আনন্দের সহিত চরণদ্বয়ের বস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক বলিলেন,—"এই লও। এতক্ষণ পায়ে মোজা আঁটা ছিল, এই মাত্র উহা খুলিয়া ফেলিয়াছি। মোজা আঁটা পরিষ্কার পায়ে এক বিন্দুও ধূলি পাবে না।" আমি আপন মনে আমার বাসনা পরিপূর্ণ করিলাম। তিনি দুই বাহু প্রসারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমাকে সুকোমল ও সুস্নিগ্ধ আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আমার পায়ের ধূলা তোমার মাথায় এক বিন্দুও লাগে নাই, কিন্তু সত্য সত্যই আর কোথা হইতে মস্তকে ধূলা লাগিয়াছে, আমি তাহা ঝাড়িয়া দিতেছি,"—এই বলিয়া তিনি গভীর স্নেহের সহিত আমার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রায় ৫ মিনিট কাল ঐরূপ অবস্থায় আমি তাঁহার আলিঙ্গন মধ্যে আবদ্ধ

রহিলাম। যতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন তাঁহার সেই প্রগাঢ় স্নেহ আমার স্মৃতিপথে দেদীপ্যমান রহিবে।

আমরা যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলে তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আজ কেবল বিজয়া দশমীর প্রণাম করিতে আসিয়াছ, অথবা আরও কিছু প্রয়োজন আছে?" আমি বলিলাম, "আমার আর একটি বিনীত প্রার্থনা আছে। আমি স্বর্গীয় মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিবার জন্য কতিপয় মাননীয় আত্মীয় বন্ধু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আপনার মুখে আমি অনেকবার উক্ত মহাত্মার প্রশংসা-বাদ শুনিয়াছি, আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কার্য্যে সহায়তা করেন, তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।" তিনি উৎসাহের সহিত বলিলেন, "আমাকে কি করিতে হইবে বল—আমি তাহা অবশ্য করিব।" আমি বলিলাম • •। তিনি হাসিতে হাসিতে (তদুত্তরে) বলিলেন, "আমি আনন্দের সহিত এই ভার লইতে প্রস্তত আছি—আমি যত্নের সহিত পুস্তকখানি দেখিয়া দিব এবং উহাতে একটি সুন্দর ভূমিকা

লিখিব।" এই বলিয়া তিনি আমার যথেষ্ট উৎসাহ বর্দ্ধন ও প্যারীচাঁদের কতই গুণ কীর্ত্তন করিলেন। এই দিন তিনি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা ও উন্নতি সাধনে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রই তাঁহাকে পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের অনেক সুলেখক ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার পূর্ব্ব-বর্ত্তী অথবা সমসাময়িক লেখকের প্রতিভা ও ক্ষমতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না—তিনি অকপটে প্যারীচাঁদের গুণবত্তার, বুদ্ধিমত্তার ও স্বদেশানুরাগের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

তিন বৎসর হইল বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিলে একদিন আমি কোনও প্রয়োজন উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। সেই সময় দেশীয় সংবাদপত্রে কোনও একটি রাজনৈতিক বিষয়ের ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আমার সহিত উক্ত আন্দোলন সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়ের বাদানুবাদ করিলেন। প্রতি কথায় আমি তাঁহার গভীর রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে লাগিলাম। তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "ভারতবাসীর দুঃখ ও

অভাবে প্রকৃতরূপে সহানুভূতি প্রকাশ করেন, এরূপ ইংরেজ এদেশে অল্পই আছেন—যাঁহারা সেরূপ উদার প্রকৃতির লোক তাঁহারা ক্ষণজন্মা।" এই বলিয়া তিনি রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মেম্বর শ্রীযুক্ত রেণল্ড্‌স্ সাহেবের কোন কোন গুণের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। * * *

যখন আমি তাঁহার মুখে আমাদের 'কন্‌গ্রেস্' এই কথা শুনিলাম, তখন মনে বড়ই আনন্দ জন্মিল। তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি সুযোগ পাইয়া বলিলাম,—"আপনি এক্ষণে রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইয়াছেন—এখন যদি আপনি কন্‌গ্রেসে যোগদান করেন তাহা হইলে উহার বিশেষ হিত সাধিত হইতে পারে; আপনি কি উহাতে যোগদান করিবেন না?"

"তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপাততঃ নয়।" আমি আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন দিবেন না?" তিনি বলিলেন, "তুমি একজন কন্‌গ্রেসের চেলা, সুতরাং উহার বিশেষ পক্ষপাতী—আমি কি জন্য এখন উহাতে যোগ দিতে পারি না তাহা বলিলে হয়ত তুমি ব্যথিত হইবে, এ জন্য উহা না বলাই ভাল—তবে

আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি কন্‌গ্রেসের বিপক্ষ বা উহার অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী নহি।"

কন্‌গ্রেসে তাঁহার যোগদান না করিবার কারণ জানিবার জন্য আমি বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলে তিনি বলিলেন,—'কন্‌গ্রেসের প্রতি আমার সহানুভূতি নাই, এ কথা আমি কখনই বলিতে পরি না—উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে আজ পর্য্যন্ত উহা সাধারণের যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা এখনও সমস্ত দেশের লোকের সাধারণ সম্পত্তি হয় নাই'। *"

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একবার বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার একটি বন্ধুও সঙ্গে ছিলেন। এতদ্‌পূর্ব্বে উভয়ের কেহই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেন নাই। এমন কি তাঁহার বাড়ীও তাঁহারা চিনিতেন না। গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না

* "ভারতী"—১৩০১, আষাঢ়।

হইতে একটা বাড়ী তাঁহাদের নয়নাকর্ষণ করিল। তাঁহারা ভাবিলেন, সেই বাড়ীটা বঙ্কিমচন্দ্রের হইবে। গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, একটি ভদ্রলোক উঠানে দাঁড়াইয়া একজন ভৃত্যকে সাতিশয় তিরস্কার করিতেছেন। ভদ্রলোকটির ক্রোধ দেখিয়া ও চীৎকার শুনিয়া আগন্তুকদ্বয় দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন—অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। ভদ্রলোকটি তখন ভৃত্যকে ছাড়িয়া আগন্তুকদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কি প্রয়োজন?"

দীনেশ বাবু। এটা কি বঙ্কিম বাবুর বাড়ী?

ভদ্র ব্যক্তি। হাঁ।

দীনেশ বাবু। আমরা বঙ্কিমবাবুর দর্শন-প্রার্থী।

ভদ্র ব্যক্তি। প্রয়োজন কিছু আছে?

দীনেশ বাবু। প্রয়োজন কিছু নাই; আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে আসিতেছি।

ভদ্র ব্যক্তি। কোথা হইতে আসিতেছেন?

দীনেশ বাবু। কুমিল্লা হইতে।

ভদ্র ব্যক্তি। আচ্ছা, আপনারা উপরে যান; সেইখানে বঙ্কিম বাবুর সাক্ষাৎ পাইবেন।

উপরে উঠিয়া উভয়ে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন।

ক্ষণপরে পূর্ব্ব কথিত ভদ্রলোকটি একটা পিরান গায় দিয়া আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে বসিলেন। উভয়ে তখন বুঝিলেন, নীচে যাঁহার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তিনিই বঙ্কিম বাবু। তখন তাঁহারা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। দীনেশ বাবু যত সাহিত্যের কথা টানিয়া আনেন, বঙ্কিম-চন্দ্র তাহা উড়াইয়া দিয়া ততই ধান চালের কথা পাড়েন।

দীনেশ বাবু যদি জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এক্ষণে কি লিখিতেছেন?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দেন, "কুমিল্লায় কিরূপ ধান হয়?" অবশেষে দীনেশ বাবু বুঝিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনেশ বাবুর মত লোকের সহিত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি তখন আর কোনও কথা না তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

একদা সুহৃদ্‌বর শ্রীমান্ যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এতদ্ সম্বন্ধে যোগেন্দ্র-কুমার যে পত্র খানি আমায় লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"একদিন কয়েকটি কলেজের ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া

আমি বঙ্কিম বাবুকে দেখিতে যাই। তিনি তখন মেডি-কেল কলেজের পূর্ব্বদিকে প্রতাপ চাটুর্য্যের গলিতে বাস করিতেন। আমরা যখন বঙ্কিম বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি স্নানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। আমরা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার সঙ্গী একজন যুবক বলিলেন 'আপনার নিকটে কিছু উপদেশ লইব বলিয়া আসিয়াছি।'

তাঁহার কথা শুনিয়া বঙ্কিম বাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কি কর?'

'আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি।'

বঙ্কিম বাবু বলিলেন 'তুমি এখনও ছাত্রাবস্থায় আছ। তোমাকে অন্য কি উপদেশ দিব? do your duty; তোমার অভিভাবক তোমাকে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য সাধন করাই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। ছাত্রের পক্ষে অধ্যয়নই তপস্যা, সেই তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা কর, ইহা ছাড়া তোমাদিগকে অন্য কোন উপদেশ দিবার নাই।'

এই উপদেশ লাভ করিয়া আমরা কিয়ৎক্ষণ অন্য

আলাপের পর প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। বঙ্কিম বাবু আমার সঙ্গী প্রত্যেকের পরিচয় লইয়াছিলেন।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়,

চন্দননগর।

একবার একটী দেশ-প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বঙ্কিম-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহার এক খানি পুস্তকের দোকান ছিল। তাঁহার পুত্রের নামেই দোকান চলিত। পুত্রের প্রকৃত নাম গোপন করিয়া তাঁহাকে জগত কুমার সরকার বলিয়া অভিহিত করিব। কেন না, এই পুত্র আজও জীবিত এবং তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুস্তকবিক্রেতা। জগৎ বাবুর অভিলাষ তিনি বঙ্কিম-চন্দ্রের একখানি হাফ-টোন ছবি প্রকাশ করেন। হাফ-টোন ছবির ব্লক সে সময় এদেশে কেহ করিতে পারিত না—বিলাত হইতে করিয়া আনিতে হইত। ব্যয়ও যথেষ্ট। জগৎ বাবু সে ব্যয় বহন করিতে সানন্দে সম্মত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট পিতাকে পাঠাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ছবি ছাপাইতে সম্মত হইলেন না। কেন হইলেন না, তাহা ঠিক আমার স্মরণ নাই। অবশেষে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

যখন বিরস বদনে বিদায় হইতে ছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব, যদি ভাল বিবেচনা করি, তখন আপনার পুত্র জগতকে সংবাদ দিব।" বৃদ্ধ বিদায় হইলেন।

কয়েকদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র, জগৎ বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া উপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ তাঁহাকে চিনিতেন না; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" জগৎ বাবু উত্তর করিলেন, "আমার নাম, জে, কে, সরকার।" বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার প্রয়োজন?"

জগৎ বাবু। আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন?

বঙ্কিমচন্দ্র। আমি কোন জে, কে, সরকারকে চিনি না, সুতরাং ডাকিয়া পাঠাইবার সম্ভাবনাও নাই।

জগৎ বাবু যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া আত্ম-পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইলেন; বলিলেন, "আমার পিতার নাম—, আমার নাম জগৎকুমার—"

বঙ্কিমচন্দ্র ঈষৎহাস্য সহকারে বলিলেন, "তাই বল, তোমার নাম জগৎকুমার—আমি জে, কে, সরকারকে কেমন করিয়া চিনিব?"

একবার একটী বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালী সাহেব, বঙ্কিম-চন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিয়া খামের উপর মিষ্টার বঙ্কিম-চন্দ্র লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন, "এ বাড়ীতে মিষ্টার বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া কোনও ব্যক্তি নাই, আপনি বোধ হয় সে কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।"

একবার পাইকপাড়ার রাজা স্বর্গীয় ইন্দ্র চন্দ্র সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আলাপ করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ললিত বাবুর * আলাপ ছিল; তিনি ললিত বাবুকে ধরেন। ললিত বাবু, বঙ্কিমচন্দ্রকে সে কথা জানাইলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, "উঁহার সহিত আমার আলাপ অসম্ভব।"

কাববর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময় বঙ্কিম-চন্দ্রের গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করেন, তখন রবি বাবুর বয়স কুড়ি, একুশ বৎসর। অল্প বয়স হইলেও তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সেই বয়সেই যশঃ কিনিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসরের আগেকার স্মৃতি মনে করিয়া আজ তিনি লিখিয়াছেন,—"এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয়

* রায় ললিতমোহন সিংহ বাহাদুর—বাঁশবেড়িয়ার জমিদার।

'নবজীবন' মাসিকপত্র বাহির করিয়াছেন—আমিও তাহাতে ছুটা একটা লেখা দিয়াছি।

"বঙ্কিম বাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচার বাহির হইতেছে।

* * *

"এই সময়ে কিম্বা ইহারই কিছু পূর্ব্ব হইতে আমি বঙ্কিম বাবুর কাছে আবার একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তখন তিনি ভবানী-চরণ দত্তের ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিম বাবুর কাছে যাইতাম বটে, কিন্তু বেশী কিছু কথাবার্ত্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক কিন্তু সঙ্কোচে কথা সরিত না। এক একদিন দেখিতাম সঞ্জীব বাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড় খুসী হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দ বেগেই লিখিত—ছাপার

অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া ; এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে ; তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতা-টিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।

"এই সময় কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিম বাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে প্রথমটা বঙ্কিম বাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন। সেই সময়ে হঠাৎ হিন্দুধর্ম্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

"কিন্তু বঙ্কিম বাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার প্রচার পত্রে তিনি যে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপর তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

• • •

"সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের * সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচার-এ তাহার ইতিহাস রহিয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক, এ বিরোধের অবসানে বঙ্কিম বাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিম বাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।" †

অবসর গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যাহা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা করিতে পারেন নাই—অকালে অপসৃত হইয়াছিলেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি একখানিও নূতন পুস্তক লেখেন নাই। কেবল "ঢেঁকি" নামধেয় একটা নূতন প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজন করিয়াছিলেন। আনন্দমঠ, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়, কৃষ্ণচরিত্র ও কৃষ্ণকান্তের উইলের এক একটা নূতন সংস্করণ করিয়াছিলেন। রাজসিংহ ও ইন্দিরা

* স্থানান্তরে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

† প্রবাসী—১৩১৮, আষাঢ়।

বর্ত্তমান আকারে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পুস্তিকা সঞ্জীবনীসুধা লিখিয়াছিলেন। কবিতা-পুস্তকের নাম গদ্য-পদ্য দিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। একখানি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহার নাম—Bengali selections approved by the syndicate of Calcutta University for the Entrance examination, 1895. বিবিধ প্রবন্ধের একটা নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র তিন বৎসরের মধ্যে সাহিত্যসেবার্থ আর কিছু করেন নাই।

কিছু করেন নাই বলিলে ঠিক চলিবে না। তিনি একখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিতেছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই—কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখিত হইতে না হইতে কাল তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া গেল।

অবসর লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার নাম, Society for the higher training of young men.—এক্ষণে ইহার নাম University Institute হইয়াছে। এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। চারিটি তাঁহার

গৃহে, দুইটি ইন্‌ষ্টিটিউট মন্দিরে। গৃহে যে কয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা শরীরের উন্নতি সম্বন্ধে ; মন্দিরে যে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা উপনিষদ সম্বন্ধীয়। যাঁহারা এই বক্তৃতানিচয় শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে জীবিত। কিন্তু শেষের দুইটি ছাড়া অন্য বক্তৃতাগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে—এক্ষণে তাহা কোথাও পাওয়া যায় না। শেষোক্ত বক্তৃতা দুইটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের University Magazineএ প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাবার্থ স্থানান্তরে সন্নিবিষ্ট হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভার (Senate) সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং তদবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সভ্য ছিলেন। কিন্তু সভায় বড় বেশী যাইতেন না। যখন যাইতেন, তখন তিনি কোন পক্ষে যোগদান না করিয়া স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতেন। খোসামোদ কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। জীবনভোর কখনও মানুষের খোসামোদ করেন নাই। মধ্য বয়সে ভগবানের কিছু কিছু করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে ভগবৎ-চরণে প্রাণ লুটাইয়া দিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কালের জন্য মাছ মাংস ত্যাগ

করিয়া হবিষ্যাশী হইয়াছিলেন। গায়ে নামাবলী দিতেন, শুদ্ধাচারে থাকিতেন, সতত গীতা আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু যিনি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মাছমাংস খাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার শরীরে হবিষ্যান্ন সহ্য হইল না। তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তবু তিনি কিছুকাল যুঝিয়াছিলেন; কিন্তু আর পারিলেন না, চিকিৎসকদের উপদেশানুসারে আমিষ আহার আবার ধরিতে হইয়াছিল।

আমার মনে হয় পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়া মানুষ একবার পিছন ফিরিয়া দেখে—মৃত্যুকে অনতিদূরে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ মানব বাল্যকাল হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবনটা একবার বিশ্লেষ করিয়া দেখে। বঙ্কিম-চন্দ্র বোধ হয় তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি একদা শ্রীশ বাবুকে বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। * * আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে কি যে কি এক রকমের অদ্ভুত লোক

ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দু-ধর্ম্মে আমার মতি গতি অতি আশ্চর্য্য রকমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কেমন করিয়া তাহা হইল, জানিলে লোকে আশ্চর্য্য হইবে। * *"

সন্ন্যাসী।

—:•:—

সন্ন্যাসীর কথা বলিবার আগে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বঙ্কিম-চন্দ্রের অভিজ্ঞতা কিরূপ তাহা বলা কর্ত্তব্য। শ্রীশ বাবু লিখিতেছেন,—"কথায় কথায় আমি তাঁহার নবেল সমূহে সন্ন্যাসী চরিত্র গুলির কথা তুলিলাম। (বঙ্কিম বাবু) হাসিয়া বলিলেন, 'সব নবেলেই আছে বটে, কিন্তু কেন থাকে জানি না। আমি বলিলাম, 'আপনার পিতার সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর গল্প সঞ্জীব বাবুর কাছে শুনিয়াছি। হইতে পারে তার দরুণ শৈশবাবধি মনে একটা impression আছে।

বঙ্কিম বাবু। সে গল্প শুনিয়াছি বটে, কিন্তু সে

অন্য কিছু হইয়াছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। তবে অনেক স্থানে অনেক সন্ন্যাসী দেখিয়াছি।

আমি। বইয়ের অনুরূপ কোন সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ কখন দেখেছেন কি?

বঙ্কিম বাবু একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, 'না'।

তার পর সিনেট * সাহেবের পুস্তকের কথা উঠিল। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'সিনেট দেখাইয়াছেন বটে যে মানুষের শক্তি কত বিকশিত হইতে পারে। কিন্তু Theosophy এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে আমি তা লিখেছি'।" †

বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি গাড়ী ও দুইটি ঘোড়া ছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে দৌহিত্রদের লইয়া শকটারোহণে বেড়াইতে যাইতেন। ১৩০০ সালের কার্ত্তিক মাসে এক-দিন অপরাহ্ণে বেড়াইতে যাইবার জন্য সকলে সাজসজ্জা করিতেছেন, এমন সময় সদর দরজার সম্মুখে রাস্তার উপরে একটা গোলমাল উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কাণে সে

* ইনি Esoteric Buddhism নামক পুস্তক লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

† সাধনা—১৩০১

গোলমাল পৌঁছিল কি না ঠিক বলিতে পারি না। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারবানের কোনও ত্রুটী ছিল না; পাঁড়েজী দ্বারপথ আগুলিয়া জনৈক সন্ন্যাসীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল। সন্ন্যাসী ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহে, পাঁড়ে তাহাকে কিছুতেই আসিতে দিবে না। সন্ন্যাসী যত বলে, "আমি ভিক্ষা চাহি না, বাবুর সঙ্গে সুধু সাক্ষাৎ করিতে চাহি"—পাঁড়ে তত জোর করিয়া বলে, "বাবুর সঙ্গে এখন কোনমতে 'মোলাকাৎ' হবে না। ফজিরমে আইয়ে—বাবু আভি ঘুম্‌নে যাতে হ্যায়।" সন্ন্যাসী যখন দেখিলেন, পাঁড়েজী কিছুতেই দ্বার ছাড়িবে না, তখন তিনি নিরস্ত হইয়া পথের একধারে বসিলেন। ক্ষণকাল পরে বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেদের লইয়া বাহিরে আসিলেন। গাড়ী বড় রাস্তায় (কলেজ ষ্ট্রীট) অপেক্ষা করিতেছিল; গলিটুকু হাঁটিয়া গাড়ীতে উঠিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র গলির উপর আসিয়া দেখিলেন, এক জন সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণনয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তিনি দৃষ্টির বিনিময়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী তখন উঠিলেন; এবং কয়েক হস্ত পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "খাড়া হো।"

বঙ্কিমচন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুম্‌হারা নাম বঙ্কিমচন্দর?"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্মতি জ্ঞাপন করিলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুম্‌হারা ওয়াস্তে ম্যায় নেপালসে আতা হুঁ—লউট্‌কে আও।"

বঙ্কিমচন্দ্র—মহাতেজস্বী বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া বালকের ন্যায় সন্ন্যাসীর আজ্ঞায় ফিরিলেন, এবং সন্ন্যাসীকে সসম্মানে আমন্ত্রণ করিয়া উপরের ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া নাকি সন্ন্যাসী, বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "আমার গুরু নেপালে থাকেন, তিনি তোমার কাছে আমায় পাঠাইয়াছেন। তুমি ও আমি পূর্ব্বজন্মে এক গুরুর মন্ত্র-শিষ্য ছিলাম। আমরা উভয়ে একত্র যোগসাধনা করিয়াছিলাম। তোমার কর্ম্মফল তোমায় সংসারে টানিয়া আনিল, আমি যোগী হইয়া আবার পূর্ব্বজন্মের গুরুকে পাইলাম।"

সন্ন্যাসীর বয়স বেশী নয়। বেশী না হইলেও তিনি সাধারণ সন্ন্যাসী হইতে অনেক বিভিন্ন। জটা বা বিভূতির ঘটা ছিল না, হাতে সিঁধকাটীর মত চিম্‌টাও ছিল না। প্রফুল্লানন, তেজোদীপ্ত যোগীর কোনও আড়ম্বর ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব আপনাকে পাঠাইয়াছেন কেন?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "সে কথা আর এক দিন বলিব। আজ এই রুদ্রাক্ষটি গ্রহণ কর। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন রুদ্রাক্ষকে প্রত্যহ পূজা করিবে। কেমন করিয়া পূজা করিতে হইবে, তাহা আমি বলিয়া দিতেছি।"

সন্ন্যাসী আরও কিছু উপদেশ দিয়া বিদায় হইলেন। বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ না করিয়া, কপর্দকমাত্র ভিক্ষা না লইয়া যোগিবর প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু সে রুদ্রাক্ষের পূজা করিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ কখনও দেখে নাই।

তিন মাস পরে সন্ন্যাসী আবার আসিয়াছিলেন। নিদারুণ শীতের সময় একদিন মাঘ মাসের মধ্যাহ্নে আসিয়া দর্শন দিলেন। সে বার কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি উপরের বৈঠকখানায় উঠিয়া গেলেন।

তথায় বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা

করিলেন। অন্যান্য দুই চারিটা কথার পর সন্ন্যাসী বলিলেন, "বঙ্কিমচন্দর্, এ দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে, তা' কি বিস্মৃত হয়েছ?"

"না, বিস্মৃত হই নাই।"

"তবে প্রস্তুত হও।"

বঙ্কিমচন্দ্র দৌহিত্রকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। বালক অনিচ্ছাসত্বে কক্ষত্যাগ করিল। তখন তিনি দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট বসিলেন। কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। তিনি কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিন ঘণ্টা (কাহারও মতে ৪।৬ ঘণ্টা) পরে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বার খুলিলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল বিদ্যুৎভরা মেঘের ন্যায় গম্ভীর। খুড়ী-মা চমকিত হইলেন; সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে কি হইতেছিল?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "রমণ পাখি শিখিতে-ছিলাম।"

খুড়ীমা কথাটার অর্থ বুঝিলেন না; সুধু বুঝিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে-

অনিচ্ছুক। বুদ্ধিমতী খুড়ী-মা সে কথা আর কখনও তুলেন নাই।

আমি এ সন্ন্যাসীকে দেখি নাই। সে সময় আমি দূরদেশে কর্ম্মস্থলে ছিলাম। পরে খুড়ী-মা ও অন্যান্য লোকের মুখে উপাখ্যানটি শুনিয়াছিলাম। রমণ-পাষ্টির অর্থ আজও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সে সন্ন্যাসীর দর্শনও আমরা আর কখনও পাই নাই।

দেহ ত্যাগ।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমূত্র রোগের সূত্রপাত হয়। কিন্তু তাহা বাড়িতে পায় নাই—বড় একটা চিকিৎসাও করাইতে হয় নাই। ১৩০০ সালের শীতকালে সহসা রোগ বাড়িয়া উঠিল। খুড়ীমা সভয়ে দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রাত্রিতে নিদ্রা নাই—মুহুর্মুহুঃ উঠিয়া তিনি জল খাইতেছেন ও প্রস্রাব করিতেছেন। তখন তাঁহার চিকিৎসার প্রস্তাব উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "চিকিৎসা করাইতে

চাও, কর—আমি তোমাদের মনে কোন আক্ষেপ রাখিতে দিব না।"

চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু রোগের উপশম হওয়া দূরে থাক্, রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। অবশেষে চৈত্র মাসের প্রথমে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল।

বহুমূত্র রোগ বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কবি বা ঔপন্যাসিক, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী বা চিন্তাশীল ব্যক্তি, এ নিদারুণ রোগের হস্ত হইতে বড় একটা কেহ রক্ষা পান নাই। দীনবন্ধু, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র সকলেই শেষ জীবনে বহুমূত্র হইতে সাতিশয় কষ্ট পাইয়াছেন। য়ুরোপে কিন্তু এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখি না। সেখানে প্রথিত-নামা লেখকেরা বাত হইতেই বেশী কষ্ট পাইয়াছেন। মিল্টন, গিবন, হিউম, নীউটন, সিড্‌নি স্মিথ, ফিল্ডিং, ড্রাইডেন, ডিফো প্রভৃতি যশস্বী লেখকেরা বাত রোগকে (Gout) চিরসঙ্গী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ রোগ তাঁহাদের জীবনঘাতী হয় নাই, বহুমূত্র যে আমাদের জীবনঘাতী—বাঙ্গালার সর্ব্বনাশকারী। হায়, বহুমূত্র!

বহুমূত্র রোগ সচরাচর স্ফোটক বা ব্রণ উৎপন্ন না করিয়া ছাড়ে না। এই ব্রণ অধিকাংশ সময়ে সাংঘাতিক

হয়। বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাই ঘটিল। মূত্রনালীতে ব্রণ বা স্ফোটক দেখা দিল। কেহ বলেন একটি, কেহ বলেন দুইটি ব্রণ হইয়াছিল। যাই হউক, স্ফোটকটী বড় সামান্য নয়,—কলিকাতার বড় বড় চিকিৎসকেরা প্রায় সকলেই চিকিৎসার্থ আহূত হইয়াছিলেন। অস্ত্রচিকিৎসা-বিশারদ ওব্রায়েন সাহেব আসিয়া বলিলেন, স্ফোটকটী কাল বিলম্ব না করিয়া অস্ত্র করিতে হইবে। অন্যান্য চিকিৎসকেরা সাহেবের সহিত একমতাবলম্বী হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন, "অস্ত্রাঘাত হইলে বিষাক্ত পূঁজ রক্তের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যাইতে পারে—মিশিয়া গেলে রক্ত দূষিত হইয়া পড়িবে, তখন মৃত্যু অনিবার্য্য।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, "এ যাত্রা কিছুতেই আমার নিস্তার নাই; অস্ত্রাঘাত কর বা না কর, কিছুতেই আমার পরিত্রাণ নাই। তবে কেন মিছা অস্ত্রাঘাত করিয়া আমার যাতনা বাড়াও।"

ওব্রায়েন সাহেব নিরস্ত হইলেন। পরদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মতের পোষকতা করিলেন। কিন্তু তিনি কোন ঔষধ দিলেন না,

—এলোপ্যাথী চিকিৎসা চলিতে লাগিল। দুই এক দিনের মধ্যে স্ফোটক আপনা হইতে ফাটিয়া গেল। ওব্রায়েন সাহেব পরদিন আসিয়া বলিলেন, "এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন—আর কোন ভয় নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিলেন, "ভয় সম্পূর্ণ আছে—এ যাত্রা কিছুতেই আমার রক্ষা নাই।"

জানি না, কেন বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বলিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, সন্ন্যাসীর নিকট কিছু শুনিয়া থাকিবেন। লোকেও তাই বলে। এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম তাহা বলি।

দুই তিন দিন পরে পুরাতন ক্ষতের পার্শ্বে আর একটি নূতন স্ফোটক দেখা দিল। সেবারেও অস্ত্রাঘাত করা হইল না। কিন্তু ফল তেমন সন্তোষজনক হইল না। তিনি বুঝিলেন—মৃত্যু সন্নিকট। পূর্ব্ব হইতে, —কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে—তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, শেষ দিনের বেশী বিলম্ব নাই। তিনি সে কথা কাহাকেও বলেন নাই; কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ আমাদের সে কথা বলিয়া দিয়াছিল।

যখন ২৬এ চৈত্র নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন

দূরস্থিত আত্মীয় স্বজনের নিকট তারে সংবাদ প্রেরিত হইল। কেহ সময়ে আসিতে পারিল, কেহ পারিল না। ২৫এ চৈত্র তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। কিন্তু জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

অবশেষে ১৩০০ সালের ২৬এ চৈত্র রবিবার বেলা ৩টা ২৩ মিনিটের সময় বঙ্কিমচন্দ্র ৫৫ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিন বয়সে ক্ষণভঙ্গুর দেহ ত্যাগ করিয়া মহামহিমময় লোকে প্রস্থান করিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার কক্ষে এই কয়েক জন উপস্থিত ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠা কন্যা, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, দৌহিত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ও বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। অনেকেই ছুটিয়া আসিলেন। সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল তখন সুরেশ বাবুর বাড়ীতে তাস খেলিতেছিলেন। তাঁহারা সংবাদ পাইবামাত্র তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুরেশ বাবুর ছাপাখানা ছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ একটা

স্লিপ ছাপাইয়া, সহরময় বিলি করিবার জন্য চারি দিকে লোক পাঠাইলেন। সুরেশ বাবু, অক্ষয় বাবু প্রভৃতি অনেকেই শকটারোহণে নগ্নপদে বঙ্কিম-মন্দিরে আসিয়া সমুপস্থিত। সে মন্দির তখন ক্রন্দনরোলে প্রতিধ্বনিত। বন্ধু বান্ধব ও ভক্তবৃন্দ যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বেলা সাড়ে চারিটা। লোক ক্রমাগয়ে আসিতে লাগিল; অবশেষে বাড়ীতে, গলিতে লোকে আর ধরে না।

কিন্তু দেহ লইয়া যাইতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িল। যাহাকে খাট আনিতে পাঠান হইয়াছিল, সে আর ফিরে না। তাহার সন্ধানে যাহারা গেল, তাহারাও নিরুদ্দেশ হইল। অবশেষে বেলা ৬ টার সময় পাঁড়ে এক বৃহৎ খাট আনিয়া উপস্থিত করিল। খাটের উপর উত্তম শয্যা বিস্তৃত হইল। শয্যোপরি পুষ্পরাশি বিকীর্ণ হইল। তার পর—তার পর যে পঞ্চভৌতিক দেহে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকালের জন্য বাস করিয়াছিলেন—যে মৃন্ময় ঘট মধ্যে দেবতা এতদিন অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে ক্ষণভঙ্গুর আধার ত্রিতল হইতে আনীত হইয়া খট্টাসোপরি রক্ষিত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে কোনও কষ্ট-চিহ্ন নাই—কোনও বিকার নাই। অপূর্ব্ব শান্তি, চিরপ্রফুল্লতা বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছিল। সে প্রফুল্লতা যেন এ সংসারের নয়,—তিনি যেন জ্ঞানদৃষ্টিতে কোনও অজ্ঞাত রাজ্যের সুখময় ছবি দেখিতে দেখিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া মৃত বলিয়া মনে হয় নাই; মনে হইয়াছিল, যেন তিনি নিদ্রিত—যেন তিনি সুপ্তাবস্থায় সুখময় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

গগনভেদী হাহাকারের মধ্যে 'অনিন্দ্যজ্যোতি স্বর্ণ-তরু'কে গৃহের বাহিরে আনা হইল। পরে কলেজ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। পুরমহিলাদের অনুরোধে ব্রাহ্ম-মন্দিরের সম্মুখে খাট নামান হয়। ব্রাহ্মমহিলারা গবাক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের দেহ দর্শন করেন। সুরেশ বাবু, যতীশ বাবু, জামাতা রাখালচন্দ্র, দৌহিত্র সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই খাট ধরিয়াছিলেন। খাট হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা যত অগ্রসর হইতে

লাগিলেন, তত জনস্রোত বাড়িতে লাগিল। সুরেশ বাবুর স্লিপ পড়িয়া অনেকেই তখন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে যিনি শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের দেহ লইয়া যাওয়া হইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ যে কোনও একটা দোকানে জুতা খুলিয়া শবদেহের অনুগমন করিতে লাগিলেন। গৃহচূড়া হইতে যিনি এ সংবাদ পাইলেন, তিনি ঝটিতি জুতা খুলিয়া জনস্রোতে সম্মিলিত হইলেন। যাঁহার পদতল কখনও ধূলিসংশ্লিষ্ট হয় নাই, তিনি গাড়ী ছাড়িয়া নগ্নপদে শবদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন শব-বাহকেরা হেদুয়ার মোড় ভাঙ্গিয়া বিডন ষ্ট্রীটে পড়িলেন, তখন জন-সঙ্ঘ বিপুল আকার ধারণ করিল। থিয়েটারের সম্মুখে খাট আবার নামান হইল। সে দিন সন্ধ্যাকালে অভিনয়। অনেক লোক অভিনয়দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ থিয়েটার ছাড়িয়া শবদেহের অনুগমন করিলেন। যখন সকলে নিমতলা ঘাটে পৌঁছিলেন, তখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া সেই বিপুল জনতার কলেবর বর্দ্ধিত করিতে লাগি-

লেন। কেহ বঙ্কিমচন্দ্রকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইলেন, কেহ প্রণাম করিলেন, কেহ বা পুষ্পোপহার প্রদান করিলেন। সে দৃশ্য মর্ম্মস্পর্শী।

ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালী মৃত সাহিত্যিককে এমন করিয়া আর সম্মান দেখায় নাই। এই তাহার প্রথম আত্ম-সম্মান-বোধ, এই তাহার প্রথম জাতীয় ভাবের উন্মেষ। বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্মান দেখাইয়া বাঙ্গালী আপনাকে সম্মানিত করিল। পশ্চিম-জগতে ফরাসীরা একদিন ভিক্টর হুগোকে সম্মান দেখাইয়া জগতকে শিখাইয়াছিল, কবিকে কিরূপ সম্মান করিতে হয়; আরও শিখাইয়াছিল, যে জাতি সম্মান দেখাইতে জানে, সে জাতি জগতে সম্মানিত হয়। শুনিয়াছি, * যে পথ দিয়া হুগোর মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়, সে পথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। গাড়ী গাড়ী ফুল আনিয়া পথের উপর ঢালা হইল—কয়েক গাড়ী ফুলের মালা আনিয়া মৃত দেহের চারি দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। গভর্মেণ্ট বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সমাধির ব্যয়স্বরূপ মঞ্জুর করিলেন। সমাধি দেখিতে—

* Smith's life of Victor Hugo.

মৃতকে সম্মান দেখাইতে—ফরাসীগণ সুদূর পল্লী হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সভাসমিতি হইতে অসংখ্য প্রতিনিধি আসিতে লাগিল। ধনী, দরিদ্র, বৃদ্ধ, রমণী শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া পথের দুই ধারে দাঁড়াইতে লাগিল। মন্ত্রী, কর্ম্মচারী, কবি, মূর্খ, সকলে আসিলেন। পথে যখন আর লোক ধরে না, তখন তাহারা গবাক্ষে, গৃহচূড়ে উঠিল। সেখানেও যখন আর স্থান সঙ্কুলান হয় না, তখন তাহারা গাছে উঠিল। যখন বৃক্ষচূড়েও আর স্থান হইল না, তখন লোকে নদীর উপর নৌকায় উঠিল। নদীবক্ষ নৌকায় সমাচ্ছন্ন হইল। কিন্তু তাহাতেও সকলের স্থান সঙ্কুলান হইল না।

এরূপ সম্মান ফরাসীরাই দেখাইতে পারে, ইংরাজেরা পারে না। ইংরাজের সেক্ষপিয়রকে জেলে যাইতে হইয়াছিল—জনসনকে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া চেস্‌টারফিল্ডের দ্বারে আট বৎসর হাঁটাহাঁটি করিতে হইয়াছিল। ফরাসীরা আর একদিন একজন কবিকে সম্মান দেখাইয়াছিল। কবির নাম—মলিয়ের। অনেকেই তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবেন। তিনি অনেকগুলি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি সেক্ষপীয়ারের নাটক

অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নয়। সেই সকল নাটক থিয়েটারে অভিনীত হইত। মলিয়ের পুস্তক লিখিয়া যশঃ ও অর্থ উভয়ই যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মলিয়েরকে প্রসিদ্ধ French Academyর সভ্য করিয়া লইবার জন্য একবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। এই সভার একশত জন সভ্য; এক শতের কম বা বেশী হইবার নিয়ম ছিল না। যাঁহারা সমগ্র ফরাসী দেশ মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভা-বলে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা এই সভার সভ্য হইতে পারিতেন। যখন মলিয়েরকে সভ্য করিয়া লইবার প্রস্তাব উঠিল, তখন অনেক সভ্যই আপত্তি করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "যে ব্যক্তি থিয়েটারে বই লিখিয়া খায়, সে আমাদের একাডেমীর সভ্য হইবার যোগ্য নয়।" এ কথাটি মলিয়েরের কাণে উঠিল; তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর ফরাসীরা বুঝিল, মলিয়ের কত বড় লোক ছিলেন। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে যখন ফরাসীদের মধ্যে কেহ রহিল না, তখন তাহারা ব্যগ্র হইয়া মলিয়েরকে সম্মান প্রদর্শন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। যে সভা সভ্যরূপে মলিয়েরকে গ্রহণ করেন

নাই, সেই সভা মলিয়েরের প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া সভা-গৃহে স্থাপন করিলেন ; এবং সুবৃহৎ প্রস্তরগাত্রে তাঁহাদের অনুতাপ-কাহিনী ক্ষোদিত করিলেন। তা' ছাড়া সভা আর একটা কাজ করিলেন।—সভ্যের সংখ্যা কমাইয়া ৯৯ জন করিলেন ; এবং মৃত মলিয়েরের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া একশত সদস্য-সংখ্যার পূরণ করিলেন। আজও সেই সভায় ৯৯ জনের অধিক সভ্য লওয়া হয় না। মলিয়েরের প্রস্তরমূর্ত্তি লইয়া একশত জন ধরা হয়।

এরূপ সম্মান দেখাইতে বাঙ্গালী আজও শিখে নাই, কিন্তু শিখিতেছে। বাঙ্গালী ফুল আনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের চিতায় ঢালিল—বাঙ্গালী নগ্নপদে, শোকবিমর্ষ মুখে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে কলিকাতার চারি প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিল—বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের চিতাভস্ম ভক্তিপ্লুতচিত্তে মাথায় ধরিল। বাঙ্গালী কাঁদিল—প্রজ্বলিত চিতার পার্শ্বে বসিয়া অনেক কাঁদিল।

কাঁদিল, বঙ্কিমচন্দ্রের অকালমৃত্যুর জন্য। যদি তিনি টলষ্টয় অথবা টেনিসনের পরমায়ু ভোগ করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য-সৌধকে আরও বিশোভিত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় বাঙ্গালীর হৃদয়ে একটা আঘাত

লাগিত না। কিন্তু জ্বালাময়ী প্রতিভা লইয়া বাঙ্গালায় যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ত বেশী দিন এ জগতে থাকিতে পারেন না। ঈশ্বরগুপ্ত ৪৬ বৎসর, কেশবচন্দ্র ৪৬ বৎসর, হরিশচন্দ্র ৩৯ বৎসর, কৃষ্ণদাস পাল ৪৬ বৎসর, মধুসূদন দত্ত ৫০ বৎসর, দীনবন্ধু মিত্র ৪৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যে বয়স য়ুরোপীয় কবিগণের মধ্যাহ্নকাল, সে বয়স বঙ্গকবিগণের সন্ধ্যা। বাঙ্গালী তা'র ক্ষুদ্র জীবনে কয়খানা পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারে? একজন সামান্যা ইংরাজ-মহিলা (Mrs. Sherwood) যাহা লিখিয়াছেন,* কোনও বাঙ্গালী তাহার অর্দ্ধেকও লিখিতে পারেন নাই—লিখিবার অবসরও পান নাই।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দকে আমরা যেমন হাসিতে হাসিতে আহ্বান করিয়াছিলাম, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দকে আমরা তেমনই কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় দিয়াছিলাম। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আমরা কেশবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কৃষ্ণদাস ও বঙ্কিমচন্দ্রকে পাইয়াছিলাম; ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমরা ভূদেবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রকে হারাইলাম।

* ৭৭ খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

তবে যাও বঙ্কিম, দিবাবসানে, বর্ষঅবসানে, শতাব্দী-অবসানে—ভারত-জননীর চরণপ্রান্তে প্রণাম করিয়া—ভারতবাসীর আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরিয়া অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় লোকে যাও। 'শুভ্র জ্যোৎস্না' তোমার মাথার উপর চন্দ্রাতপ ধরিবে—'মলয়জশীতল' সমীর তোমায় বীজন করিতে থাকিবে—'ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল' তোমার মস্তকে আশীর্ব্বাদস্বরূপ ফুল্লকুসুমদাম বর্ষণ করিবে। ওই দেখ, যাঁহার চরণে তুমি 'বিদ্যা, ধর্ম্ম, হৃদি, মর্ম্ম' উৎসর্গ করিয়াছ, তিনি অশ্রুভারাকুল-লোচনে বিজয়মাল্যহস্তে তোমায় বিদায় দিতে আসিয়াছেন। পার্শ্বে সলিলবিপুলা জ্ঞান-প্রবাহিনী জাহ্নবী, তোমার চিতাভস্ম সযত্নে বক্ষে ধরিয়া অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতে ছুটিয়াছেন। ওই দেখ, স্বর্গ হইতে তোমার মানসপুত্রকন্যাগণ পুষ্পচন্দন-হস্তে তোমার চরণপূজা করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। ওই শুন প্রফুল্ল আসিয়া বলিতেছে, "বাবা, আমি তোমার নিকট নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিয়া এক্ষণে অক্ষয় স্বর্গের অধি-কারিণী হইয়াছি; এক্ষণে তোমাকে সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় লোকে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বনিয়ন্তা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। এস বাবা, তোমার সৃষ্টরাজ্যে, এস বাবা,

তোমার সৃষ্টলোকে, যেখানে বাক্যই অবতার—যেখানে যুগে যুগে, মাসে মাসে, পলে পলে, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ মহাবাক্য জন্মগ্রহণ করিতেছে, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে এস।” ওই শুন, বীরকুলশেখর প্রতাপ বলিতেছে, “পিতা. আমি তোমার নিকট চিত্তসংযম শিখিয়া যে সুখময় রাজ্যের অধিকারী হইয়াছি, সে রাজ্যে লক্ষ শৈবলিনী নিয়ত আমার পদসেবা করিতেছে—কোটি রূপসী আমার পদতলে গড়াগড়ি যাইতেছে। এস পিতা, তোমার সৃষ্ট রাজ্যে—যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য—যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে এস।”

যাও—কিন্তু আবার আসিও। বাঙ্গালী যখন ‘সপ্ত-কোটীকণ্ঠে কলকল নিনাদে’ তোমায় ডাকিবে, তখন আবার আসিও—বাঙ্গালায় আবার অবতীর্ণ হইও।

শোকোচ্ছ্বাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগে বঙ্গভূমি কাঁদিয়া আকুল হইল। বিদ্যাসাগরের চিতা নিবিতে না নিবিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পাশে আসিয়া শুইলেন। বাঙ্গালা কাঁদিয়া আকুল হইল। চারিদিকে শোক-সভা আহূত হইল। টাউনহলেও এক বিরাট শোক-সভা আহূত হইয়াছিল। আসামের ভূতপূর্ব্ব চিফ্-কমিশনর কটন সাহেব সেই সভায় যোগদান করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার সমুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।" সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রেও শোক-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল।

স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন ;—

*   *   *

"কোথা আজ তুমি   কোথা সে তোমার
জ্ঞান পারিষদ যত ;
গেলে কি ছাড়িয়া   প্রিয় জন্মভূমি
পূরণ না হতে ব্রত ?

কে পারিবে তব রাজদণ্ড নিতে
তিলক ধরিতে ভালে?
তোমার মতন সাধক রতন
পা'ব আর কত কালে?
বিহনে তোমার করে হাহাকার
বঙ্গ নরনারী আজ,
হে বঙ্গভূষণ প্রিয় অতুলন
বঙ্গের সাহিত্য-রাজ!

ধন্য ক্ষণজন্মা জনমিলে ভাই
আজন্ম দুঃখিনী কোলে,
ভুলালে বঙ্গের নরনারীগণে
অমিয়া মধুর বোলে:—
গেলে কীর্ত্তি রাখি চিরদিন তরে
এ ভারত মহীতলে!
দিয়ে জীবদান বাঙ্গালীর দেহে
জ্বালাইলে শিখা তায়,
জাগ্রত করিয়া বঙ্গনারীনরে
ভাতিলে নব বিভায়।

আপনি গঠিলে আপনার দল
সোদর সদৃশ প্রেমে,
শত ডোর দিয়া হৃদয়ে বাঁধিলে
কত রবি চন্দ্র হেমে !

সে মলয়ানিল সহসা থামিল
ফুরাল বঙ্কিম আয়ু ;
সমূহ বাঙ্গালা কাঁদিয়ে আকুল
যেন হারা প্রাণ-বায়ু !
কেন কাঁদ বঙ্গ এ প্রাণীর তরে
এঁর যে মরণ নাই ;
ধরার বিজলি এ জীব মণ্ডলী
এ নহে এঁদের ঠাঁই !
যে দেবমণ্ডলে মহাপ্রাণী দলে
জ্বলে চির জ্যোতির্ম্ময়,
হের কি শোভায় সেই দেবধামে
বঙ্কিম উদয় হয় !
পেয়ে যাঁর সঙ্গ পবিত্র এ বঙ্গ
গাও তাঁর চির জয়।"

* নব্যভারত—১৩০১।

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ বলিয়াছিলেন ;—

"যে সকল রাজ্যে মহত্ত্ব বিরল নহে সেখানে কোন যশস্বী লোকের অন্তর্দ্ধান হইলে সমস্ত দেশ শোক করিতে থাকে। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে শুভ দৈববশে কদাচিৎ ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, তথাপি, জীবনের কার্য্য সমাধা করিয়া যখন তাঁহারা সংসার-ক্ষেত্র হইতে অন্তরিত হন তখন এই জড়তাপন্ন দরিদ্র দেশ তাঁহাদের অভাব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

"কিন্তু একথা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। লেখনী সহজেই লিখিতে চাহে যে, অদ্য সমস্ত বঙ্গদেশ বঙ্কিম-চন্দ্রের বিয়োগ-দুঃখে শোকাতুর।

"অল্প দিনের মধ্যে আমাদের অনেকগুলি শোকের কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমে রাজেন্দ্রলাল মিত্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি তাঁহাকে ভাল করিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিল না। * * *

"রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ রচনা ইংরাজিতে। বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও বহু পূর্ব্বের কথা।"

তারপর বিদ্যাসাগর। "বঙ্গভাষার প্রথম স্তর তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বিধবার দুঃখ-মোচনের জন্য নিষ্ঠুর সমাজের সহিত তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়াছেন— আর যে বঙ্গদেশ তাঁহার জীবনের রক্তে জীবন পাইয়াছে সে আজ বহু কষ্টে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপলক্ষে দুই চারি বার সামান্য ব্যর্থ চেষ্টা দেখাইয়াই আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে।

"আজ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও আমরা সভা ডাকিয়া সাময়িক পত্রে বিলাপসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাহার অধিক আর কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা কোনরূপ স্মরণচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে, চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। উপর্য্যুপরি বারম্বার অকৃতজ্ঞতা ও অনুৎসাহের পরিচয় দিলে ক্রমে আর আত্মসম্ভ্রমের লেশ-মাত্র থাকিবে না, এবং ভবিষ্যতে প্রবন্ধ লিখিয়া শোকের আড়ম্বর করিতেও কুণ্ঠিত বোধ করিতে হইবে।

"উপকার গ্রহণ করিবার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার

শক্তিও বাড়িতে থাকে। আমাদের দেশের জাতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও সেরূপ দাঁড়ায় নাই যাহাতে আমরা কোন মহৎ লোকের দৃষ্টান্ত বা কার্য্য অন্তরের মধ্যে যথার্থরূপে পরিপাক করিয়া লইতে পারি। * * *

"সেই জন্য যে কয়েকটি মহাত্মা আমাদের দেশের কাজে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে মিসরের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে গুটিকতক নিঃসঙ্গ পিরামিডের মত দেখিতে হয়। এই মৃত মরুভূমির মধ্যে তাঁহাদের সমুন্নত মহিমা দ্বিগুণ দেদীপ্যমান হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সুবিশাল বিষাদ হৃদয়কে বাষ্পাকুল করিয়া তোলে। হায়, এত বড় জীবন যাহার নিকট নিঃশেষে সমর্পিত হইয়াছে, সে জানিতেও পারিল না তাহার কি সৌভাগ্য এবং সে চির দিনের জন্য কতখানি লাভ করিল।"

কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দাস

লিখিয়াছিলেন ;—

১

"সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন,
এক পায় দুই পায় বসন্ত চলিয়া যায়,

শ্যাম মমতায় মেখে বন উপবন!
তার সে বিদায় ভোজ, মধু খায় রোজ রোজ,
ফুলের গেলাস ভরি মধুকরগণ!
তরুণ তমাল গাছে, কি জানি কি লিখা আছে,
কোকিল করিছে পাঠ সে অভিনন্দন!
উড়ায়ে রুমাল ছাতা, নূতন পল্লব পাতা,
আনন্দে জানায় যেন নীরবে কানন!
বসন্ত বিদায়—কাজ, সভাপতি দ্বিজরাজ,
সুধাকরে করে তার শেষ সম্ভাষণ!
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন!

২

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—হায়, হায় হায়!
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায়!
লইয়ে নবীন, হেম,—অক্ষয়ে অক্ষয় প্রেম—
চন্দ্রনাথ, প্রিয়বন্ধু দীনবন্ধু রায়,
ধরে সবে হাতে হাতে, লইয়া আসিলে সাথে,
পারিজাত বন থেকে শ্যামা পাপীয়ায়!
ছিন্ন আশা, ছিন্ন ভাষা, সাজাইলে বঙ্গভাষা,
শীতের শিশির মুছে মলয় হাওয়ায়!

এখনো পূরেনি তার, সময়ের অধিকার,—
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—হায় হায় হায়!
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায়!

৩

বাঙ্গালার মহাকবি—ভারত-ভূষণ,
সাজাইলে কত সাজে কাব্য-উপবন!
কমল 'কমলমণি' পবিত্র প্রেমের খনি,
'কানা কড়ি' দিয়ে সে যে কিনে রাখে মন!
'সতু'রে সারথি করি, আরক্ত কপোলে মরি,
আপনি সমরে ধরে ফুল শরাসন!
সূর্য্যমুখী 'সূর্য্যমুখী', স্বামীর সুখেই সুখী,
স্নেহে প্রেমে মমতায় কোথায় এমন?
কোমল 'কুন্দের' মালা, প্রীতির নৈবেদ্য বালা,
কি সুন্দর করিয়াছে আত্ম-নিবেদন!
'বিষ' নহে 'সুধা' বৃক্ষ, পরশিছে অন্তরীক্ষ,
তারকা 'হীরা'র ফুলে তীক্ষ্ণ কিরণ,
জগতের একধারে, সুদূর সাগর পারে,
আলো করিয়াছে সে যে বৃহৎ রতন!
কত ফুলে সাজাইলে বঙ্গ উপবন!

পূজনীয় প্রিয় কবি, ফুটাইলে যে মাধবী—
বিমল 'বিমলা' রূপে গড় মন্দারণ !
হৃদয়ে লুকায়ে শূল, হাসে কাঁদে চাঁপাফুল,
আকুল 'আয়েসা' চির আনত-আনন !
'রজনী' রজনীগন্ধা আলো করে দিবাসন্ধ্যা,
প্রেম-পূর্ণিমায় তার বেলফুলবন !
ফুল দিয়ে সিঁদ কাটে রমণী কেমন !

৪

বঙ্গের বসন্ত-কবি—ভারত-ভূষণ,
কত ফুলে সাজাইলে ভাষা ফুলবন !
'রোহিণী'র সমতুল, বিধবা বকুল ফুল,
কোন্ দেশে ফোটে হেন মধুমাখা মন ?
কি শোভা পুকুর পারে, 'গোবিন্দ' তুলিলা তারে,
ইন্দিরা লভিলা যেন নিজে নারায়ণ !
অভিমানে উচ্ছ্বসিতা, অপূর্ব্ব অপরাজিতা,
কি সুন্দর 'ভ্রমরে'র মধুর মরণ !
না উঠিতে রাঙ্গা রবি, নির্ম্মল সরল ছবি,
ফুল দলে শিশিরের ধীরে পলায়ন !
কত সাজে সাজাইলে ভাষা ফুলবন !

৫

তুমিই আনিয়া দিলে সুষমা শ্যামল,
আগে ছিল রুখু রুখু না ছিল লাবণ্যটুকু,
মরা গাঙ্গে ছুটাইলে জোয়ারের জল!
দুই জনে চুবাচুবি, দুই জনে ডুবাডুবি,
'প্রতাপ' 'শৈবালে' যুক্ত কাঁপে দেবদল!
এমন আদর্শবীর, কোথা আছে পৃথিবীর,
পিনাকীর চেয়ে এ যে 'প্রতাপ' প্রবল।
তুমি ফুটাইলে এই অনল-কমল!

৬

তুমিই সাজালে তার শ্যাম সুষমায়,
বালিকা 'প্রফুল্ল' আনি, গড়াইলে দেবীরাণী,
বিদ্যুতে মাখিয়া ফুল দেব-প্রতিভায়!
কল্পনা-কালিন্দী-তটে, গড়িলে 'আনন্দমঠে',
ভারত ভবিষ্য স্বর্গ সুমেরু ছায়ায়!
শিখালে সন্তান ধর্ম্ম, জননীর প্রিয় কর্ম্ম,
মহাবীর 'সত্যানন্দ' মহাপ্রাণতায়!
তুমি সাজাইলে তারা অনন্ত শোভায়!

৭

তুমি সাজাইলে ভাষা নানা আভরণে,
কত রঙ্গ কত রস, কমলাকান্তের বশ,
লিখিলে রহস্য কত বিজ্ঞানে দর্শনে!
বুঝাইলে যোগভক্তি, কৃষ্ণের অসীম শক্তি,
দেখালে আদর্শ নর দেব নারায়ণে!
ঝেড়ে পুছে ধূলা মাটী, হিন্দুর আসল—খাটি,
বুঝাইলে দয়া ধর্ম্ম দেশবাসিগণে।
তোমার স্বাধীন মত শরতের রৌদ্রবৎ,
জ্বলিতেছে ভারতের গগনে গগনে।
প্রতিভার দীপ্ত রবি, বাঙ্গালার মহাকবি,
কেন অস্ত যাও আজ অগস্ত্য গমনে,
ঢালিয়া আঁধার ঘন ভাষাকুলবনে?

৮

যাবে তুমি? এ জগতে কে না বল যায়?
কেহ গেলে হাসে লোকে, কেহ গেলে কাঁদে শোকে,
পাষাণ বিদরে কারে করিতে বিদায়!
বসন্ত বাঁচিয়ে থাক্, নিদাঘ শিশির যাক্,
কুশার বাতাসে আর দুখের ধূঁয়ায়!

বার মাস নিতি নিতি, থাকুক পূর্ণিমা তিথি,
চলে যাক্ অমারাহু, ক্ষতি নাহি তায়!
তুমি থাক, মোরা যাই, আমরা যে ভস্ম ছাই,
কি হবে এ কোটী কোটী রেণু কণিকায়?
আমরা পথের ধূলি, কর্দ্দম কঙ্করগুলি,
আমরা নীচের নীচ পড়ে থাকি পায়!
বিধির অপূর্ব্ব দান, দেশের গৌরব মান,
তুমি কবি-কহিনুর কিরীট চূড়ায়!
মোরা যাই, তুমি থাক, সুখী কর মায়!

৯

গম্ভীর বসন্ত নিশি—গভীর গগন,
কলিকাতা—নিমতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে
ধোয়াইয়া ভারতের বুকভরা ধন!
পাতিয়ে অকল ঢেউ—আঁধারে দেখেনি কেউ—
মহাযত্নে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ!—
পাইয়া কবির ছাই, আনন্দের সীমা নাই,
চলেছে পহিরে দিতে ডগমগ মন!
কত যুগ যুগান্তর, হৃতরত্ন রত্নাকর,
দেবতা লুটিয়া নিছে করিয়ে মথন!

পরশে কবির ছাই, ফিরিয়ে পাইবে তাই,
লবণাক্ত জলে হবে সুধা অতুলন!
ইন্দিরা জন্মিবে শঙ্খে, পারিজাত হবে পঙ্কে,
শুক্তি পরশে হবে মুকুতা সৃজন!
শৈবাল প্রবাল হবে, সুধাকর ফেন সবে,
হইবে কল্পতরু তৃণ তরুগণ!
পাষাণে পড়িলে দাগ, হবে মণি পদ্মরাগ,
অঙ্গারে হইবে হীরা কৌস্তভ রতন!
সত্যই কবি কি মরে? বোঝে না অবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন!
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ!" *

'নব্যভারতের' সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে চতুর্দ্দিকে তাঁহার জন্য শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে দেখিয়া কিছু পরিতৃপ্ত হইতেছি বটে, কিন্তু ইহা এই মহাত্মার অমানুষী শক্তির উপযোগী পূজা নহে। কেহ কেহ আপন আপন পথ বাঁচাইয়া কথা বলিতেছেন। কবে তাঁহার চরিত্রে কি দোষ ছিল, এই

* নব্যভারত, ১৩০১ বৈশাখ।

সময়ে কেহ সেই দিকে কটাক্ষপাত করিতেছেন, কেহ বা তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য ছিল, এ কথা ঘোষণা করিয়া উদারতা প্রকাশ করিতেছেন। কেহ প্রবন্ধ অপেক্ষা উপন্যাসের, কেহ বা উপন্যাস অপেক্ষা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের, কেহ বা সকল অপেক্ষা তাঁহার সমালোচনা শক্তির অধিক প্রশংসা করিতেছেন।"

* * * *

"ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান, এ কথা ভাবিলে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে অশ্রু নিপতিত হয়, প্রাণ শোকে, বেদনায় আচ্ছন্ন হয়। কি অপরাধে, সোণার বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্ম-প্রচার ও সাহিত্য-সেবার মায়া পরিত্যাগ করিলেন, জানি না। তিনি কথা প্রসঙ্গে একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—'বঙ্গদেশে, কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি সাহিত্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, যার যা ইচ্ছা লিখিতেছে এবং করিতেছে, ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত।' এই দুঃখেই কি মহাত্মা অসময়ে প্রয়াণ করিলেন? বিংশ বৎসরাধিক কাল তিনি বাঙ্গালা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট ছিলেন, এবং কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর হইতে ধর্ম্ম-

সংস্কারের তিনি অজেয় নেতা ছিলেন, তাহা কি তিনি জানিতেন না? তাঁহার অভাবে যে বঙ্গদেশ সম্রাট-হীন এবং নেতাহীন হইবে, তাহা কি তিনি বুঝিতেন না? তবে কেন গেলেন, কেন কাঁদাইলেন? আকুল প্রাণে মহাশ্মশানে, মহাধ্যান-মগ্ন মহাযোগীকে এ কথা ২৬ এ চৈত্র, রবিবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, উত্তর পাই নাই। যখন দেখিতে দেখিতে প্রজ্বলিত চিতায় মহাত্মার প্রতিভা-প্রদীপ্ত শরীর ভস্ম হইতে লাগিল, এবং সেই স্থানের অমূল্য পরমাণু-মিশ্রিত প্রতপ্ত বায়ু শরীরকে পবিত্র করিতে লাগিল, তখন আকাশের দিকে চাহিয়া, বিহ্বল প্রাণে মহাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, দেব, কেন যাও, কোথা যাও? কিন্তু উত্তর পাই নাই; তখন বুঝিলাম, তিনি বঙ্গদেশের মমতা চিরকালের জন্য ভুলিয়াছেন। হা বঙ্গদেশ! হা বঙ্গভাষা!!

* * *

"এ দেশের শেষ গৌরব, শেষ কীর্তি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ আগুন, শেষ প্রতিভার চিতা নিবিল। এ দেশের গৌরব করিবার যাহা ছিল, নিমেষের মধ্যে তাঁহাকে হারাইলাম।" *

* নব্যভারত।

বাবু অবিনাশচন্দ্র গুহ মহাশয়

লিখিয়াছিলেন :—

অন্ত্যেষ্টি।

"জান না জান না, হারে ভূ-পিশাচগণ!
মুখে শীষ হাতে তুরী, পথে সে মলয়া ছুঁরী
কাণে কাণে কয়েছে কি কথা কন্-কন্?
গঙ্গার গৈরিক'পর, সে দিব্য ত্রিবেণী-থর
ফুলিতেছে খুলি পাক ফণিনী মতন,
আঁধারে মা মাথা কুটে,' কোঁকায়ে কোঁকায়ে লুটে—
আছাড়ে কাঁটালপাড়া কাঁপে ঘন ঘন!
যাঁর সে কটাক্ষ-যন্ত্রে, ঘুরিতি কুলাল যন্ত্রে,
চিবাতেছ আজি তাঁর চিতার চন্দন?
* * *
যজ্ঞ-সূত্রে গরবিতা, দণ্ডবকে খোলে গীতা,
শ্মশ্রুহীন শুকনাস পলিত ব্রাহ্মণ
ভুলেছে কন্যার শোক, রোমাঞ্চিয়া পিতৃলোক
স্ফুরিছে বিরল-দন্তে 'বন্দে মাতরম্'!
ছিঁড়েছে হিয়ার কার, কচ্ছপীর এক তার—
আলুথালু বীণাপাণি খুলেছে তোরণ!

সে স্বপ্ন আনন্দমঠে, আজি কি ফলিবে বটে ?
বঙ্কিম পশিছে ওই বৈকুণ্ঠ-ভবন !
রাখ রে তাণ্ডব রাখ্ ভূ-পিশাচগণ !

২

তুমি ত চলিলে, দেব বঙ্গ-দরশন !
অন্ধ বাঙ্গালার, আহা, কি হবে এখন ?
বৈকুণ্ঠে দেখিলে বাণী, চপলা কমলা রাণী,
আলিঙ্গি' দক্ষিণে বামে মধ্যে নারায়ণ—
পুছিও মা ভারতীরে, আর কি হইবে ফিরে,
সুপ্ত বঙ্গভূমে তাঁর মহা উদ্বোধন ?
ভারতের ঘুমে ভেঙ্গে, বাজিবে হেমের শিঙ্গে ?
নবীনের মহাশঙ্খে হবে ভূ-কম্পন ?
রাজকৃষ্ণ রামদাস, ফুঁ দিবে অমৃত-শ্বাস,
ভারত-কলঙ্ক-কুষ্ঠ করি প্রক্ষালন ?
আবার কি কদাচিৎ বিশ্ববেদাঃ পুরোহিত
করিবে অনন্ত ছন্দে বাণী আবাহন ?
এ তব বাঙ্গালী জাতি, পোহাবে কি কাল-রাতি,
বিশ্বের সাহিত্য-যাগে পাবে নিমন্ত্রণ ?
বঙ্গগুরু ! বাঙ্গালার কি হবে এখন ?

৩

হা বঙ্কিম, কে না জানে তব অবদান ?
কি জ্ঞানী অজ্ঞান আর হিন্দু মুসলমান্ !
নাই ডাকাতের ডর, নাই আর নীলকর,
নিশীথে নিঃশঙ্কচিতে উতারি উজান,
রূপসার * রূপা-বুকে বুড়া নেয়ে, ধুঁয়া-মুখে,
বঙ্কিমবাবুর নাম আজো করে গান !
আশে পাশে নাহি আর নাবিকের হাহাকার—
নীরন্ধ্র সুন্দর-বনে দুকূলে শয়ান,
করে কেলি দম্পতি ধনেশ্বর মধুমতী,
অচকিত পুলকিত, বিকাল বিহান !
পুঁথীর পাতার পরে শ্মশ্রু-নাহি অশ্রু ঝরে,
আজিও আয়েষা লাগি কাঁদে ওসমান !
কাফের লম্পট ঠক্, কত মূর্খ মবারক
দলিত-দরিয়া-দন্ধে হাবু ডুবু প্রাণ !
হা বঙ্কিম, কে না জানে তব অবদান ?

৪

বৈকুণ্ঠে বঙ্গের দেব, করিও স্মরণ,

* খুলনা নগরীর অনতিদূরবর্ত্তিনী নদী।

ধরিয়া মা ইন্দিরার রাতুল চরণ!—
কত আর সে প্রখর ছিয়াত্তরে মন্বন্তর
দগধ খাণ্ডব-বঙ্গ করিবে দহন?
কবে রাক্ষস পোদ, শোক দুঃখ দিবে শোধ,
বাঙ্গালার কৃষী বল হবে উজ্জীবন?
ত্রিসন্ধ্যা জপিও আর, সে সাবিত্রী অনিবার—
উদাত্ত আগ্নেয় শ্রুতি, 'বন্দে মাতরম্',
ক'ও মাগো, আজি তারা—আজি বঙ্গ লক্ষ্মীছাড়া!
কাঁদাইয়া কমলার অমল আনন!
বৈকুণ্ঠে বঙ্গেরে দেব, করিও স্মরণ!" *

*   *   *

* নব্যভারত।

জন্ম-কুণ্ডলী।
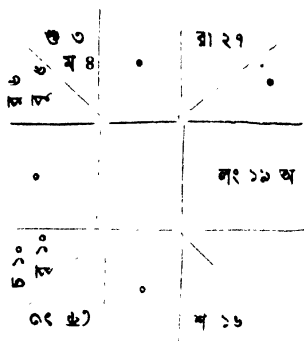
গ্রহস্ফুট	১৮১৫।১১।২৬
জন্মলগ্ন শকাব্দ	১৭৬০।২।১২
	৫৫ । ৯ ।১৪

পঞ্চান্ন বৎসর, নবমাস, ১৪ দিন বয়সে মৃত্যু।

যোগ,—বুধাদিত্য যোগ। নবমাধিপতি বুধ ও দশমাধিপতি শুক্র স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া স্বগৃহে অবস্থান করিতেছেন। সুখাধিপতি ও কর্ম্মাধিপতি শুক্র পঞ্চমে

কোণে অবস্থান করিতেছেন। ফল ঃ—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সুখ, বিদ্যা, মান, যশ।

রাহুর দশায় বৃহস্পতির অন্তর্দশায় মৃত্যু অনিবার্য্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের করতলে উর্দ্ধরেখা ব্যতীত একটী উল্লেখযোগ্য রেখা ছিল। রেখাটি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে তর্জ্জনীর নিম্ন (বৃহস্পতি) হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্ন (বুধ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রেখা রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল। রেখাটি কোথাও বাঁকে নাই বা ভাঙ্গে নাই। এই রেখা যাঁহার হাতে থাকে তাঁহার কবিত্ব সংসারে পূজিত হয়।

উপাধি।

—*—

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষ উপলক্ষে "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ উপাধি তাঁহার ভূষণ না হইয়া কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছিল। সকলেই স্বীকার করিবেন, এ উপাধি বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত হয় নাই। যে উপাধি পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার বা মাইনর স্কুলের শিক্ষক পায়, সে উপাধি বঙ্কিমচন্দ্রের

উপযুক্ত হইতে পারে না। সে সময় এ বিষয় লইয়া একটু গোলযোগ উঠিয়াছিল। কোনও ব্যক্তি, কোনও সাময়িক পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। * প্রবন্ধের নাম—'উপাধি-উৎপাত।' আমি তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম :—

"সে দিনকার উপাধিসত্র মনে পড়ে। বেলভেডিয়ারে সভাগৃহে দরবার বসিয়াছে। মহারাজা বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, নবাব বাহাদুর, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর খিলাতের আশায় বসিয়া আছেন। বঙ্গাধিপ বক্তৃতা করিলেন, উপাধি-ধারীদিগের সুখ্যাতি করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। লোকের দৃষ্টি সমবেত মণ্ডলীর মধ্যে এক জনের উপর পড়িল। তিনি আর কেহ নহেন—রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। অত রাজা, মহারাজা, নবাব থাকিতে, এক জন রায় বাহাদুরের প্রতি সকলের যে নজর পড়িল, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। রাজপ্রসাদে মানুষ ধন্য হয় না—নিজগুণে ধন্য হয়, এ কথা আমরাও—উপাধিলোভী জাতি জানি। যদি কখন আমাদের জাতীয়-

* লেখক—বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পত্র—'সাহিত্য', ১২৯৯ সাল, শ্রাবণ সংখ্যা।

গৌরব হয়, যদি কখন আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে অপর জাতিকে প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত রত্ন সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃভূমিকে লোকে স্বর্ণগর্ভা বলিবে। ততদিনে রাজা মহারাজা নবাবের দল কে কোথায় বিস্মৃতিসাগরে তলাইয়া ডুবিয়া যাইবে, কে বলিতে পারে? এই কথা বুঝিতে পারিয়া সকলে বলিয়াছিল যে, 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়া বঙ্কিম বাবুর প্রতি অবমাননা প্রকাশ করা হইল।

"আর এক দিনের কথা মনে পড়ে। বিতণ্ডাপ্রিয়, গর্ব্বিত পাদ্রী হেষ্টী, ছদ্মনামধারী বঙ্কিম বাবুর রচনা ও তর্ককৌশলে বিস্মিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিল, ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। তখন বঙ্কিম বাবু সদর্পে বলিয়াছিলেন যে, তিনি সে সম্মানের প্রার্থী নহেন, স্বজাতির সুখ্যাতিই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সম্মান।

"ইংরাজ রাজার নিকট তিনি এরূপ তেজের কথা বলিতে পারেন না, কারণ তিনি ইংরাজের কর্ম্মচারী। কিন্তু যদি তিনি বুঝাইয়া মিনতি করিয়া কহিতেন,'দোহাই তোমাদের! তোমাদের কর্ম্ম করিয়াছি, তোমরা আমায়

বেতন দিয়াছ। কর্ম্মত্যাগ করিয়াছি, এখন পেন্‌সন দিতেছ। আমার মাথায় উপাধি চাপাইয়া আর আমায় বিড়ম্বিত করিও না।" তাহা হইলে হয়ত তিনি রেহাই পাইতেন, নগণ্য রাজা, মহারাজ, রায় বাহাদুরদিগের সমভিব্যাহারে রাজদ্বারস্থ হইতে হইত না। যদি এ কথা প্রকাশ পাইত যে, বঙ্কিম বাবু 'রায় বাহাদুর' উপাধিগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা হইলে আজ সে কথা লইয়া আমরা স্পর্দ্ধা করিতে পারিতাম।"

ইহার কিছু দিন বাদে 'সাহিত্য'-সম্পাদক একখানি 'বিশ্বস্ত' পত্র পাইলেন। সে পত্রের মর্ম্ম সকলকে জানাইয়া তিনি বলিলেন যে, "নিজে উপাধির প্রার্থী হওয়া দূরে থাক্‌, গেজেটে উপাধির তালিকা মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই।" আমরা সবিশেষ অবগত আছি যে, এই পত্রখানি বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সাহিত্য-সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন। সুতরাং অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সি আই ই উপাধি পাইলেন। Investiture দরবার হইল ২১শে

মার্চ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সুতরাং তিনি দরবারে যাইতে পারেন নাই।

সি আই ই উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার বন্ধুবান্ধব অনেকেই অভিনন্দন-পত্র লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্রখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আপনাকে সম্মানিত করিয়া গভর্মেণ্ট সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে সম্মানিত করিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন, "আমি জানি, যে কথা আপনি বিশ্বাস করেন না, বা সত্য বলিয়া মনে করেন না, সে কথা কখনও আপনি বলেন না বা লিখেন না। আমি চিরদিন আপনার পত্রখানি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিব।"

গুরুদাস বাবুও চিরদিন বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রখানি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন :—"তখনও কিন্তু আমি বঙ্কিমবাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে সকলে যাহা করিয়া থাকে আমিও তাহা করিতাম। মনে মনে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এমন কেহ কেহ আমাকে বলিতেন, 'বঙ্কিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।' কিন্তু তাঁহাকে যখন দেখিলাম, তখন আমার কল্পিত মূর্ত্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়িল তাহার ঠিকানা রহিল না। ২২ কি ২৩ বৎসর হইল কলিকাতায় কালেজ রিইউনিয়ন নামে ইংরাজীওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত। * * আমি ঐ কালেজ রিইউনিয়নে যাইতাম। যাইতাম—কৃষ্ণ বন্দ্যো, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, প্যারীচাঁদ, রামশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আমিও একজন কালেজোত্তীর্ণ—আমিও তাঁহাদের সমান, এই শ্লাঘার ভরে। এবং আমার বিশ্বাস অনেকেই আমার ন্যায় শ্লাঘার ভরে যাইতেন—সদ্ভাবসৃষ্টির বা বন্ধুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষী হইয়া কেহ যাইতেন না। কিন্তু ও সব কথা

এখন থাক। আমি দ্বিতীয় কালেজ রিইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মরকতকুঞ্জ নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি, এমন সময় একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে প্রকার অভ্যর্থনা করিতেছিলাম, বিদ্যুতকেও সেই প্রকারে অভ্যর্থনা করিলাম বটে। কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করমর্দ্দন করিতে পাইব কি? সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম, হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই—আমার হাতের ভিতরেই আছে। যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে পারে না।" *

* প্রদীপ, প্রথম ভাগ।

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—"সে দিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়্যুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভাল স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সে দিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুক-প্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ়পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সে দিন আর কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী এক সঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান পাইয়া জানিলাম, তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিত দর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিম বাবু "

বঙ্কিম-জীবনী।

চতুর্থ খণ্ড।

সাহিত্য।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য।

যে বঙ্গভাষা আজ সাহিত্য-সম্পদে গৌরবশালিনী, বিবিধ ভাবসম্ভারে বিভূষিতা, সে বঙ্গভাষার জননী কে? বঙ্গভাষার জননী প্রাকৃত ভাষা; আবার প্রাকৃত ভাষার জননী সংস্কৃত-ভাষা। সংস্কৃত, বিশুদ্ধ ভাষা। যখন দেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তখন সাধারণ লোকে সংস্কৃত হইতে একটু বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত। অবশেষে সেই সাধারণ লোকের ভাষা প্রাকৃত ভাষা বলিয়া অভি-হিত হইল। সকল দেশেই এরূপ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ইতর বা সাধারণ লোকের ভাষা, বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা হইতে অনেক বিভিন্ন। আমাদের দেশেও তাই। বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় ও চলিত বাঙ্গালায় অনেক প্রভেদ। বিশুদ্ধ বাঙ্গালার অনেক শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, চলিত বাঙ্গালার প্রায় সমুদয় শব্দ প্রাকৃত ভাষা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যখন 'কার্য্য' বলা যায়, তখন উহা সংস্কৃত-প্রসূত, আর যখন 'কাজ' বলা যায়, তখন উহাকে প্রাকৃত কজ্জ শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ 'কর্ণ' সংস্কৃত, আবার 'কাণ' প্রাকৃত 'কন্নে'র রূপান্তর। সেইরূপ

'হস্ত' হইতে 'হত্থ', 'হত্থ' হইতে 'হাত' হইয়াছে। 'চন্দ্র' হইতে 'চন্দ', 'চন্দ' হইতে চাঁদ। বাঙ্গালা ভাষার জননী প্রাকৃত ভাষা হইলেও উভয়ের মধ্যে ব্যাকরণগত অনেক পার্থক্য আছে। প্রাকৃতে সাধারণতঃ একটা 'স' আছে—'শ' ও 'ষ' নাই; একটা 'ন' আছে—'ণ' নাই; একটা 'জ' আছে—'য' নাই। বাঙ্গালা ভাষা এ সকল স্থলে এবং সন্ধি ও সমাসে জননীর পথানুবর্ত্তিনী না হইয়া মাতামহী সংস্কৃত ভাষার অনুসারিণী হইয়াছে।

প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তির কাল নিরূপণ করা দুরূহ হইলেও এ কথা বলা যায় যে, মহারাজ অশোকের সময় এক প্রকার প্রাকৃত-ভাষা প্রচলিত ছিল। সে আজ প্রায় একুশ শত বৎসরের কথা। তার কিছুদিন পরে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভা-রত্ন বররুচিকে প্রাকৃত ভাষার প্রথম ব্যাকরণ 'প্রাকৃতপ্রকাশ' রচনা করিতে দেখা যায়। সেও প্রায় দুই হাজার বৎসরের কথা। কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় রচিত কোনও পুস্তক এক্ষণে পাওয়া যায় না। তাহা পাওয়া দূরে থাকুক, বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গ্রন্থও দুষ্প্রাপ্য। বিদ্যাপতির রচনাই আমরা সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত হই। অতএব ইনিই বাঙ্গালার আদি কবি। জয়দেবের

চনা বাঙ্গালা ভাষায় নহে; সুতরাং তাঁহার নামোল্লেখ ক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যাপতির পূর্ব্বে বাঙ্গালা বা প্রাকৃত াষায় যদি কেহ গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, তবে তাহার চিহ্ণ বা স্মৃতি এক্ষণে নাই।

বাঙ্গালার আদি কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অনু-মান পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে। তাঁহার সম সময়ে আরও দুই-জন কবি বাঙ্গালা পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস। কিন্তু কে কোন্ সময়ে জন্মিয়া-ছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। নিম্নে প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের একটা তালিকা প্রদত্ত হইল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

—:০:—

পঞ্চদশ শতাব্দী।

কৃত্তিবাস।

—০—

ষোড়শ শতাব্দী।

কাশীরাম, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, কৃষ্ণদাস, রঘুনাথ দাস, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, প্রেমদাস, বলরাম দাস, গৌরী দাস, নরহরি সরকার ও মাধব।

সপ্তদশ শতাব্দী।

মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ দাস, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

অষ্টাদশ শতাব্দী।

রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন, ভারতচন্দ্র রায়, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), রাম বসু, হরুঠাকুর, ও নিতাই দাস।

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহাতে প্রধান প্রধান কবিদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে—ক্ষুদ্র কবিদিগের নাম দেওয়া হয় নাই। রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বহু কবি

কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; মহাভারতের কবি অন্যূন ৩৫ জন; 'মনসার ভাসানে'র কবি অন্ততঃ ৬২ জন। সকলের নাম দেওয়া সম্ভবপর নহে—প্রয়োজনও নাই।

এই সকল কবিদিগের মধ্যে বাঙ্গালা গদ্য বড় একটা কেহ যে রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ শুনা যায় না। রচনা করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সে রচনা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। শুনা যায়, কবি ভারতচন্দ্র মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে একখানি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, একটা বিপ্লব না ঘটিলে সাহিত্যের উন্নতি হয় না। বিপ্লবটা ধর্ম্মঘটিত হইলেই সাহিত্য যেন অনুপ্রাণিত হইয়া জাগিয়া উঠে। লুথার যখন বাইবেল অনুবাদ করিয়া পোপের গর্ব্ব চূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখন ইউরোপীয় সাহিত্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। চৈতন্যদেবের সময় যখন বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল, তখন অনেকগুলি বৈষ্ণব কবির অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইংলণ্ডে রাজ্ঞী এলিজ্যাবেথের সময় যখন প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে ঘোরতর কলহ চলিতেছিল, তখন প্রতিভা-

স্রোতে দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। আবার বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল, তখন মৃতপ্রায় বঙ্গসাহিত্য পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিবাদ করিতে হইলেই সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; আর সে আশ্রয় পদ্য দিতে অসমর্থ। কাজেই গদ্যে বিবাদ চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া হিন্দুদের ধর্ম্ম-প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। হিন্দুরাও "পাষণ্ড পীড়ন" শীর্ষক পুস্তক রচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদের গালি দিয়াছিলেন। উত্তর প্রত্যুত্তর, তর্কবিতর্ক উভয় পক্ষে বেশ চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মরা 'সমাজ' খুলিলেন, হিন্দুরা 'ধর্ম্মসভা' বসাইলেন। সমাজে ও সভায় বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠের কোনও ত্রুটি হয় নাই আবার সেই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। এইরূপে ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্র ধরিয়া বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি হইল, আর সেই গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়।

কিন্তু দেশে মুদ্রাযন্ত্র না আসিলে কিছুই হইত না।

মুদ্রাযন্ত্র আনিলেন, ইংরাজ। পলাশি যুদ্ধের বিশ বৎসর পরে—ইংরাজ যখন সবেমাত্র রাজ্যভার গ্রহণ করিতেছেন, তখন চার্লস্ উইলকিন্স নামক একজন মহাশক্তিশালী ইংরাজ কাঠ কাটিয়া, খুদিয়া এক প্রস্ত বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। এই কাঠের অক্ষর সম্বল করিয়া উইল্‌কিন্স সাহেব হুগলীতে একটী মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন; এবং সেই যন্ত্রে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত করিলেন। এই ব্যাকরণের প্রণেতা বাঙ্গালী নহে—একজন ইংরাজ। তাঁহার নাম হলহেড্। তিনি গ্রন্থশিরে লিখিলেন।—

বোধ প্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গীনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী।"

আর একজন ইংরাজ * একখানি বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিলেন। ইংরাজের নিকট আমাদের ঋণের শোধ নাই। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই আমাদের অক্ষর প্রস্তুত করিয়া দিলেন, আমাদের ভাষা সৃষ্টির জন্য ব্যাকরণ গড়িয়া দিলেন, শিক্ষার জন্য অভিধান প্রণয়ন

* ফরষ্টর্।

করিয়া দিলেন। লক্ষ লক্ষ মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা পরিপূরিত হউক, শত শত ব্যাকরণ অভিধানে দেশ প্লাবিত হউক, তবু ইংরাজের প্রথম উপকার বিস্মৃত হইবার নহে—ঋণ অপরিশোধ্য।

উইলকিন্স সাহেবের কৃপায় বাঙ্গালীও অক্ষর প্রস্তুত করিতে শিখিল। তাঁহার প্রথম ছাত্র, পঞ্চানন কর্ম্মকার। এক একটি অক্ষর প্রস্তুত করিতে পঞ্চানন একটাকা চারি আনা লইত। এত অধিক মূল্যের অক্ষর আবার বেশী দিন টিকিত না। কাজেই সিসার অক্ষর ঢালাই করিতে হইল। কিরূপে ঢালাই করিতে হয়, তাহাও ইংরাজ বাঙ্গালীকে শিখাইলেন।

মুদ্রাযন্ত্র পাইয়া রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার বিপক্ষীয়দের বড়ই সুবিধা হইল। রাজা "ধর্ম্মতলা ইউনিটেরিয়ান যন্ত্রালয়" নামক একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া নিজের ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং বেদান্ত ও উপনিষদ প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ প্রবর্ত্তন করিলেন। বঙ্গভাষা উন্নতির পথে প্রধাবিত হইল। তাঁহার পূর্ব্বে ভাষা পদ্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া উন্নতি করিতে

পারিতেছিল না। রাজা রামমোহন রায় কুঠার হস্তে আসিয়া সে শৃঙ্খল ছিন্ন করিলেন। ভাষা অবরোধমুক্ত প্রবাহিণীর ন্যায় ছুটিয়া চলিল। কিন্তু অরণ্যের মধ্যে গিয়া পথ হারাইল। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত পথ কাটিতে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন বটে, কিন্তু সে পথ অতি সঙ্কীর্ণ। তাঁহারা ভাষার জটিলতা ঘুচাইয়া তাহা মনোহর করিলেন বটে, কিন্তু ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী রহিল,—স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করিয়া বিপুল সলিলে অঙ্গ ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল। প্যারী চাঁদ মিত্র তাঁহার গতি ফিরাইয়া বিভিন্ন পথে আনিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে পথ প্রশস্ত করিয়া কাটিয়া প্রবাহিণীর বক্ষে বাণ ডাকাইলেন।

রামমোহন রায়ের যুগের পর, বিদ্যাসাগরের যুগ। যদিও এই যুগে বাঙ্গালা উপন্যাস * সর্ব্বপ্রথম রচিত হয়, বাঙ্গালা নাটক † সর্ব্বপ্রথম সৃষ্ট হয়, তথাপি বলিতে হইবে, এই যুগ অনুবাদের যুগ। এই যুগে—এই মধ্য যুগে বাঙ্গালা ভাষার বহুল উন্নতি হইয়াছিল। এতদ্-

---

* আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত।

† ভদ্রার্জ্জুন, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত।

সম্বন্ধে তৃতীয় যুগের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা গদ্যের ইতিবৃত্ত দিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ;—

"প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক রচনা সংস্কৃতের ন্যায় হইত। গদ্য-রচনা ছিল না, এমন কথা বলা যায় না, কেন না হস্তলিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম, প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধু ভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা, অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। * * তাঁহারা কদাচ খয়ের বলিতেন না—খদির বলিতেন ;

কদাচ চিনি বলিতেন না—শর্করা বলিতেন। পণ্ডিতগণের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ানক ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এই সস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষা রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

"ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষার আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভা-শালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজী হইতে এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অব-লম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালী লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া সক-লেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়া-ইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু

যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালী লেখকের সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ্।

"এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডার পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন; কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, অন্য কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

"উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন-মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্বজন হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্ল্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে। এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের * কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল।' ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নহে। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' পর হইতে বাঙ্গালি-লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে

* ইনি র‍্যাসেলাসও বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।" *

বিদ্যাসাগর-যুগে বাঙ্গালা-গদ্য অনেক উন্নতি করিল বটে, কিন্তু আদর্শ বাঙ্গালা সৃষ্ট হইল না। আদর্শ বাঙ্গালা সৃষ্ট হইল, বঙ্কিম-যুগে; সৃষ্টি করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু তাঁহাকে অনেক গালি খাইতে হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছিল, "বঙ্কিমি ভাষা পিতা পুত্রে এক সঙ্গে পড়া যায় না।" †

কেহ বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লেখা বুদ্ধিহীনের কাজ, সহজ বাঙ্গালা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা মূর্খের কাজ।" ‡

স্বর্গীয় রাজেন্দ্র লাল মিত্র, "লম্ফত্যাগ, নিদ্রাগমন" প্রভৃতি শব্দ লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কেহ বলিয়াছিলেন, পল্লীগ্রামবাসীরাই "লম্ফত্যাগ" করিয়া থাকে—সহুরে লোকেরা নাকি লম্ফদান করিয়া থাকে। §

* লুপ্ত রত্নোদ্ধার।

† নব্যভারত ১৩০১।

‡ ঐ।

§ রহস্য সন্দর্ভ।

এইরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের আক্রমণের মধ্যেও মহাপ্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র অবিচলিত থাকিয়া ভাষা সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান অক্ষয় কীর্ত্তি, ভাষা সংস্কার। বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ইংরাজি-প্রিয় কৃতবিদ্যগণকে বাঙ্গালা ভাষা পড়াইবেন; তাঁহার সে ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না যে, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী পড়েন নাই। তাঁহা-দের কথা দূরে যাউক, যে সকল ইংরাজেরা স্বল্পমাত্র বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়াছেন। যাঁহারা শিখেন নাই, তাঁহারা ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া সাধ মিটাইয়াছেন।

বঙ্কিম চন্দ্রের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী নহে, তাঁহার ভাষায় আড়ম্বর বা জটিলতা নাই। দৌর্ব্বোধ্য ঘুচাইয়া ভাষাকে তিনি সরল করিলেন, বড় বড় সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিয়া তিনি তাহাকে সহজ করিলেন, নীরসকে মধুর করিলেন; প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার হইতে ভাব-সম্পদ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহাকে মনোমত

করিয়া সাজাইলেন, কালিদাসের উপমা-মালা আনিয়া মাতৃভাষার গলায় দোলাইয়া দিলেন—শ্রীহর্ষের ভাব-বচিত্র্য আনিয়া শিরোভূষণ গড়িয়া দিলেন ;—ভবভূতির কবিত্ব আনিয়া মেখলারূপে কটিতে জড়াইয়া দিলেন—ভারতচন্দ্রের লালিত্য ও সারল্য আনিয়া চরণে নূপুর-রূপ বাঁধিয়া দিলেন। যে উপমা সংস্কৃত শব্দের সাহায্য ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হওয়া অসম্ভব ছিল, তিনি তাহা অবলীলাক্রমে সরল বাঙ্গালায় লিখিয়া গেলেন—য ভাব, যে শক্তি, যে লালিত্য বাঙ্গালা ভাষায় অপরিচিত ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভাষাকে বশোভিত করিলেন—দরিদ্রকে রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া জগত-সমক্ষে উপস্থিত করাইলেন। যে দারিদ্র্যভারে নপীড়িত হইয়া, লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া এক পাশে লুকাইয়াছিল, আজ সে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈদ্যুতিক স্পর্শে—বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত আভরণে ভূষিতা হইয়া গর্ব্বস্ফীত-বক্ষে জগত-সমক্ষে দণ্ডায়মানা। যাহার উঠিবার শক্তি ছিল না, সে আজ গিরিলঙ্ঘনোদ্যতা—যে মূক ছিল, সে আজ বক্তৃতা-গর্জ্জনে বঙ্গভূমি প্রকম্পিত করিতেছে—যাহার রূপের বৈচিত্র্য ছিল না, সে আজ ইংরাজ-কৃত

ইতিহাস দূরে ফেলিয়া দিয়া নিজের ইতিহাস নিজে লিখিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দুই তিন খানি গ্রন্থের ভাষা তেমন সহজ ও সরল ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র পরে বুঝিয়াছিলেন যে, সারল্যই ভাষার সৌন্দর্য্য। তাই তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধু জগদীশ বাবুকে লিখিয়াছিলেন,—

"Clearness and simplicity are the best of all ornaments ; and that I have arrived at this conviction after much painful experience."

বিষবৃক্ষের ভাষা অতুলনীয়। ভাষার যেমন শক্তি তেমনই উচ্ছ্বাস। কোথাও বীণার ঝঙ্কার, কোথাও নদীর কুলু কুলু ধ্বনি। স্রোতের ন্যায় ভাষা বহিয়া চলিয়াছে, বাধা নাই, বিরাম নাই। কোথাও তরঙ্গ গর্জ্জন, কোথাও বা নববধূর প্রেমালাপ-তুল্য কোমল ধ্বনি। সপ্তসুরে ভাষা সঞ্জীবিত—ভাবভারে উচ্ছ্বসিত, এমন ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্ল্লভ—অন্য দেশের সাহিত্যেও বিরল।

রামমোহন রায়ের যুগের প্রারম্ভ হইতে বিদ্যাসাগরের যুগের মধ্যকাল পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল,

তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল। সর্ব্বাগ্রে রামমোহন রায়ের রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

"আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনাচারির নিন্দা করেন অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসি হয়েন, আর গোপনে নানাবিধ আচরণ করেন; আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্টরূপে ভোজন করে, আপনাকে কোনমতে সদাচারি দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে তাহা অঙ্গীকার করে।" *

১৮০১ সালের বাঙ্গালা পদ্য :—[লিপিমালা, রাম রাম বসু প্রণীত।]

"মানব সৃজন বিধি করিল যখন।
সেই কালে ষড়রিপু কৈল নিয়োজন।

* নব্যভারত, দ্বাদশ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

অতএব ভুলভ্রান্তি আছে সর্ব্ব জনে।
মানব লক্ষণ বসু রামরাম ভনে।
শস্তাদিত্য বসু বর্ষ পশুশ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ।"

গদ্য :—[উক্ত পুস্তক ; কাষ্ঠের অক্ষরে মুদ্রিত।]

"সম্প্রতি শিরসী দেশাধিপ নষ্টতা করিয়া আরঙ্গের নালার বাঁধাল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন তাহার প্রত্যুপকারে এখানকার লোক গিয়াছে দমন হইবেক তাহাতে কি হয় আপনকার ও অঞ্চল ঐ বাঁধালে রক্ষা পায় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন। এখান দিয়া যে আনুগত্য হইতে পারে ক্রটি হইবেক না। ইচ্ছা আপনি যাইয়া তোমার ও অঞ্চল যাহাতে রক্ষা পায় তাহা করি কিন্তু এখানে আর আর অনেক অনেক লোক ওখানকার সহিত বিপক্ষতা করিয়া নষ্টতা করিতে উদ্যত তাহাদের দমন নহিলে ওখানকার উপর বিপত্তি হওনের আটক হইতে পারে না। এই হইল তাহার বাধক তথাচ ক্রটি হইল না। কয়েক হাজার সেনা-সমেত রাজা নরকুমার আপনকার আনুগত্য নিমিত্ত প্রেরিত হইল ইহা দিয়া ক্রটি হইবেক না। আর আর নিগূঢ় প্রসঙ্গ অনেক যাহা

অলিখ্য তাহা ইনি পৌচিয়া আপনকার সুগোচর করিলেন। কোন বিষয় ভাবনা করিবা না ইহা দিয়া অনেক অনুগত্য হইবেক আমিও এই লোকেরদিগের দমন করিয়া আপনকার ও অঞ্চলের অবশ্য আনিব ইহাতে সন্দেহ করিবা না ত্বরা প্রতুল করা যাইবেক।”

১৮০২ সালের ভাষা ঃ—[বত্রিশ সিংহাসন, মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।]

“ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী দিব্য সুন্দর এক পুরুষ থাকেন কিন্তু দুই জনের দুই মস্তক ছিন্ন হইয়া পৃথক আছে মস্তকের সমীপে এক প্রস্তরে কথোকগুলি অক্ষর লেখা আছে যে উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপনার মস্তক চ্ছেদন করিয়া বলি দিবে তবে এই স্ত্রী পুরুষের জীব ন্যাস হবে। এই সকল দেখিয়া ধনদত্তের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। তৎপর ধনদত্ত তীর্থদর্শন করিয়া আপন গৃহে আইলেন। এক দিবস ধনদত্ত কথাপ্রসঙ্গে রাজার সমীপে এ সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার কাছে নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন ধনদত্ত সেই স্থানে আমার সহিত চল। এই পরামর্শ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য ধনদত্তকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গেলেন।

রাজা আপনি সাক্ষাতে সমস্ত দেখিয়া বিচার করিলেন পরের যৎকিঞ্চিৎ উপকারের নিমিত্তে উত্তম লোকে প্রাণপণ করে আমি প্রাণ দিলে ইহারা স্ত্রীপুরুষ দুই জনে জীবিত শরীর হইবে রাজা সরোবরে স্নান করিয়া দেবীর সাক্ষাতে আপন মস্তক চ্ছেদন করিতে উদ্যত। ইতিমধ্যে দেবী প্রসন্না হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন হে রাজা তুমি উত্তম পুরুষ তোমাকে সন্তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর।"

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের উৎকট সাধুভাষার উদাহরণ :— [প্রবোধ চন্দ্রিকা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত।]

"কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়ানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

১৮১৪ সালের ভাষা ;—[পুরুষপরীক্ষা, হর প্রসাদ কর প্রণীত]

"জয়ন্তী নগরীতে ধীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ যোগ্যতাতে ধন উপার্জ্জন করিয়া নির্ভীক ও বহুপুত্রযুক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করেন।"

১৮২০ সালের ভাষা ;—[পত্র-কৌমুদী]

"ঐ সকল পাঠশালার বালকেতে উঠান পরিপূর্ণ,

আর বালকেরা এস্তাহাম * দিবার নিমিত্তে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া বেড়াইতেছে আমার এমত বোধ হইল, কিছু কাল আমি এই আমোদ দেখিতেছিলাম, ইতিমধ্যে শাহেব ও মুছলমান ও বাঙ্গালি লোকেরা গাড়ী ও পালকীতে চড়িয়া আইলেন; তাহারদিগকে শ্রীযুত বাবু গোপী মোহন দেবের লোকেরা সমাদর করিয়া বড় দালানের মধ্যে বসাইলেন, এবং যে যে কেতাব বালকেরা শিখিয়া থাকে নীতিকথা ও দিগ্দর্শন প্রভৃতি ছোট বড় এই সকল কেতাবে, পরিপূর্ণ এক মেজ দালানের মধ্যে ছিল।"

১৮২৬ সালের ভাষা;—[বহুদর্শন, নীলরত্ন হালদার প্রণীত]

"দ্বিতীয়তো যে সকল ব্যক্তি বিষয়িরূপে খ্যাত এবং যাঁহারদিগের সময় বিষয়ানুষ্ঠানে ভুক্ত হওনে এ সকল বহু ভাষার সারোদ্ধার করণে অনবকাশ ও তন্নিমিত্তে প্রস্তাব্য বক্তব্য সভ্য শৌভ্য ভব্য করণে আয়াস বোধে হতাশ কিম্বা যে সকল ভাগ্যবান লোকের সন্তান সর্ব্বদা

* Examination.

সুখানুরক্ত প্রবৃক্ত পরিশ্রমের শঙ্কাতঙ্কায় শাস্ত্ররূপ সমুদ্রে মগ্ন হওনে ভগ্নোদ্যম—"

১৮৩৩ সালের বাঙ্গালা ভাষা ;—[প্রবোধচন্দ্রিকা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক রচিত]

"মরণোত্তর কেবা কার পতি কেবা কার পত্নী। জীব জীবেতেই বাঁচে তোর যে পতি ছিল সেই কি জীব আর কি জীব নাই এত দিন কি ঐ জীবকে উপজীব্য করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলি ইদানী অন্য জনোপজীবনে জীবিত কাল যাপন কর কেহ কি কাহার স্বামী বলিয়া চূণের ফোটা দেওয়া হইয়া আছে। আমরা চতুষ্পদ পশুজাতি বিশেষতঃ আমাদের কাহার সহিত কি সম্পর্ক লজ্জাই বা কাহা হইতে। ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় বা কি বেদ শাস্ত্র চাতুর্বর্ণ্যাধিকারিক আমার বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাবহির্ভূত বাহ্যলোক।"

১৮৩৬ সালের কবিতা ;—বাসবদত্তা, [মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।]

এথায় কামিনী সাজিয়া সাজ।
বসিয়া রসিকা সখীর মাঝ॥

নাগর না এল হইল নিশা।
ভাবে মৃগী যেন হারায়ে দিশা॥
কি হ'ল কি হ'ল ওলো সজনি।
নাথ কই এত হল রজনী॥
যা গো সখি তোরা জনেক যাও।
বারেক বন্ধুরে আনিয়া দাও॥
তাহারে না হেরে বুক বিদরে।
কারে কব সই প্রাণ যে কি করে॥
হেদে মদনিকা চলিয়া গেল।
খেয়ে মোর মাথা কেন না এল॥

১৮৪৩ সালের বাঙ্গালা ভাষা,—[সমাচারচন্দ্রিকা, ২রা আষাঢ় ১২৫০]

"এক জন ভূম্যধিকারী ও ফলের বাগানের বন্ধক-লওনিয়া মহাজনেতে বিবাদ হইল। তাহাতে ঐ বন্ধক-লওনিয়া মহাজনের দখলে বাগান আছে ইহা স্বপ্রোধরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া বরেলীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার ভোগ দখলে তাহা থাকিতে হুকুম দিলেন।"

১৮৫২ সালের বাঙ্গালা ভাষা ;—[বাঙ্গালার ইতিহাস, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত]

"কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা ষাটি বৎসরের অধিক কাল নিরুপদ্রবে ছিলেন; সুতরাং বিশেষ আস্থা না থাকাতে তাঁহাদের দুর্গ প্রায় এক প্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফলতঃ তাঁহারা আপনাদিগকে এমত নিঃশঙ্ক ভাবিয়াছিলেন যে, দুর্গপ্রাচীরের বহির্ভাগে বিংশতি ব্যাসের মধ্যেও অনেক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎকালে দুর্গমধ্যে এক শত সত্তর জন মাত্র সৈন্য ছিল; তন্মধ্যে কেবল ষাটি জন ইউরোপীয়। বারুদ পুরাতন ও নিস্তেজঃ; কামান সকল মরিচাধরা।"

১৮৫২ সালের ভিন্নজাতীয় বাঙ্গালা ভাষা,—[বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক প্রণীত।]

"এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, স্বদেশের দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের তন্নিরাকরণার্থে লোকদিগকে ভৌতিক শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত।"

১৮৫৭ সালের বাঙ্গালা ভাষা ;—[চরিতাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, মহাত্মা বিদ্যাসাগর প্রণীত।]

"একদিন একটি স্ত্রীলোক সিমসনের নিকট কোন বিষয় গণাইতে আসিয়াছিল। ঐ গণনাতে চণ্ড নামাইবার আবশ্যকতা ছিল। সিমসন এই অভিপ্রায়ে এক ব্যক্তিকে বিকট বেশ ধারণ করাইয়া নিকটবর্ত্তী ঘরের গাদার পাশে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, চণ্ডকে আহ্বান করিলেই ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইবেক।"

সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু কিরূপ আদর ছিল, তাহা বলা হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য সে সময় আদর পাওয়া দূরে থাকুক্, যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃণা ও অবজ্ঞা পাইয়া আসিয়াছে। শুধু বাঙ্গালা নয়, সংস্কৃত সাহিত্যও নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে।* ইংরাজি-কৃতবিদ্যগণ মনে করিতেন, সংস্কৃত বা বাঙ্গালা সাহিত্যে শিখিবার কিছুই নাই। যোগীন্দ্রনাথ বাবু এ

* লর্ড মেকলে বলিয়াছিলেন, কোন ইউরোপীয় উত্তম পুস্তকালয়ের একটি মাত্র আলমারি ভারতবর্ষ ও আরব্যের সমগ্র সাহিত্যের সমতুল্য। ডফ সাহেবও ঐ রকম কি একটা বলিয়াছিলেন।

সময়ের অবস্থা সবিশেষ দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার পুস্তক হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "তাঁহারা (শিক্ষিত সমাজ) সত্য সত্যই মনে করিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষণীয় কিছুই নাই ; ইহা কেবলই কুশ তৃণের গুণাগুণ এবং ঘৃত দুগ্ধ ও দধি সমুদ্রের বর্ণনা-তেই পরিপূর্ণ, এই বিশ্বাস অনুসারে তাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত এবং ভগবদ্গীতায় মুক্তা না পাইয়া, ইলিয়াড, ইনিয়াড এবং ফিল্ডিংয়ের উপন্যাসে মুক্তা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিতগণ অতি কৃপাপাত্র এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতীতি জন্মিল। স্বদেশীয় কাব্য পুরাণাদিতে অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান না থাকাই যেন তাঁহারা গৌরব-জনক মনে করিতেন। তাঁহারা আকিলিস্ ও আগা-মেম্‌ননের ঊর্দ্ধতম সপ্তম পুরুষের নাম করিতে পারিতেন। কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য কি প্রপৌত্র জিজ্ঞাসা করিলে হাঁ করিয়া থাকিতেন, সেক্সপিয়র বা মিল্টনের গ্রন্থের কোন্ স্থলে কি আছে, তাহা তাঁহাদিগের জিহ্বাগ্রে বিরাজ করিত, কিন্তু বনপর্ব্বে রামচন্দ্রের বন-

বাস, কি যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বাসন লিখিত আছে, তাহা তাঁহা-দিগের জ্ঞান ছিল না। বেদব্যাস ও বাল্মীকির ভাষারই যখন এই দুর্দ্দশা ঘটিল, তখন দুঃখিনী বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা আর কি লিখিব। হিন্দু কলেজের অনেক খ্যাত-নামা ছাত্র বাঙ্গালায় বিশুদ্ধরূপে আপন আপন নামও লিখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব আছে, বা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের মনে উদিত হইত না। দোকানদারদিগের এবং অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগের পাঠের জন্য মহাভারত রামায়ণ নামে দুইখানা পদ্যগ্রন্থ আছে, এইমাত্র তাঁহারা জানি-তেন। গুপ্ত কবির "প্রভাকর" তখন বঙ্গসমাজের এক অংশে জ্যোতি দান করিতেছিল বটে, কিন্তু নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তাহার সমাদর ছিল না। নব্যদিগের মতে যাঁহারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহারাই তাহার সমাদর করিতেন। বাঙ্গালা গ্রন্থ নব্য-দিগের পাঠাগার হইতে নির্ব্বাসিত হইল; বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহা এবং বাঙ্গালায় পরস্পরকে পত্র লেখা তাঁহারা অপমানজনক বলিয়া মনে করিতেন।" *

* মাইকেলের জীবন-চরিত।

এই ঘোর অমঙ্গল হইতেও আমরা মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছি। পাশ্চাত্য সাহিত্য আমাদের দেশে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে মহাকবিদিগের ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত আমাদের পরিচয় হইল। সেক্সপিয়র, মিল্টন, দান্তে, গেটেকে আমরা চিনিলাম—সেলি, কীট্‌স্‌, বার্ণস্‌, সুইনবর্ণ প্রভৃতির কল্পনা উচ্ছ্বাসের সহিত আমরা পরিচিত হইলাম—কিরূপে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য সংস্কৃত করিতে হয় তাহাও আমরা শিখিলাম। বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব রাজনীতি সকল বিষয়েই আমরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলাম। পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোক আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার, মনের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করিল। কেহ বিধবার দুঃখে বিগলিত হইয়া সমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন (১)—কেহ পাশ্চাত্য ধর্ম্মের অনুকরণে ধর্ম্ম সংস্কারে ব্রতী হইলেন (২) —কেহ রাজনীতি ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন (৩)

(১) মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(২) মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৩) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

—কেহ বা দেশহিতৈষণার আদর্শরূপে দেশমধ্যে পূজিত হইলেন (৪)। সাহিত্য-সংস্কার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার একখানি মাসিক পত্রিকা (৫) প্রচার করিলেন; ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের অনুশীলন জন্য রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একখানি মাসিক পত্র (৬) প্রকাশ করিতে ব্রতী হইলেন; ধর্ম্ম-সংস্কার জন্যও মাসিক পত্রের (৭) অভাব হইল না; রুচি মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি পত্র (৮) প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ভাষাকে সহজ ও সরল করিবার অভি-প্রায়ে প্যারীচাঁদ মিত্র একখানি কাগজ (৯) প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার বৈদ্যুতিক স্পর্শে বাঙ্গালীর সুপ্ত প্রতিভা জাগরিত হইয়া শতমুখে

(৪) রামগোপাল ঘোষ।
(৫) সর্ব্ব শুভকরি।
(৬) বিবিধার্থ সংগ্রহ।
(৭) তত্ত্ববোধিনী।
(৮) বিদ্যাকল্পদ্রুম।
(৯) মাসিক-পত্রিকা।

প্রধাবিত হইল—মুমূর্ষু প্রায় বঙ্গভূমি যেন নবজীবন পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাঙ্গালী আরও একটী শিক্ষা পাইল। সে বুঝিল যে, মাতৃভাষার উন্নতি সংঘটিত না হইলে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান নাই। তখন ইংরাজি শিক্ষিত কয়েকজন বাঙ্গালী মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে যত্নবান্ হইলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কেহ কেহ বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। শিক্ষিত সমাজ চমকিত হইল। কেহ দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন; কেহ বা কি উপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তদ্‌বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন। স্রোত ফিরিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তখন বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। কিন্তু সকলে নয়।

তখন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আসর জাঁকাইয়া বসিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিতেছেন। বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুচির স্রোতও ফিরিয়াছিল। ভারতচন্দ্র ও তাঁহার অনুকরণকারী-দিগের অশ্লীল কবিতা ফেলিয়া সাধারণে তখন গুপ্ত কবির

হাস্যরসাপ্লুপ্রাণিত কবিতা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। "বাসবদত্তা-"-প্রণেতা ছাড়া বড় একটা আর কেহ আদিরসের অনুরাগী হইলেন না।

গুপ্ত-কবি পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর হইতে "খাঁটি বাঙ্গালী কথায় বাঙ্গালীর মনের ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" এটা বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালার কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই।" * *

গুপ্ত-কবির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন যুগের প্রভাবও অন্তর্হিত হইল। * আরও যে দুইব্যক্তি গদ্য † ও ও পাঁচালী ‡ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও পুরাতন যুগের চিহ্ন লইয়া গুপ্ত কবির সঙ্গে মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের চিতাধূমে গগন সমাচ্ছন্ন হইতে

---

* ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু।

† মদনমোহন তর্কালঙ্কার—মৃত্যু ১৮৫৮ খৃঃ।

‡ দাশরথি রায়—মৃত্যু ১৮৫৭ খৃঃ।

না হইতে দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সাহিত্যাকাশে সমুদিত হইল। "তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য" ও "নীলদর্পন" ১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইল। সকলে স্পষ্ট বুঝিল, নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। পর বৎসর মহাকাব্য "মেঘনাদবধ" প্রকাশিত হইল। প্যারীচাঁদ মিত্র তখন "আলালের ঘরের দুলাল" লিখিয়া "অভেদী" নামক উপন্যাস লিখিবার আয়োজন করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত, ইংরেজি, হিন্দি সাহিত্য হইতে রত্নরাশি আহরণ করিয়া ঘরে আনিতেছেন—অক্ষয় কুমার দত্ত 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে' তন্ময়। চারিদিকে তখন বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য কেমন একটা যত্ন পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের ভুল ভাঙ্গে নাই, তিনি ইংরেজী ভাষায় গল্প লিখিয়া যাইতেছেন। কিশোরীমোহন মিত্রের "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" নামক পত্রে 'Rajmohan's wife' ইতি শীর্ষক গল্প লিখিয়া যাইতেছেন। গল্প শেষ হইবার পূর্ব্বেই সহসা তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। তিনি বুঝিলেন, পৃথিবীময় কোনও প্রসিদ্ধ লেখক মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই—

কোনও সাহিত্যিকের প্রতিভা বিদেশীয় ভাষায় বিকাশ-প্রাপ্ত হয় নাই—কোন আদর্শ গ্রন্থ পরকীয় ভাষায় অদ্যাবধি রচিত হয় নাই। তিনি আরও বুঝিয়া দেখিলেন, পৃথিবীতে ধর্ম্ম, সমাজ বা সাহিত্য-সংস্কার মাতৃভাষা ভিন্ন পরকীয় ভাষায় অদ্যাবধি সংঘটিত হয় নাই। শাক্যসিংহ বা চৈতন্যদেব, মহম্মদ বা ঈশা, লুথার বা ওয়েস্‌লি জনসাধারণের ভাষায়, মাতৃভাষায় ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভেই আপনার ভ্রম দেখিতে পাইলেন ; এবং তখন মধুসূদনের ন্যায় অনুতপ্ত-হৃদয়ে মাতৃভাষার সেবায় আপনার সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত করিলেন। তিনিও হয়ত মধুসূদন দত্তের ন্যায় ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসনিচয় যখন একে একে প্রকাশ হইতে লাগিল, তখন শিক্ষিত সমাজ কিরূপে তাহা গ্রহণ

করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবু অল্প কথায় অতি সুন্দরভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

"যখন স্কুল কলেজে পড়িতাম, তখন * * * বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বড়ই অনাদর ছিল। কেবল যে বড় বড় ইংরাজিওয়ালারা উহার অবজ্ঞা করিতেন তাহা নহে; যাহাদিগকে উহাতে পরীক্ষা দিতে হইত, তাহারও অবজ্ঞা করিত। * * * বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যখন এইরূপ আদর, তখন বঙ্কিম বাবুর নাম প্রথম শুনি। শুনি যে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী ধরণের একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা আমি কখনই ঘৃণা করি নাই, তথাপি ঐ কথা শুনিয়া একবার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি! এত ইংরাজী পড়িয়া বাঙ্গালায় বই লেখা কেন! কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কিছু আমি ভাবি নাই। মনে বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব উদয় হয় নাই। ক্রমে শুনিলাম তিনি ঐ রকম আর এক খানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবার কিন্তু প্রথমবারের মত মনে বিস্ময়ের ভাব একেবারেই জন্মে নাই। বরং বাঙ্গালা ভাষার উপর আস্থা

পড়িয়াছিল। দিন কতক পরে শুনিলাম, বঙ্কিমবাবু আরও একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। অনেকের মুখে তাঁহার পুস্তকগুলির প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। কাহারও কাহারও মুখে নিন্দাও শুনিলাম। আরও শুনিলাম, কেহ কেহ দুই চারিটা ভাষার ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণান্ত করিতেছেন এবং বঙ্কিম বাবুর বিষম নিন্দা রটনা করিতেছেন। * * তখন দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ও কপালকুণ্ডলা কিনিয়া পড়িলাম। তিনখানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে বিপ্লব সৃষ্টি করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। তাঁহার বঙ্গদর্শনের গ্রাহক হইলাম। বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হয়। কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হইলে পর আমাদের দেশের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বঙ্গদর্শনের প্রসঙ্গে অতিশয় ক্রোধ, বিরক্তি ও অবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে আমার কাছে বলিয়াছিলেন, 'ঐ আবার কুন্দনন্দিনী একটা কি বাহির হইতেছে'।" *

তিন যুগের কথাই একে একে বিবৃত হইল। প্রথম

* প্রদীপ—১৩০৫।

রামমোহন রায়ের যুগ, দ্বিতীয় বিদ্যাসাগরের যুগ, তৃতীয় বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। এটা মোটামুটী কথা। আরও সূক্ষ্ম-ভাবে বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, রামমোহন-যুগের প্রারম্ভকাল হইতে বিদ্যাসাগর-যুগের মধ্যকাল পর্য্যন্ত অনুবাদের যুগ; বিদ্যাসাগর-যুগের শেষাংশ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র-যুগের মধ্যকাল পর্য্যন্ত অনুকরণের যুগ; বঙ্কিমচন্দ্র-যুগের শেষাংশ সৃষ্টির যুগ। অনুবাদ-যুগের স্মৃতি-চিহ্ন, চরিতাবলী ও বেতালপঞ্চবিংশতি; অনুকরণ-যুগের দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা; সৃষ্টিযুগের আনন্দ-মঠ ও সীতারাম। উদাহরণ অধিক না দিয়া ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র এই সৃষ্টি-যুগের প্রবর্ত্তক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট্।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক শিষ্যও ছিলেন। বাবু জ্ঞানেন্দ্র লাল রায় এতদ্‌সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম ;—

"সঞ্জীবচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, অক্ষয়চন্দ্র, রবীন্দ্র, যোগেন্দ্র, রমেশ—বঙ্কিমচন্দ্র-প্রতিভার প্রভা। সঞ্জীব বাবু, বঙ্কিম-রবি-প্রতিফলিত চন্দ্রালোক। চন্দ্রনাথবাবুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব,' বঙ্কিমবাবুর উত্তরচরিত সমালোচনার উদ্বো-

ধিত। তাঁহার হিন্দুত্ব ব্রাহ্মণ বঙ্কিমের ব্রাহ্মণত্বে জীবিত। চন্দ্রশেখর বাবুর উদ্ভ্রান্তপ্রেম, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্ত-দপ্তরের একখানি মাত্র কাগজ পরিবর্দ্ধিত; কমলাকান্তের নানাবিধ সুরের মধ্যে একটী সুরমাত্র গীতিপুঞ্জে দীর্ঘীকৃত, কলকণ্ঠে মধুরনাদিত। অক্ষয় বাবু "বঙ্গদর্শনে," "নবজীবনে", "সাধারণীতে" বঙ্কিম বাবুর মেধাবী শিষ্য। রবীন্দ্র বাবু বঙ্কিম বাবুর সহজ চলিত ভাষা আরও সহজ করিয়া, লিখিত ভাষায় কথিত ভাষার আরও সমাবেশ করিয়া, বঙ্কিম বাবুর কবিত্বময় গদ্য আরও কবিত্বময় করিয়া, সুন্দরে সুন্দর মিশ্রিত করিয়াছেন। রমেশ বাবুর 'বঙ্গবিজেতা' বঙ্কিম বাবুর উৎসাহে লিখিত। যোগেন্দ্র বাবুর আর্য্যদর্শন বঙ্গদর্শনের অনুযাত্রী। আমাদিগের দেশের আরও অনেক সুলেখক আছেন, তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করিবেন যে, বঙ্কিম তাঁহাদিগের সাহিত্য জীবনের প্রবৃত্তি বা জন্মদাতা, তাঁহাদিগের রচনাতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি।"

দেখিতে পাইতেছি আজ নয়, বিগত চল্লিশ বৎসর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকীয় প্রভাব বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছি; চল্লিশ বৎসরের বঙ্গসাহিত্যাকাশে

বঙ্কিমচন্দ্র .ছাড়া আর কাহারও ছায়া নাই, আর কাহারও পদাঙ্ক নাই, আর কাহারও প্রভাব নাই। অনুবাদ ও অনুকরণ যুগের গদ্য-সাহিত্যিক-রথীদের জ্যোতি ম্লান হইয়া গিয়াছে, প্রভাব অন্তর্হিত হইয়াছে, আদর্শ অনাদৃত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র একণে একমাত্র জ্যোতি, একমাত্র আদর্শ, সাহিত্যাকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"ভাবসম্পদকে আমরা এখনও যথার্থ সম্পদরূপে গণ্য করিতে শিখি নাই। সাহিত্য-রস যে আমাদের জীবনের খাদ্য পানীয়ের ন্যায় অত্যাবশ্যক তাহা এখনও আমরা সম্যক অনুভব করি না। বঙ্কিম বাবুর সৃজনী শক্তি মাতৃভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনের মজ্জার মধ্যে যে প্রবেশ করিয়াছে, বঙ্কিমের প্রতিভা-উৎসের ভাবপ্রস্রবণ হইতে বাঙ্গালী যে নূতন জীবন-রস প্রাপ্ত হইয়াছে, বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল বঙ্কিমের আবির্ভাবের পরে বাঙ্গালীর জীবনের গঠন যে তদপেক্ষা এক নূতন বৈচিত্র্যের সঞ্চার হইয়াছে তাহা এখনও আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

"সৌভাগ্যক্রমে আমরা বাল্যকালে বাঙ্গলাভাষার

বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। স্বল্প ইংরাজি যাহা শিখি তাহার মধ্য হইতে হৃদয়ের পোষণযোগ্য তৃপ্তিজনক কোন রস আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। অথচ তৃষ্ণা যথেষ্ট ছিল। কৃত্তিবাস, কাশিরাম দাস, একত্র বাঁধানো বিবিধার্থ সংগ্রহ, আরব্য-উপন্যাস, পারস্য-উপন্যাস, বাঙ্গলা রবিন্‌সন্ ক্রুশো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবনচরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের গ্রন্থগুলি বিস্তর পাঠ করিয়াছিলাম। তখন বাঙ্গলা গ্রন্থের সংখ্যা অল্প ছিল, এবং বালকদিগের পাঠের অযোগ্য গ্রন্থও অনেক বাহির হইত। এবং আমরা অপরিতৃপ্ত আগ্রহের সহিত ভালমন্দ সকল গ্রন্থই নির্ব্বিচারে পাঠ করিতাম। তরুণ হৃদয়ের সেই স্বাভাবিক ক্ষুধা উদ্রেকের সময় বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তখন যে নূতন আস্বাদ, নূতন আনন্দ, নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলাম তাহা কোনও কালে ভুলিতে পারিব না।

"তখনকার বয়স্ক লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে কিরূপভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ

মনে নাই। যে টুকু মনে পড়ে তাহাতে বোধ হয় বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। * * *

"আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্য-ভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

"কিন্তু আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, * * * তখন বঙ্গসাহিত্যেরও যেরূপ প্রাতঃ সন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদেরও হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।" *

আর একস্থানে লিখিয়াছেন;—

"একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজসুরে ধর্ম্ম

* সাধনা।

সঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহা বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কালাবতী রাগিনী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।" *

আর এক স্থানে রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালীর যে কি মহৎ, কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয়, তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।" *

ভরসা আছে, সে দুর্ভাগ্য আজও আমাদের উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যতটা ঋণী, এতটা আর কাঁহারও নিকট নহে। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান সর্ব্বোচ্চ।

---

* সাধনা।

বঙ্গদর্শন।

—*—

১২৭৭ সাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে ১২৭৮ সালের শেষ-ভাগে সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লইয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। বিজ্ঞাপনে কয়েক জন লেখকের নাম ছিল ; যথা,—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র।
„ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ জগদীশনাথ রায়।
„ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
„ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।
„ রামদাস সেন।
এবং „ অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। ছাপা হইতে লাগিল, ভবানীপুরের

সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে। প্রকাশক হইলেন, খৃষ্টান ব্রজমাধব বসু।

প্রথম সংখ্যা এক সহস্র ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে আটটি প্রবন্ধ ছিল, যথা,—

(১) পত্র-সূচনা।

(২) ভারত-কলঙ্ক।

(৩) কামিনী কুসুম।

(৪) বিষবৃক্ষ।

(৫) আমরা বড় লোক।

(৬) সঙ্গীত।

(৭) ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল।

এই আটটি প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চারিটি লিখিলেন। পত্রসূচনাটি অতি সুন্দর, নিম্নে প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদের রচনা-পাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহা-

দের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কৌশলশূন্য, নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহা-দের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল জবাব কেন দিব?

"ইংরাজি-ভক্তদিগের এইরূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যা-ভিমানীদিগের 'ভাষায়' যেরূপ শ্রদ্ধা তদ্বিষয়ে লিপি-বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা 'বিষয়ী লোক' তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহিপড়া আর নিমন্ত্রণ রাখিবার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ

পৌরকন্যা, এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছে আদর পায়। কদাচিৎ দুই এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।"

"লেখা পড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যা-লোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্‌-চার, এড্রেস, প্রোসিডিংস্, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতে হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্রলেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অপৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

* * *

"এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক

পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন, এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলক্ষ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিমাণ ঐ অলক্ষ্য নিয়মের অধীন। কাল-স্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কাল-স্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদস্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে, অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।"

চারি বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি শেষ সংখ্যায় শেষ পাতায় লিখিলেন ;—

"চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্র-সূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত ছিল।

যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

"এ সম্বাদে কেহ সন্তুষ্ট কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন যে, বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে, যখন আমি বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন আমি এমত সঙ্কল্প করি নাই যে, যতদিন বাঁচিব, আমি এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব।

"বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া যাঁহারা আনন্দিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না, এমত অঙ্গীকার করিতেছি না।

"চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।"

প্রথম বৎসর বঙ্গদর্শন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

হয়; তা'র পর ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শন আফিস কাঁটালপাড়ায় উঠিয়া যায় এবং তথা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে।

১২৮২ সাল পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন পরিচালিত হয়। ১২৮৪ সাল হইতে সঞ্জীব-চন্দ্র উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ১২৯০ সালের মাঘ মাসে বঙ্গদর্শন উঠিয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা নীচে দিলাম।

(১) বিষবৃক্ষ—১২৭৯ সালের বৈশাখে আরম্ভ হইয়া ঐ সালের চৈত্রে শেষ হয়।

(২) ইন্দিরা—১২৭৯ সালের চৈত্র।

(৩) যুগলাঙ্গুরীয়—১২৮০ সালের বৈশাখ।

(৪) চন্দ্রশেখর—১২৮০ সালের আশ্বিনে আরম্ভ হইয়া ১২৮১ সালের ভাদ্রে শেষ হয়।

(৫) কমলাকান্ত—১২৮০ সালের ভাদ্রে আরম্ভ হইয়া ১২৮২ সালের বৈশাখে শেষ হয়।

(৬) রজনী—১২৮১ সালের আশ্বিনে আরম্ভ হইয়া ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণে শেষ হয়।

(৭) রাধারাণী—১২৮২ সালের কার্ত্তিক ও অগ্র-হায়ণ।

(৮) কৃষ্ণকান্তের উইল—১২৮২ সালের পৌষে আরম্ভ হইয়া ১২৮৪ সালের মাঘে শেষ হয়।

(৯) কমলাকান্তের পত্র—১২৮৪ সালের পৌষ, ফাল্গুন ও ১২৮৫ সালের শ্রাবণ।

(১০) রাজসিংহ—১২৮৪ সালের চৈত্রে আরম্ভ হয়। বঙ্গদর্শনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই।

(১১) মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত—১২৮৮ সালের আশ্বিন।

(১২) আনন্দমঠ—১২৮৭ সালের চৈত্রে আরম্ভ হইয়া ১২৮৮ সালে শেষ।

(১৩) দেবী চৌধুরাণী—১২৮৯ সালের পৌষে আরম্ভ হইয়া ১২৯০ সালের মাঘ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে; বঙ্গদর্শনে আর সম্পূর্ণ হয় নাই।

১২৭৯ সালের বৈশাখে বঙ্গদর্শনের গ্রাহক প্রায় এক হাজার হইয়াছিল। শ্রাবণে বাড়িয়া প্রায় দেড় হাজার হয়। ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া প্রায়

দুই হাজার গ্রাহক হয়। ১২৮২ সালের মাঘ মাসে গ্রাহক-সংখ্যা কমিয়া কিঞ্চিদধিক ষোল শত হয়।

বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইবার দুইটি কারণ দেখা যায়। একটি, আত্মীয়-বিরোধ। দ্বিতীয়টী, প্রবন্ধ-লেখকদের দক্ষিণার দাবী। যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধের মূল্যস্বরূপ অর্থ প্রার্থনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ কিনিতে অসম্মত হইয়া কাগজ তুলিয়া দিলেন।

বঙ্গদর্শন যে সময় প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ১২৮০ সালের কিছু পূর্ব্বে বা পরে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রগুলি বর্ত্তমান ছিল :—

আর্য্যদর্শন, বান্ধব, অবকাশ-সহচরী, বাঙ্গালী, হিতোবোধ, সরোজিনী, মিত্রপ্রকাশ, সাহিত্যমুকুর, পূর্ণশশী, অবলাবান্ধব, কুমুদিনী, আর্য্যপ্রবর, বামাবোধিনীপত্রিকা, ভ্রমর, বসন্তক, হালিসহর-পত্রিকা, বঙ্গমিহির, হেমলতা, কাঁচড়াপাড়া প্রকাশিকা, হিন্দুবিলাস, হিন্দুদর্শন, বিশ্বদর্শন, মাসিকপ্রকাশিকা, তমলুক-পত্রিকা, রহস্যসন্দর্ভ, সহোদর, ইত্যাদি।

এতগুলি কাগজের মধ্যে সুধু বামাবোধিনী পত্রিকা আজও জীবিত আছে।

বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে মনস্বী গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী. মহাশয় লিখিয়াছিলেন ঃ—

বঙ্গদর্শনে "প্রকাশ্যভাবে গ্রন্থাদির যে সমালোচনা হইত, তাহাতে প্রশংসার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। আর যাহারা অনুপযুক্ত তাহারা বাধ্য হইয়া আপনাদিগের দাম্ভিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক' উপযুক্ত পথগ্রহণে প্রবৃত্ত হইত। আমার বোধ হয় এই দুইখানি পত্রিকা, বিশেষতঃ বঙ্গদর্শন, যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল ও যে শক্তি প্রয়োগ করিত, তাহা পূর্ব্বকালের রাজশক্তিরই বুঝি অনুরূপ ছিল। সকলেই বঙ্গদর্শন-সম্পাদককে রাজার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত, ভয় করিত, সম্মান করিত, তিনি যে গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিতেন, রাশি রাশি পাঠক তাহা অবিলম্বে ক্রয় করিয়া আগ্রহের সহিত পাঠ করিত এবং গ্রন্থকারকে পরোক্ষভাবে প্রোৎসাহিত করিত। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক যে গ্রন্থের নিন্দা করিতেন, সে গ্রন্থ বড় কেহ কিনিত না। পুস্তক বিক্রেতার দোকানে তাহা কীটদষ্ট হইয়া জগৎ

হইতে বিলুপ্ত হইত। বড় সহজ কি এই শক্তি? কিন্তু একদিন বঙ্গদর্শন তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্বকীয় বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান গবেষণা প্রভাবে, সর্ব্বোপরি পক্ষপাতশূন্যতা ও সাহিত্যের উন্নতির ঐকান্তিকী কামনাবশতঃ বঙ্গদর্শন একদিন সাহিত্য জগতে এইরূপই রাজার ন্যায় ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিল।" *

বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ—স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অতি অল্প কথায় সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। আমি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বঙ্গদর্শন পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে কহিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম, ভাষার বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ, মানুষের অভাব। বঙ্গদর্শন বলিয়া গিয়াছিল, বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।" †

* নব্যভারত, পঞ্চদশ খণ্ড।

† প্রদীপ,—১৩০৫।

পুস্তকাবলী।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থনিচয়ের নাম সকলেই জানেন; কিন্তু কোন্ কোন্ গ্রন্থ কোন্ কোন্ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন না। আমি নিম্নে একটি তালিকা দিলাম। তাহাতে কোন কোন্ সংস্করণ কোন্ কোন্ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও লিপিবদ্ধ করিতে যত্নবান্ হইলাম। কিন্তু আমার সহস্র চেষ্টা সত্বেও তালিকা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। সকল সংস্করণের তারিখ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। পুরাতন পুস্তকও কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে একে একে পরিচয় দিলাম।

---

(১) দুর্গেশনন্দিনী।

প্রথম সংস্করণ—১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ।

তৃতীয় সংস্করণ—৩রা মে ১৮৬৯।

পঞ্চম সংস্করণ—১৫ই জুলাই ১৮৭৪।

ষষ্ঠ সংস্করণ—১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬—ছাপা হইল, দুই সহস্র।

সপ্তম সংস্করণ—১লা অক্টোবর ১৮৭৯—ছাপা হইল, পনর শত।

নবম সংস্করণ—১০ই জুন ১৮৮৩।

একাদশ সংস্করণ—১৫ই মার্চ্চ ১৮৮৮।

---

(২) কপালকুণ্ডলা।

প্রথম সংস্করণ		১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ।
দ্বিতীয়	ঐ	১৫ই এপ্রেল ১৮৭০।
তৃতীয়	ঐ	১৫ই আগষ্ট ১৮৭৪।
চতুর্থ	ঐ	১০ই মে ১৮৭৮।
পঞ্চম	ঐ	২৮এ জুন ১৮৮১।
সপ্তম	ঐ	২৫এ ডিসেম্বর ১৮৮৮।

---

(৩) মৃণালিনী।

প্রথম সংস্করণ		১০ই নবেম্বর ১৮৬৯।
তৃতীয়	ঐ	২২এ নবেম্বর ১৮৭৪।

চতুর্থ		২০এ জুন ১৮৭৮।
পঞ্চম	ঐ	২৮এ জুলাই ১৮৮০।

ছাপা হইল, পাঁচ শত।

ষষ্ঠ	ঐ	১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১।
সপ্তম	ঐ	২৯এ অগষ্ট ১৮৮৩।

---

(৪) বিষবৃক্ষ।

প্রথম সংস্করণ		১লা জুন ১৮৭৩।
দ্বিতীয়	ঐ	২৯এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫।
তৃতীয়	ঐ	জুন ১৮৮০।
চতুর্থ	ঐ	১২৮৮ বঙ্গাব্দ।
ষষ্ঠ	ঐ	৪ঠা এপ্রেল ১৮৮৭।
সপ্তম	ঐ	২৫এ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০।

---

(৫) লোকরহস্য।

প্রথম সংস্করণ	২৬এ নবেম্বর ১৮৭৪।

---

(৬) বিজ্ঞানরহস্য।

প্রথম সংস্করণ ১৯এ এপ্রেল ১৮৭৫।

—

(৭) ইন্দিরা।

প্রথম সংস্করণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।

চতুর্থ ঐ ৬ই জুন ১৮৮৬।

পঞ্চম ঐ ৩০এ জুলাই ১৮৯৩।

[বর্ত্তমান আকারে পরিবর্দ্ধিত]

---

(৮) যুগলাঙ্গুরীয়।

প্রথম সংস্করণ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।

চতুর্থ ঐ ২৫এ জুন ১৮৮৬।

পঞ্চম ঐ ২৬এ মে ১৮৯৩।

---

(৯) রাধারাণী।

প্রথম সংস্করণ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

তৃতীয় সংস্করণ ১৫ই জুন ১৮৮৬।
চতুর্থ ২৬এ মে ১৮৯৩।

(১০) চন্দ্রশেখর।

প্রথম সংস্করণ ১লা জুন ১৮৭৫।
দ্বিতীয় ঐ ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪।

(১১) কমলাকান্তের দপ্তর।

প্রথম সংস্করণ—২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬—ছাপা হইল, দুই হাজার।

[কমলাকান্ত নাম দিয়া একটা পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়।]

দ্বিতীয় সংস্করণ ২৭এ জুলাই ১৮৯১।

[ঢেঁকি নামধেয় একটা নূতন প্রবন্ধ ইহাতে সংযোজিত হয়।]

(১২) বিবিধ সমালোচন।

প্রথম সংস্করণ ১৯এ জুলাই ১৮৭৬। ছাপা হইল, পাঁচ শত।

(১৩) রজনী

প্রথম সংস্করণ ২রা জুন ১৮৭৭।

দ্বিতীয় সংস্করণ ২৬এ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১।

---

(১৪) উপকথা।

(অর্থাৎ ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী)।

প্রথম সংস্করণ ২৪এ নবেম্বর ১৮৭৭।

দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ১৮৮১।

[রেজিষ্টারির তারিখ ১৯এ জানুয়ারি ১৮৮২]

---

১৫) কবিতা-পুস্তক।

প্রথম সংস্করণ ৮ই অগষ্ট ১৮৭৮।

দ্বিতীয় ঐ ১লা অক্টোবর ১৮৯১।

[নামান্তরিত হইয়া 'গদ্য পদ্য বা কবিতা-পুস্তক' হইল]

ছাপা হইল, পাঁচ শত।

---

(১৬) কৃষ্ণকান্তের উইল।

প্রথম সংস্করণ	২৯এ অগষ্ট ১৮৭৮।
দ্বিতীয় ঐ	১৮৮২।
চতুর্থ ঐ	৩০এ নবেম্বর ১৮৯২।

---

(১৭) প্রবন্ধ-পুস্তক।

প্রথম সংস্করণ	২৭এ এপ্রেল ১৮৭৯।

[১১টি প্রবন্ধ]—ছাপা হইল, পাঁচ শত।

---

(১৮) রাজসিংহ।

প্রথম সংস্করণ	৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৮২।
চতুর্থ ঐ	১০ই অগষ্ট ১৮৯৩।

[বর্ত্তমান আকারে পরিবর্দ্ধিত]

---

(১৯) আনন্দমঠ।

প্রথম সংস্করণ	১৫ই ডিসেম্বর ১৮৮২।
দ্বিতীয় সংস্করণ	২০এ জুলাই ১৮৮৩।

তৃতীয় ঐ ১৫ই এপ্রেল ১৮৮৬।

চতুর্থ ঐ ২০এ ডিসেম্বর ১৮৮৬।

ছাপা হইল দুই সহস্র।

পঞ্চম ঐ ২১এ নবেম্বর ১৮৯২।

---

(২০) দেবী চৌধুরাণী।

প্রথম সংস্করণ ২০এ মে ১৮৮৪।

চতুর্থ ঐ ২৬এ জানুয়ারি ১৮৮৭।

[এই সংস্করণটা তৃতীয় কি চতুর্থ, তাহা ঠিক বলিতে পারি না।]

পঞ্চম সংস্করণ ২৫এ ডিসেম্বর ১৮৮৮।

---

(২১) মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।

প্রথম সংস্করণ ১৮৮৪।

---

(২২) কৃষ্ণচরিত্র।

প্রথম সংস্করণ ১২ই অগষ্ট ১৮৮৬।

দ্বিতীয় ঐ ১১ই অগষ্ট ১৮৯২।

---

(২৩) সীতারাম।

প্রথম সংস্করণ ৪ঠা মার্চ্চ ১৮৮৭।

দ্বিতীয় ঐ ৩১এ ডিসেম্বর ১৮৮৮।

---

(২৪) বিবিধ প্রবন্ধ।

প্রথম সংস্করণ ৭ই জুলাই ১৮৮৭।

দ্বিতীয় ঐ ২৫এ মে ১৮৯২—ছাপা হইল পাঁচ শত।

---

(২৫) ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রথম সংস্করণ ১৭ই মে ১৮৮৮।

ছাপা হইল দুই সহস্র।

---

(২৬) Bengali Selections—

[for the Entrance Examination, 1895.]

প্রথম সংস্করণ ১৭ই জানুয়ারি ১৮৯২।

ছাপা হইল পঁচিশ শত।

---

(২৭) সঞ্জীবনী-সুধা।

প্রথম সংস্করণ ৩১এ মে ১৮৯৩।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর উপরি-উক্ত পুস্তকাদির যে সকল সংস্করণ হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া বিবেচনা করিলাম না।

যে সকল স্থলে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করি নাই, সে সকল স্থলে এক সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অনুদিত পুস্তকের তালিকা।

(১) কপালকুণ্ডলা—এইচ, এ, ডি, ফিলিপস্ কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অনুদিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসার ক্লেম কর্ত্তৃক জর্ম্মণ ভাষায় অনূদিত হয়।

(২) বিষবৃক্ষ—Poison Tree নাম দিয়া শ্রীমতী মিরিয়ম নাইট ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

(৩) কৃষ্ণকান্তের উইল—উপরি-উক্ত মহিলা কর্ত্তৃক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়।

(৪) দুর্গেশনন্দিনী—বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

(৫) যুগলাঙ্গুরীয়—স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়। [রাখাল বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা]

(৬) চন্দ্রশেখর—সন্তোষের জমীদার সুপণ্ডিত বাবু মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ও হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এম, এ, বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়।

(৭) আনন্দমঠ—বাবু নরেশ চন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়।

এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দুইখানি পুস্তকের ইংরাজি

অনুবাদ করিয়াছিলেন। একখানি বিষবৃক্ষের অংশ বিশেষ, অপর খানি দেবীচৌধুরাণী। প্রথমখানি লাট-মহিষীকে দিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয়খানি নাকি অপহৃত হইয়াছে। একখানি পুস্তকাকারে বাঁধান খাতায় বঙ্কিমচন্দ্র অতি যত্নের সহিত অনুবাদটি স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। যে খাতায় তিনি খসড়া করিয়াছিলেন, সে খাতা আজও আছে। কিন্তু ভাল খাতাখানি খোয়া গিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র—বিশ্লেষণ।

বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হয়; যথা—

সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্র;

কবি বঙ্কিমচন্দ্র;

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র;

ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্র;

স্বদেশ-ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র;

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র ; এবং

ধর্ম্মোপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।

আমি অতি সংক্ষেপে সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়া যাইব।

সমাজ-সংস্কারক।

সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উদ্যম—বিষ-বৃক্ষ ; দ্বিতীয় উদ্যম—সাম্য ও লোকরহস্য ; তৃতীয় উদ্যম—দেবী চৌধুরাণীর কিয়দংশ ও কমলাকান্তের কয়েকটী প্রবন্ধ।

সকল উদ্যমই ব্যর্থ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়,—বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের বিশেষ কোনও উপকার করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, বহু-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, সকল বিষয়েই তিনি কিছু না কিছু বলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু কোনও বিষয়েই তাঁহার হৃদয় পূর্ণভাবে ছিল না। তিনি সমাজকে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সমাজের জন্য কখনও চোখের জল ফেলেন নাই। ফেলিলেও যে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, এমন বোধ হয় না। অচল ভূধর তুল্য হিন্দুসমাজকে

কেহ যে একদিনে নড়াইতে পারিবেন, এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্দ্ধ-শতাব্দীব্যাপী রোদনেও দেশে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত হইল না। তবে মহাপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা একদিন না একদিন ফল প্রদান করিবে।

সমাজ-সংস্কারক ও ভাবময় বঙ্কিম।

সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ভাবময় বঙ্কিম-চন্দ্রের দুই এক স্থানে সঙ্ঘর্ষণ ঘটিয়াছে। বিষবৃক্ষ হইতে তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

সূর্য্যমুখী আদর্শ হিন্দু-স্ত্রী অথবা Westernised রমণী কি না, তাহা জানিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা সুধু দেখিব, সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভালবাসে কি না—সে নগেন্দ্রের ভালবাসার সম্পূর্ণ যোগ্য কি না। দেখিলাম, সূর্য্যমুখী প্রেমময়ী। সে প্রেমে একটু আধটু স্বার্থ থাকিতে পারে, কিন্তু সে প্রেম অনন্ত—সে প্রেম গভীর। সূর্য্যমুখীর রূপ আছে, গুণ আছে, প্রেম আছে,—সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের ভালবাসার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রী।

এমন সময় কুন্দনন্দিনী তাহার অতুলনীয় রূপ-রাশি লইয়া নগেন্দ্রনাথের সংসারে আসিল। সূর্য্যমুখীর চেয়েও কুন্দ সুন্দরী ; কেন না, সূর্য্যমুখীর বয়স ছাব্বিশ, কুন্দর বয়স তের। নগেন্দ্রের মতে তের বৎসরই স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের সময়। রূপ-প্রিয় কামান্ধ নগেন্দ্রনাথ তের বছরের কুন্দকে পাইয়া ছাব্বিশ বছরের সূর্য্যমুখীকে ভুলিলেন।

না ভুলিলে সমাজ-সংস্কারক বিধবা-বিবাহ সংঘটন করিতে পারেন না—না ভুলিলে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ড উদ্যত করিতে পারেন না। নগেন্দ্রনাথ ভুলিলেন—কুন্দর রূপ দেখিয়া সূর্য্যমুখীকে ভুলিলেন।

কুন্দ উপযুক্ত পাত্রীও বটে। যে অবস্থায় বিধবার বিবাহ হইতে পারে, কুন্দতে সে অবস্থা সম্যক্ বর্ত্তমান। বহুবিবাহ যদি কোনও অবস্থায় মার্জ্জনীয় হওয়া সম্ভব হয়, তবে নগেন্দ্রনাথের উন্মত্তাবস্থায় মার্জ্জনীয় হইতে পারে। অবস্থাটি বেশ করিয়া সৃষ্টি করিয়া সংস্কারক পাত্রীকেও বেশ করিয়া সাজাইলেন। তাহাকে রূপ, যৌবন, গুণ, নগেন্দ্রনাথের প্রতি অতুল ভালবাসা দিয়া

মনোমত করিয়া গড়িলেন। অবশেষে বালবিধবার বিবাহ ঘটাইলেন।

বিবাহ দিয়া সংস্কারক একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "দেখ, আমি কেমন বিধবার বিবাহ দিয়াছি। নগেন্দ্র ও কুন্দ কত সুখী! একটা বিধবাকে চির-জীবনের দুঃখ হইতে রক্ষা করিয়া আমি কত পুণ্য সঞ্চয় করিলাম।"

বলিয়াই সংস্কারক সমাজের দিকে রোষকষায়িত লোচনে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু সাবধান! নগেন্দ্র-নাথের মত দুই বিবাহ করিও না। যদি কর, এক স্ত্রীকে বিনাশ করিব।"

"কা'কে বিনাশ করিবে?—কুন্দকে, না সূর্য্য-মুখীকে?"

সংস্কারক উত্তর করিলেন, "সূর্য্যমুখীকে।"

"সূর্য্যমুখীর অপরাধ?"

সংস্কারক বলিলেন, "তার অপরাধ থাকুক, বা না থাকুক, আমি কুন্দকে মারিতে পারিব না। সে বাল-বিধবার আমি সবে বিবাহ দিয়াছি; সূর্য্যমুখীর স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাকে চিরসুখী করিয়া

সমাজকে দেখাইব, বিধবাবিবাহে অধর্ম্ম নাই, অশান্তি নাই।"

ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্র অমনই গর্জ্জিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "সাধ্য কি তোমার, তুমি সূর্য্যমুখীকে মার! সর্ব্বগুণময়ী নিরপরাধা, সূর্য্যমুখীকে যেমন করিয়া পারি, আবার ঘরে আনিব—আবার তাহাকে পাটরাণী করিব। তোমার সমাজ-সংস্কার অতলজলে ডুবিয়া যাক্—আমি সূর্য্যমুখীর নয়ন-কোণে অশ্রুকণা দেখিতে পারিব না।"

সংস্কারক-ব। ছি, ছি! ভাবে বিভোর হইলে চলিবে না। সূর্য্যমুখীকে মার—বিধবা-বিবাহের জয় পরিকীর্ত্তিত হউক—বহুবিবাহের পরিণাম জগত দেখুক;

ভাবময়-ব। যদি কাহাকেও মরিতে হয়, তবে কুন্দ মরুক; ইন্দ্রাণীতুল্যা সূর্য্যমুখীকে—নগেন্দ্রনাথের জীবন-সঙ্গিনী সূর্য্যমুখীকে—কিছুতেই মারিতে দিব না।

সংস্কারক-ব। কুন্দ কিরূপে মরিবে?

ভাবময়-ব। বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করুক।

সংস্কারক-ব। সূর্য্যমুখী কেন আত্মহত্যা করুক না।

ভাবময়-ব। সূর্য্যমুখী বিবাহিতা, ধার্ম্মিকা. সে আত্মহত্যা করিয়া পাপ অর্জ্জন করিতে পারে না।

সংস্কারক-ব। কুন্দই কি আত্মহত্যা করিতে পারে?

ভাবময়-ব। পারে; যে নবযৌবনে বিধবা হইয়া,—হিন্দু রমণীর আজন্মপুষ্ট সংস্কার লইয়া, প্রথম স্বামীর সাহচর্য্য ও অনুরাগ স্বল্পকাল মধ্যে বিস্মৃত হইয়া, ভালবাসার খাতিরে সংযম হারাইয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে, সে আত্মহত্যা করিয়া দ্বিতীয় পাপও অর্জ্জন করিতে পারে।

সংস্কারক-ব। গোড়ায় কি মতলব ছিল, ভুলে গেলে? বিধবাকে গড়িলে বিবাহ দিতে—সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন করিতে, এখন এ কি করিতেছ?

ভাবময়-ব। মতলব, উদ্দেশ্য রসাতলে যাউক, আমি সূর্য্যমুখীর প্রাণে ব্যথা দিতে পারিব না।

আমরা পরিণাম দেখিলাম—ভাবময় বঙ্কিমের কত প্রবল শক্তি তাহাও দেখিলাম। সংস্কারক চিরদিন ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিতে পরাজিত।

কবি বঙ্কিম।

ছন্দ মিলাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র খুব কম কবিতাই লিখিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বাল্যকালে। কিন্তু ছন্দ মিলাইতে পারিলেই যে কবি হয়, এমন কোনও কথা নাই। কবিত্ব,—চিত্র বা চরিত্র-অঙ্কনে,—কবিত্ব, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে। আমরা সেই দর্পণা-স্বরূপ বারুণী পুষ্করিণী চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। 'ভোমরার' সেই কালরূপ—সে অভিমান-ভরা সরলতা—সে গর্ব্ব, সে পতিভক্তি দুইটি কথায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। ভ্রমর লিখিয়াছেন, "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি।" ভ্রমর বলিয়াছে,—"তোমার বিশ্বাসেই আমার বিশ্বাস।" এই খানেই ভ্রমরের চিত্র সম্পূর্ণ হইল।

প্রফুল্ল বলিল, "আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান বৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ-দখল করিব না।"

এই একটি কথায় প্রফুল্লের প্রকৃতি আমরা বুঝিতে পারিলাম।

সমুদ্র-সৈকতে বসিয়া আশ্রয়হীন নবকুমার দেখিলেন, "ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনই ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন; আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল কল্লোলিত সমুদ্র-গর্জ্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুরব।" এই স্বভাবানুকারিণী সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই প্রকৃত কবিত্ব। প্রকৃতির ছায়া নবকুমারের হৃদয়ে—নবকুমারের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব প্রকৃতির বুকে।

'পুষ্প-নাটকে' যূঁই বারিকণার অন্তর্দ্ধানে কাতর হইয়া বলিতেছে, "হায়! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, সুন্দর, সূর্য্যপ্রতিভাত, রসময় জলকণা! এ হৃদয় স্নেহে ভরিয়া আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা? একবার রূপ দেখাইয়া, মিগ্ধ করিয়া, কোথায় মিশিলে, কোথায় শুষিলে প্রাণাধিক? হায়, আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলেম না, কেন তোমার

সঙ্গে মরিলাম না? কেন অনাথ, অস্নিগ্ধ পুষ্প-দেহ লইয়া এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম —"

আকুল বাসনার এ চিত্র কি সুন্দর! যিনি এমন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত কবি।

ঔপন্যাসিক ও ভাবময় বঙ্কিম।

পূর্ব্বে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে মধ্যে কিরূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার দেখান উদ্দেশ্য, ঔপন্যাসিকের সহিত ভাবময় বঙ্কিম-চন্দ্রের কিরূপ সঙ্ঘর্ষণ ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপ-ন্যাসনিচয়ে কোনও plot নাই, বা তাঁহার উপন্যাস Idealistic—Realistic নহে, এসব গুরুতর কথায় আমার কোনও প্রয়োজন নাই। আমি সুধু দ্বন্দ্বটুকু দেখাইব। দ্বন্দ্ব দেখাইতে হইলে পুস্তকবিশেষের সমালোচনা আবশ্যক। যত সংক্ষেপে সারিতে পারি, চেষ্টা করিব।

উপস্থিত আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস

'সীতারামে'র সমালোচনা করিয়া মন্তব্যটুকু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

গ্রন্থখানির প্রথমাংশ পড়িলেই বুঝা যায়, ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য, সীতারামকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট করা। কিন্তু সীতারাম কোন্ অপরাধে রাজ্যভ্রষ্ট হইবে? সে বীর, স্বদেশপ্রেমিক, দেবদ্বিজে ভক্তিমান্, সত্যাশ্রয়ী, পরোপকারী—সে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে পারে না। জগতে কেবল একটি মাত্র পাপ আছে, সে জন্য মনুষ্য রাজ্যভ্রষ্ট, লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইতে পারে। সে পাপটি—রমণীর প্রতি অত্যাচার। ঔপন্যাসিক তাহা বুঝিলেন; বুঝিয়া জয়ন্তীর সৃষ্টি করিলেন।

জয়ন্তী, সীতারামের রূপযৌবনশালিনী অপ্রাপ্যা স্ত্রীর সহচরীরূপে আসিল। সেই স্ত্রী যখন অন্তর্হিতা, তখন সহচরী ধরা পড়িল। উন্মত্ত সীতারাম তাহাকে টানিয়া আনিয়া শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ উন্মত্ততা মার্জ্জনীয়, কিন্তু অমানুষিক দণ্ডবিধান মার্জ্জনীয় নহে। স্ত্রীর জন্য আমি উন্মত্ত হইতে পারি, কিন্তু রমণীর প্রতি অত্যাচার করিতে পারি না।

এ অত্যাচার না হইলে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস

হইতে পারে না ; সুতরাং সীতারামের দ্বারা এ অত্যাচার করাইতেই হইবে। সীতারাম সিংহাসনে বসিয়া জয়ন্তীকে মঞ্চোপরি দাঁড় করাইলেন ; এবং মেঘগম্ভীর কণ্ঠে চণ্ডালকে আদেশ করিলেন, "কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা।"

চৌত্রিশ শত বর্ষ পূর্ব্বে দুর্য্যোধনও এই রকম একটা আদেশ দিয়াছিলেন। বিস্তীর্ণ সভাতলে দাঁড়াইয়া আত্মীয়স্বজন-পরিবৃত দুর্য্যোধন আদেশ করিয়াছিলেন, "যাজ্ঞসেনীকে বিবস্ত্রা কর।" যে মুহূর্ত্তে এই আদেশ-বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে কৌরবরাজ্য-ধ্বংস সূচিত হইয়াছিল।

ব্যাসদেবের আগে মহাকবি বাল্মীকিও দেখাইয়া গিয়াছেন, রমণীর প্রতি অত্যাচার না হইলে রাবণ বিনষ্ট হইতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে রাবণ সীতার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে চিরজাগ্রত সনাতন ধর্ম্ম মেঘমন্দ্ররবে গর্জ্জিয়া বলিল, "রাবণ, এতদিনে তোমার ধ্বংসের সূচনা হইল।"

সেই গর্জ্জন বিশ্বময় আজও ধ্বনিত হইতেছে—সেই সনাতন সত্য আজও জাগ্রত রহিয়াছে। সেই গর্জ্জনের

প্রতিধ্বনি—"সীতারাম।" এই সীতারামই রাবণ, এই সীতারামই দুর্য্যোধন। সীতারাম তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আদেশ করিলেন,—"কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা।"

ঔপন্যাসিক বেশ সাজাইলেন; সীতারামের মুখ দিয়া উপযুক্ত দণ্ডাদেশ বাহির হইল। কথাটা পাছে আমরা না বুঝি, তাই ঔপন্যাসিক আমাদের চোখে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেন,—যে কাজ সীতারামের তুল্য সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত নৃপতি সমাধান করিতে আদেশ করিতেছেন, সে কাজ এক জন নীচজাতীয় চণ্ডাল সম্পন্ন করিতে অসম্মত। উভয়ের কথাগুলি নিম্নে তুলিয়া দিলাম:—

"——তখন চণ্ডাল পুনরপি রাজাজ্ঞা পাইয়া আবার বেত উঠাইয়া লইল—বেত উঁচু করিল—জয়ন্তীর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল; বেত নামাইয়া রাজার পানে চাহিল—আবার জয়ন্তীর পানে চাহিল—শেষ বেত আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'কি!' বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন।

চণ্ডাল বলিল, 'মহারাজ! আমা হইতে হইবে না।'

রাজা বলিলেন, 'তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।'

চণ্ডাল যোড়হাত করিয়া বলিল, 'মহারাজের হুকুমে তা' পারিব ; এ পারিব না।'

ঔপন্যাসিকের অসামান্য কৌশল দেখিলাম। সীতারামকে ধ্বংস করিবার জন্য এত আয়োজন। যে কাজ চণ্ডাল, চণ্ডাল হইয়াও করিতে পারিল না—সে কাজ সীতারাম, হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা হইয়াও করিতে সমুদ্যত। সীতারাম দেখিলেন, কোন হিন্দু জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করিবে না। তখন তিনি এক জন মুসলমান আনিতে আদেশ করিলেন। এখানে ঔপন্যাসিকের কার্য্য অতি চমৎকার ; কোথাও ভুল নাই, ত্রুটী নাই,—সব ঠিক, জয়ন্তীর আর রক্ষা নাই। চন্দ্রচূড় গাল খাইয়া পলাইয়াছেন—চণ্ডাল পলাইয়াছে। এবার নৃশংস কশাই আসিয়া বলিতেছে, "কাপ্‌ড়া উতার।"

জয়ন্তী সীতারামকে বন্য পশু বলিয়া গালি দিল।

সীতারাম আরও ক্রুদ্ধ হইয়া কশাইকে আদেশ করিলেন, "জবরদস্তী কাপড়া উতার লেও।"

উপায়বিহীনা জয়ন্তী তখন জগন্নাথকে ডাকিতে লাগিল। কশাই কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। * ক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী চীৎকার করিয়া বলিল,

"মহারাজ, এই পাপে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—তোমার রাজ্য গেল।"

এ পর্য্যন্ত সব ঠিক—ঔপন্যাসিকের কোন ত্রুটী নাই। তার পর সব গোল হইয়া গেল। কশাইয়ের এক হাতে উদ্যত বেত্রদণ্ড, অপর হস্তে জয়ন্তীর বস্ত্রাঞ্চল। নিরুপায় জয়ন্তী পশুবৎ সীতারামের সম্মুখে মঞ্চোপরি বসিয়া অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। জয়ন্তীর আর নিস্তার নাই। এমন সময় ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্র কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সকাতরে বলিলেন, "এ কি, সন্ন্যাসিনীর উপর—রমণীর উপর অত্যাচার! কোথায় আছ নন্দা?—কোথায় আছ সীতারামের সহধর্ম্মিণী? ছুটে এস—জয়ন্তীকে রক্ষা কর।"

ভাবময় বঙ্কিমের আহ্বানে নন্দা অমনি ছুটিয়া আসিল; ঔপন্যাসিক বঙ্কিম এতকাল ধরিয়া যে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, ভাবময় বঙ্কিম মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা নষ্ট করিয়া দিলেন। ঔপন্যাসিক তবু একটু যুঝিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, "মহারাণি, তোমার ঠাঁই অন্তঃপুরে, এখানে নয়। অন্তঃপুরে যাও।"

ভাবময় বঙ্কিম সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া সীতারামের

প্রতিনিধি কশাইয়ের উপর 'মার' 'মার' শব্দে পড়িলেন। ঔপন্যাসিক আর কি করিবেন? তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন; তার পর ভাবময় বঙ্কিম একটু শান্ত হইলে বলিলেন, "তুমি এ কি করিলে? জয়ন্তীকে রক্ষা করিয়া যে সব নষ্ট করিলে! আমি কেমন করিয়া তবে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস করিব?"

ভাবময়-ব। সংসারে কি জয়ন্তী ছাড়া আর স্ত্রীলোক নাই?

ঔপন্যাসিক-ব। সহস্র সহস্র থাকিতে পারে, কিন্তু সে সব পতঙ্গ মাত্র। মহাকবি বাল্মীকিও তাই ভাবিয়াছিলেন, নতুবা রাবণ-ধ্বংসের নিমিত্ত জনক-নন্দিনীর সৃষ্টি করিতেন না।

ভাবময়-ব। তা' তুমি যা' হয় কর—আমি জয়ন্তীকে ছাড়িয়া দিব না।

নিরুপায় ঔপন্যাসিক তখন ফুটা কলসীর তলায় গালা আঁটিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—সুন্দরী সাধ্বী রমণীবৃন্দকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া সীতারামের চিত্তবিশ্রামে ফেলিতে লাগিলেন। কিন্তু ফুটা কলসীর ছিদ্র বন্ধ হইল না। মহাশক্তিশালী ঔপন্যাসিকও

তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া তিনি গালার উপর এক স্তর মাটী লাগাইলেন, এবং অপহৃত-সতীত্বা ভানুমতী সাজিয় বলিলেন, "মহারাজ! আজ জানিলে বোধ হয় যে সত্যই ধর্ম্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ—ধর্ম্মনাশ করিয়াছ, মনে করিয়াছ কি তার প্রতিফল নাই?"

ফুটা কলসী সারিতে ঔপন্যাসিককে এইরূপে আয়োজন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সারিতে পারেন নাই; "সীতারামের" ঔপন্যাসিকত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমরা যদি সীতারামকে সর্ব্বগুণের আধার দেখিতাম—ক্রোধী ও প্রজাপীড়ক না দেখিতাম—উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র ও পত্নীপীড়ক না দেখিতাম, সুধু একটি পাপে কলঙ্কিত দেখিতাম, তাহা হইলে বুঝিতাম, ঔপন্যাসিকের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। সে একটি পাপ জয়ন্তীর উপর অত্যাচার। যে সর্ব্বগুণের আধার, সে কি রমণীর উপর অত্যাচার করিতে পারে? পারে—স্ত্রীর জন্য পারে। সীতারাম সেই অত্যাচার করুক—সিংহাসনে বসিয়া জয়ন্তীকে বিবসনা করিয়া বেত্রাঘাত

করুক; আমরা তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, সর্ব্বগুণসম্পন্ন সীতারাম কেন রাজ্যভ্রষ্ট হইল।

দশানন ও দুর্য্যোধন প্রজাপীড়ক ছিলেন না—স্ত্রী ধরিয়া আনিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিতেন না। তাঁহারা রাজকীয় গুণসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তবু তাঁহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন কেন? একটি পাপের জন্য।

সীতারাম সে পাপটি করিল না, অথচ রাজ্যভ্রষ্ট হইল। এইখানেই ঔপন্যাসিকত্ব বিনষ্ট হইয়াছে। বিনাশ কে করিল? ভাবময় বঙ্কিম।

স্বদেশ-ভক্ত বঙ্কিম।

একটি কথায় বুঝিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীমাত্রকেই ভালবাসিতেন। কথাটি মূল্যবান্—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?" *

বঙ্কিমচন্দ্র কি স্বদেশকে ভালবাসিতেন? তাঁহার স্বদেশপ্রীতি কি প্রকৃতই আন্তরিক? এ কথার উত্তর "আনন্দমঠে"র ছত্রে ছত্রে লিখিত রহিয়াছে। বিচ্ছেদ-শূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোক-প্রবেশের পথমাত্র-শূন্য, নিবিড়

* সীতারাম।

অন্ধকারময় অরণ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, * "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

বাঙ্গালার অন্ধকারময় অরণ্য, আকাশ প্লাবিত করিয়া উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

"পণ আমার জীবন-সর্ব্বস্ব।"

"জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

"ভক্তি।"

এ ভক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের শিরায় শিরায় প্রবহমান; নতুবা তিনি গায়িতে পারিতেন না,—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে!"

বাঙ্গালার লতাটি পাতাটি পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়। সেই লতা পাতা দিয়া সাজাইয়া তিনি তাঁহার উপাস্য দেবীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন;—

* আনন্দমঠ—উপক্রমণিকা।

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

কিন্তু এ ভক্তি নিষ্কাম নয়। নিষ্কাম ভক্তির কথা কমলাকান্তের মুখেও শুনিলাম না। তবে কোথায় শুনিতে পাইব? নিষ্কাম হইবার দিন বুঝি আজিও আমাদের আসে নাই। তবু কমলাকান্ত যাহা বলিতেছে, তাহা অতি সুন্দর। কমলাকান্ত বলিতেছে, "দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—অনন্ত, অকূল অন্ধকারে, বাত্যা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত— মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল— নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছি! আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই মা আমার? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি

বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণের উদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয় প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা, এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশ দিক্—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব - দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

অতি সুন্দর! ভক্তিতে আপ্লুত না হইলে কেহ এমনটা লিখিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র একবার কর্ম্মবীর-রূপে 'আনন্দমঠে' দেখা দিয়াছিলেন; আর একবার কমলাকান্তরূপে জন্মভূমির চরণে ভক্তি, অশ্রু উপহার দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সে রূপ—সে সত্যানন্দ, সে কমলাকান্ত-রূপ অঙ্কনে আমি অসমর্থ। দেশ কালও তেমন নয়।

"বঙ্গদেশের কৃষক" "বাঙ্গালীর উৎপত্তি," "ভারত কলঙ্ক" প্রভৃতি অত্যুপাদেয় প্রবন্ধনিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিতেছে।

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র।

অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র-তুল্য সমালোচক বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই সমালোচকের আসন এক্ষণে শূন্য হইয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ কত আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন;—

"বঙ্কিম যে দিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন, সে দিন হইতে এ পর্য্যন্ত আর সে আসন

পূর্ণ হইল না। এক্ষণকার অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্য-সিংহাসনে কে আমাদের রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার অভাবে শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই।" *

বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র সমালোচক ছিলেন। কখন কাহারও খাতির রাখিয়া কথা কহিতেন না, এজন্য তাঁহাকে সময় সময় গালি খাইতে হইয়াছে—লোকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছে, তবু তিনি কখন পথভ্রষ্ট হয়েন নাই। কি প্রকারে তাঁহাকে গালি খাইতে হইয়াছিল, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিব।

একখানি নাটক 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনার্থ প্রেরিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে এই নাটকখানির কিছু তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। যিনি নাটক লিখিয়াছিলেন, তিনি স্থির জানিতেন যে, তাঁহার নাটকখানি অত্যুপাদেয় গ্রন্থবিশেষ। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা তাঁহার প্রীতিকর হইল না। যে ব্যক্তি তাঁহার নাটকখানির

---

* সাধনা।

অপ্রশংসা করিয়াছে, তাহাকে গালি দিবার অভিপ্রায়ে তিনি এক আত্মীয়ের শরণাগত হইলেন। এই আত্মীয়ের একখানি কাগজ ছিল। কাগজের নাম—'বসন্তক'। কাগজখানি দেশমধ্যে কিছু প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাহাতে ভাল ভাল ছবি থাকিত। বিলাতের 'পঞ্চ' কাগজ লোককে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া যে রকম কার্টুন (cartoon) দেয়, বসন্তকও সেই প্রকার ছবি দিয়া লোককে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। বসন্তক-সম্পাদক রোরুদ্যমান আত্মীয়ের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া 'বসন্তকে' এক ছবি বাহির করিলেন। সাহিত্যক্ষেত্র নাম দিয়া তিনি একটি ক্ষেত্র আঁকিলেন। সেই ক্ষেত্রে একটি প্রকাণ্ডকায় ষণ্ড ও কয়েকটি ভেক অঙ্কিত হইল। ষাঁড়ের পার্শ্বদেশে লেখা হইল,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আর একটি ক্ষুদ্র ভেকের বক্ষের উপর লিখিত হইল,—"বঙ্গদর্শন।" এইরূপে সমালোচক-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রকে কর্ত্তব্যানুরোধে গালি খাইতে হইয়াছিল।

সূক্ষ্মদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ তাই বুঝি লিখিয়াছিলেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে লেখকসম্প্রদায় তাঁহার

অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

"মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত। এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

"ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই! তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল।"*

"উত্তর চরিত" সমালোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, কিরূপে গ্রন্থ সমালোচনা করিতে হয়। এরূপ সমালোচনা বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় আর কখন লিখিত হয় নাই।

বাবু জ্ঞানেন্দ্র লাল রায় লিখিয়াছেন ;—

---

* সাধনা।

"দেশের ভিতর বঙ্কিম বাবু অদ্বিতীয় সমালোচক ছিলেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার সমালোচনা অনেক সময় অতি তীব্র হইত। কিন্তু তিনি শত্রুতা বা দ্বেষে কখন তাঁহার লেখনীকে বিষপ্রদীপ্ত করেন নাই, এবং মিত্রতাতে কখন অনুচিত প্রশংসা করেন নাই। সাহিত্যের এজলাসে বঙ্গদর্শনের চৌকিতে বসিয়া, তিনি স্বাধীন ও অপক্ষপাতভাবে রায় ফয়শালা লিখিতেন। আবার কেহ তাঁহার নিজের লেখার প্রতিকূল সমালোচনা করিলে তাহাতে তিনি চটিয়া লাল হইতেন না, বরঞ্চ বিশেষ উদারতা দেখাইতেন। প্রায় ৯ বৎসর হইল তিনি 'সুখস্ফূর্ত্তি ও অনুশীলন' বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লেখেন। আমি 'নব্যভারতে' তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম এবং আমার বিবেচনায় তাঁহার যে গুলি ভ্রম, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে আমার নাম প্রকাশ করি নাই, 'মীমাংসা-প্রার্থী' বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার কয়েকদিন পরে আমি বঙ্কিম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি এইবার আমার প্রতি পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক যত্ন ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন।

আমি তাহাতে মনে করিলাম, বঙ্কিম বাবু জানেন না যে, আমি মীমাংসা-প্রার্থী নাম লইয়া তাঁহার প্রবন্ধের নিন্দা করিয়াছি। একটু কথার পর তিনি বলিলেন, "তুমিই কি মীমাংসা-প্রার্থী?" ইহার পূর্ব্বে—'বঙ্গবাসীতে' তাঁহার রচনার কোন কোন ভাবের বিরুদ্ধে আমি তীক্ষ্ণ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেও অভ্রভেদী ভূধর, অটল বঙ্কিম বাবুর স্নেহ ও অনুগ্রহ আমার প্রতি কখনও ন্যূন হয় নাই।" *

ধর্ম্মোপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।

"কৃষ্ণচরিত্র" বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ত্তি। এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে শতবার মনে উদয় হইয়াছে, যিনি জেবউন্নিসার বিলাসমন্দির আঁকিয়াছেন—কমলমণির গালের কালিটুকু শ্রীশচন্দ্রের মুখে লাগাইয়া দিয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া মহাভারত, পুরাণ মন্থন করিয়া এমন গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিলেন?

কিন্তু এই পুস্তক লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছু গালি খাইতে হইয়াছিল। গালি খাইতে হইয়াছিল, দুই শ্রেণীর

* নব্যভারত।

লোকের নিকট হইতে। প্রথম একদল বলিলেন, "আমাদের পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নাস্তিক বঙ্কিম বাবুর হাতে পড়িয়া তোমার আমার মত মানুষ হইল।" আর একদল বলিলেন, "শঠ, বঞ্চক, পারদারিক কৃষ্ণকে বঙ্কিম বাবু আদর্শ পুরুষ বলিলেন কি প্রকারে?" দুই দলই বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বীতরাগ হইলেন।

কিন্তু তাঁহারা যদি একটু তলাইয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ কোনও অপরাধ দেখিতে পাইতেন না। গ্রন্থারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; গ্রন্থমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অপবাদগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহার অপরাধ কি?

অপরাধ একটু আছে। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে একটু বিলাতী (Westernise) করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক হিন্দুদের ইহাতে আপত্তি হইতে পারে। কালীয়-দমন অথবা বস্ত্রহরণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিলে তাঁহাদের মনে ক্রোধ সঞ্জাত হওয়া সম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে আলোচনা করিবার বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের অবসর ছিল না। অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে

যুগানুযায়ী জ্ঞান তাঁহার ভিতরে সে সময় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। দেশ তখন পাশ্চাত্যভাবে এরূপ বিভোর যে, সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়াও বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দু আদর্শের কতকটা নীচে নামিতে হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় দেশবাসীকে আদর্শ আর্য্য জীবনে ফিরাইবার ঐকান্তিক ইচ্ছাই তাঁহাকে এরূপ কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। বৈষ্ণব-সূচিত গোপীতত্ত্ব তিনি যদি সে সময় স্বীকার করিয়া লইতেন, তাহা হইলে তথাকথিত শিক্ষিতসমাজে তাঁহাকে নিশ্চয়ই অপদস্থ হইতে হইত। বঙ্কিমচন্দ্র, ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, তিনি যে তৎকালীন সমাজতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে কারণেই হউক, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ঐ অংশটুকু বিশদভাবে আলোচনা করিতে সাহসী হন নাই—প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণধর্ম্ম সুধু বুঝাইলেই চলিবে না। যাহাতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে, সে জন্যও একটু চেষ্টা করা চাই। সেই উদ্দেশ্যে আমি যদি শ্রীকৃষ্ণকে একটু westernise করি, তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ অপরাধ হয় না।

ধর্ম্মটাকে একটু চিত্তাকর্ষক করিতে না পারিলে সে ধর্ম্ম জনপ্রিয় হইতে পারে না। যিশু খ্রীষ্টও তাই বুঝিয়াছিলেন; তাই তিনি মদ্যমাংসে স্বয়ং অনাসক্ত হইয়াও মদ্যমাংস খাইতে খ্রীষ্টানদিগকে নিষেধ করিয়া যান নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় য়ুরোপীয়েরা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রতি এতটা আস্থাবান্ হইতেন না।

মহম্মদও বুঝিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম চিত্তাকর্ষক নয়, সে ধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারে না। তাই তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তী কামিনীপ্রিয় আরবদিগকে চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি বহু-বিবাহ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে ইসলাম ধর্ম্ম তাৎকালিক আরবদিগের এত চিত্তাকর্ষক হইত না।

শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মকে সেই হিসাবে চিত্তাকর্ষক করিতে হইলে জটিল অংশগুলিকে নিষ্কাশিত করিতে হয়। এই জন্যই সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণতত্বের জটিল অংশগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ বৎসর বয়সের পর শ্রীকৃষ্ণকে আর পূর্ণ প্রেমময় পূর্ণব্রহ্ম-রূপে দেখিতে পাই না। তখন তিনি মথুরার সিংহাসনে

উপবিষ্ট—তখন তিনি আদর্শ মনুষ্যরূপে সংসারধর্ম্মপালন ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি বিশ্ব-শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত রূপ গোপন করিতেন—শ্রীকৃষ্ণকে পরদারনিরত, ক্রুর, প্রবঞ্চক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব কোথায় থাকিত?—মনুষ্যমাত্রেরই অনুকরণীয় আদর্শ পুরুষত্ব কোথায় দাঁড়াইত?

"ধর্ম্মতত্ত্ব" বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় কীর্ত্তি। তৃতীয় কীর্ত্তি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা। কিন্তু তিনি টীকা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য। চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণ হইলে আজ তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"নূতন সৃষ্টি তাঁহার কৃষ্ণচরিত, এবং তাঁহার ধর্ম্ম-তত্ত্বের অনুশীলন তত্ত্ব। ইহা গীতা পাঠের ফল; কিন্তু কয়জন লোক গীতা পাঠ করিয়া অনুশীলন তত্ত্বের এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছেন? তিনি মহা-ভারতের শ্রীকৃষ্ণকে এক নূতন আকারে জগতের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া

অনেক লোক শ্রীকৃষ্ণচরিত সমালোচনা দ্বারা অমরত্ব লাভের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমরা জানি, এ পথের নেতা তিনিই। তিনি গীতার অনুশীলন-তত্ত্বের এরূপ পরিস্ফুটভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কম্‌টির প্রত্যক্ষবাদ এবং বার্কলির ও শঙ্করের মায়াবাদ অতি সুন্দররূপে বিমিশ্রিত হইয়া এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ইহাতে গীতা আছে, ভাগবত আছে; বেদ আছে, পুরাণ আছে; ইতিহাস আছে, দর্শন আছে; যোগ আছে, কর্ম্ম আছে; মায়া আছে, কায়া আছে; প্রেম আছে, জ্ঞান আছে;—অথবা নাই যে কি, জানি না। ইহাতে ধর্ম্ম-জগতের আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত সকল তত্ত্ব নিহিত হইয়াছে। গুরুবাদ এবং ভণ্ডামীবাদ উপেক্ষিত হইয়া ইহাতে চরিত্র এবং জীবনের ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা যে কি অমূল্য বস্তু, এখনও কেহ বুঝিবে না। যখন মানুষের বহির্মুখী বৃত্তি অন্তর্মুখী হইবে,—অনুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম, কর্ম্ম বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া যখন অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিবে, যখন অনুষ্ঠান অপেক্ষা চরিত্রের আদর, বাহ্যপ্রকাশ অপেক্ষা জীবনের আদর অধিক

হইবে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিনব ধর্ম্মতত্ত্ব, এই অনুশীলন-তত্ত্ব এ দেশের ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে।" *

উপন্যাস-জগতে বঙ্কিমচন্দ্র।

দেখা যায়, পুরাকালে পদ্যেরই প্রচলন ছিল ; গদ্যের আদর ছিল না। আইন-কানুন করিতে হইলেও কর্ত্তারা পদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। বেদ, পুরাণ, চণ্ডী সকলই পদ্যে রচিত। পত্রাদিও পদ্যে লিখিত হইত। গদ্য-রচনা তুচ্ছ বোধে উপেক্ষিত হইত। † আমাদের দেশের চারণেরা পদ্যে কীর্ত্তি-গাথা বর্ণন করিত,—গদ্য উপযুক্ত ভাষা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সুতরাং গদ্যের সৃষ্টি হইল না। গদ্য সৃষ্ট না হইলে উপন্যাস জন্মিতে পারে না। তাই আমাদের দেশে উপন্যাস জন্মিতে অনেক বিলম্ব পড়িয়া গিয়াছিল।

* নব্যভারত ১৩০১।

† In early times, the mere art of writing was too difficult and dignified to be employed in prose :— Dunlop's History of fiction.

শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সকল দেশেই উপন্যাস বিলম্বে সৃষ্ট হইয়াছে। রাজা আলেকজান্দারের সময় হইতে গল্প লিখিবার বাসনা গ্রীকদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাহারা এ প্রবৃত্তি পারস্যবাসীদের নিকট পাইয়াছিল। একুশ শত বৎসর পূর্ব্বে এরিস্টাইডিস নামধেয় একজন গ্রীকবাসী "মিলেসিয়াকা" শীর্ষক উপন্যাস প্রথম রচনা করেন। কিন্তু সেখানি উপন্যাস নামের যোগ্যই নয়। ক্লিয়ারকাস্ ও তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পরে এণ্টোনিও ডায়োজিনিস্ উপন্যাস লিখিয়া কিঞ্চিৎ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এত গেল পুরাকালের কথা। ঐতিহাসিক কালে, অর্থাৎ মধ্যযুগে দেখা যায়, খ্রীষ্ট ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালী গল্প লিখিতে শিখিতেছে। তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক Alessandro Manzoni সবে মাত্র চল্লিশ বৎসর মারা গিয়াছেন।

ফ্রান্সে অনেক বিলম্বে উপন্যাস সৃষ্ট হয়। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় প্রথম উপন্যাস লিখিত হয়। তারপর অনেকেই উপন্যাস লিখিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন; —ভলটেয়র, রুসো, জোলা, বল্জ্যাক্ ডুমা প্রভৃতি অনেক

প্রতিভাসম্পন্ন মহারথী উপন্যাস লিখিয়া ফরাসী সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কয়জন ভাল লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল? ফরাসীদের ঔপন্যাসিক-রত্ন ভিক্টর হুগো অল্প দিন হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে প্রথম উপন্যাস "Euphues of Lyly" ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। কিন্তু সেখানি ঠিক উপন্যাস নয়,—দর্শনতত্ত্ব বলিলেই হয়। অনেকের মতে রিচার্ডসনের "Pamela"ই প্রথম উপন্যাস। ইহা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

স্পেনের প্রথম গল্প "Amades de Gaula" ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানি বীরত্বকাহিনী—ঠিক উপন্যাস নহে। এ দুইখানি পুস্তক ছাড়িয়া দিলে Cecilia Faber-এর "La Gaviota" প্রথম উপন্যাস। সেখানি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইবার সময় লিখিত হইয়াছিল।

জর্ম্মানীতে খৃষ্ট সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে গল্প লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু সে সকল গল্প উপন্যাসের গুণবিশিষ্ট নহে। সুতরাং তাহার বড় একটা মূল্য নাই।

গেয়েট্যাই প্রথম উপন্যাস-লেখক। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "The sorrows of the young Werther" ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার অনেক পরে জর্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক Wilibald Alexis উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন।

রুস-রাজ্যে Gogolএর উপন্যাস সর্ব্ব প্রথম। কিন্তু তাঁহার উপন্যাসে প্রেম বা প্রণয় নাই, উচ্ছ্বাস বা প্রফুল্লতা নাই। অপিচ কিছু মৌলিকতা আছে। Tolstoi ও Pissemski যখন উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন Gogol ও তাঁহার অনুকরণকারীরা বিস্মিত হইলেন। টলষ্টয় ত সে দিন মারা গেলেন, তাঁহার চিতাধূমে আজও ইউরোপীয় গগন সমাচ্ছন্ন।

পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জাপানী ভাষায় উপন্যাস লিখিত হয়। Murasaki নাম্নী এক জাপানী স্ত্রীলোক "Genji Monogatari" নামক উপন্যাস ১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই উপন্যাস পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম উপন্যাস।

ভারতবর্ষে পুরাকালে উপন্যাস ছিল বলিয়া শুনা যায় না। "দশকুমার চরিত" উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত হইতে

পারে না। "কাদম্বরী"তে উপন্যাসের উপাদান বড় বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। শুকপক্ষীর আত্মকথা প্রকৃত উপন্যাস বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। প্রাকৃত, পালি বা অন্য কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় হয়ত কোন সময়ে উপন্যাস ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার কথা শুনা যায় না। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান যুগের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, "আলালের ঘরের দুলাল"ই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু "Euphues of Lyly" যেমন গুণসম্পন্ন হইলেও বিস্মৃত-প্রায়, "আলালের ঘরের দুলাল"ও তাই। উভয় পুস্তকেরই এক্ষণে বড় একটা আদর নাই।

প্রকৃতপক্ষে রিচার্ডসন যেমন ইংলণ্ডের প্রথম ঔপ ন্যাসিক, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনই বাঙ্গালার প্রথম ঔপন্যাসিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, রিচার্ডসনের অনেক উপরে। রিচার্ডসন একটি বা দুইটি চরিত্র লইয়াই থাকিতেন, এবং তাহা ফুটাইতে যত্নবান্ হইতেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসোল্লিখিত সকল চরিত্র ফুটাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, এবং প্রায় সকল স্থলে কৃতকার্য্যও হইতেন।

স্কট, বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক নীচে। স্কটের উপ-

স্থানে সজীব মূর্ত্তি দেখা যায় না; নরনারী চরিত্রগুলি তিনি এমন ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, সে সব চরিত্র বাস্তব জগতে সচরাচর দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র-অঙ্কিত নরনারী চরিত্রগুলি যে সজীব, একথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

ফিল্ডিংয়ের উপরেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান। কল্পনা-শক্তি প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ফিল্ডিং অপেক্ষা অনেক বড়। ফিল্ডিং উপন্যাস-রাজ্যে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বাস্তব জগতেই আবদ্ধ ছিলেন,—উচ্চ আদর্শ গড়িতে পারেন নাই।

ষ্টার্ণ, ডাঃ জন্‌সন্‌, চার্লস জনষ্টোন, গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা করিলাম না।

আর যাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সচরাচর তুলনা করা হয়, সেই যশস্বী ঔপন্যাসিক স্যর ওয়াল্‌টার স্কট অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্র কোনও বিষয়ে ছোট, এরূপ বলিতে পারি না। যে সকল বাঙ্গালী, বঙ্কিমচন্দ্র ও স্কটের উপন্যাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা একথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র দুই ছত্রে যে ভাব ব্যক্ত

করিয়া গিয়াছেন, সে ভাব স্কট দুই ছত্রে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই; যে সামান্য ঘটনা সমাবেশে বঙ্কিমচন্দ্র একটা বড় চরিত্র ফুটাইয়া গিয়াছেন, সেরূপ সামান্য ঘটনার সমাবেশ স্কটের নিকট প্রায় অপরিচিত ছিল। তা ছাড়া, স্কট একটিও আদর্শ নরচরিত্র গড়িতে পারেন নাই বলিয়া শুনিয়াছি। ইংলণ্ডের কয়জন কবি তাহা পরিয়াছেন, তাহা জানি না। কেহ কেহ বলেন, সেক্সপিয়ার বা স্কট উভয়ের কেহ পারেন নাই *। 'আইভ্যান হো', 'রিচার্ড কলইক' বা 'ওথেলো'র চিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কিন্তু তাহারা আদর্শ চরিত্র নহে। যুধিষ্ঠির বা রাম, প্রতাপ বা চন্দ্রশেখর তুল্য আদর্শ নরচরিত্র ইংরাজি উপন্যাসে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ আদর্শ নরচরিত্র গড়িয়া গিয়াছেন, এরূপ আদর্শ নরচরিত্র ইউরোপীয়েরা বড় বেশী গড়িতে পারেন নাই। টলষ্টয়, হুগো প্রভৃতি দুই চারিজন মহা-প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক ছাড়া বড় যে কেহ পারিয়া-ছিলেন, এরূপ মনে হয় না। আন্নার স্বামী † আদর্শ চরিত্র

* Ruskin's Queen's Gardens.

† Anna Karenina by Tolstoi.

হইলেও বাঙ্গালীর নয়নে শৈবলিনীর স্বামী সুন্দরতর। আয়ার স্বামী আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তিনি হয়ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করিতে পারিবেন না। কিন্তু শৈবলিনীর স্বামী একদিনের জন্যও সে আশঙ্কা করেন নাই; তিনি সুধু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, কেন আমি প্রতাপের ক্রোড় হইতে শৈবলিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম।

চরিত্র-গঠন সচরাচর ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকদের লক্ষ্য নহে—বিশ্লেষণই লক্ষ্য। হিন্দু কবিরা চরিত্র গঠিত করেন—ইউরোপীয়েরা তন্ন তন্ন করিয়া চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। আমরা মানুষকে অবস্থা বা ঘটনার উপর স্থাপন করিয়া মানুষের ইচ্ছার দ্বারা অবস্থা বা ঘটনা নিয়মিত করি, ইউরোপীয়েরা অবস্থা বা ঘটনাকে মানুষের উপর স্থাপন করিয়া অবস্থা বা ঘটনা দ্বারা মানুষের ইচ্ছা নিয়মিত করেন *। জনসমাগমশূন্য নিস্তব্ধ নিশীথে চন্দ্রালোকে জাহ্নবী-বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে প্রতাপ

* বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক টলষ্টয় তাঁহার "War and Peace" নামক গ্রন্থ শেষে বলিয়া গিয়াছেন,—'It is essential to get rid of a freedom of the will that does not exist.'

যখন শৈবলিনীকে শপথ করাইল, তখন প্রতাপ স্বীয় ইচ্ছার দ্বারা অবস্থা বা ঘটনা নিয়মিত করিল। টম জোন্স * দেখাইল, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা, অবস্থা বা ঘটনা দ্বারা নিয়মিত হইয়াছে। হিন্দু ও ইউরোপীয় উপন্যাসের মধ্যে প্রভেদ অনেক। আমাদের কাব্য বা উপন্যাস শিক্ষার জন্য, ইংরাজদের কাব্য বা উপন্যাস আমোদের জন্য। আমরা দম্পতী-প্রেম, পিতৃ-ভক্তি, স্বদেশ-প্রীতি, ভগবৎপ্রেম বুঝাইবার জন্য বিষবৃক্ষ, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দ মঠ লিখিলাম, ইংরাজেরা Serious, Comic, Romantic উপন্যাস লিখিয়া জন সাধারণের চিত্তরঞ্জনে প্রয়াসী হইলেন। সুতরাং ইংরাজি সাহিত্যে আদর্শ চরিত্র বড় বেশী সৃষ্ট হইল না।

শুধু ইংরাজি সাহিত্যে কেন, ইউরোপীয় সাহিত্যেও তাই। ইউরোপীয় উপন্যাসের প্রথম অবস্থায় Spiritual romance, দ্বিতীয় অবস্থায় Comic, তৃতীয় অবস্থায় Pastoral, চতুর্থ অবস্থায় Heroic romance লিখিত হইয়াছিল। ভগবৎ-প্রেম, বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয়, স্বদেশ ভক্তি প্রভৃতি উচ্চবৃত্তি লইয়া বড় একটা কেহ নাড়া-

* Tom Jones by Fielding.

চাড়া করেন নাই। আধুনিক কালে চার্লস ডিকেন্স হইতে জর্জ্জ ইলিয়ট পর্য্যন্ত কয়েক জন ইংরাজ ঔপন্যাসিক * নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান করিতে যা-কিছু আন্তরিক যত্ন করিয়াছিলেন। জেন অষ্টেন, হেনরি উড, করেলি প্রভৃতি প্রতিভাশালিনী লেখিকারাও মনুষ্যের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পাদন করিতে কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের দময়ন্তী বা লবঙ্গলতা, ব্রজেশ্বর বা সত্যানন্দ, ধ্রুব বা প্রহ্লাদ তুল্য নরনারী চরিত্র ,ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকেরা কেহ অঙ্কিত করেন নাই; অঙ্কিত করিবার উপযোগী শক্তি ও কল্পনাও তাঁহাদের ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চ আদর্শ অঙ্কিত করিতে চিরদিন প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ-প্রদর্শিত সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন না করিয়া মহান্ পথে বিচরণ করিয়াছিলেন। ক্ষণস্থায়ী আনন্দের উৎস সৃষ্টি না করিয়া অনন্ত প্রেমের পারাবারে দেহ

* Thackeray ও Charlotte Bronteকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু Frances Burney, Horace Walpole, Anne Radclife প্রভৃতি ক্ষুদ্র ঔপন্যাসিকদিগের কথা আলোচনা-যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলাম না।

ভাসাইয়া ছিলেন। মৃণালিনী হইতে কমলাকান্ত পর্য্যন্ত সকল পুস্তকই প্রেমোচ্ছ্বসিত। এ প্রেম ত্রিধারায় প্রবাহিত হইয়াছে,—দাম্পত্য প্রেম, স্বদেশভক্তি ও ভগবৎ প্রেম। প্রেমের উচ্চ আদর্শ অঙ্কিত করাই বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। ইংরাজদের Serious, Comic ও Romantic উপন্যাসের পরিবর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্র Religion of conjugal love, Religion of patriotism এবং Religion of humanityর চিত্র অঙ্কিত করিয়া উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। কোন্ চিত্র শ্রেষ্ঠতর? ইউরোপীয় উপন্যাসে অনেক বীরের চিত্র আছে, কিন্তু সত্যানন্দের ন্যায় স্বদেশপ্রেমিক কয় জন আছেন? এমিলিয়ার * ন্যায় অনেক সতী থাকিতে পারে, কিন্তু লবঙ্গলতার তুল্য পতিব্রতা কয়জন আছেন? বিশপ মিরিয়েলের † ন্যায় পরহিতব্রতী থাকিতে পারে, কিন্তু প্রতাপের ন্যায় আত্মোৎসর্গী কই?

বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিষয়ে অনেক ইউরোপীয় উপন্যাসকারের চেয়ে উচ্চে অধিষ্ঠিত। তিনি মনুষ্য-চরিত্র যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেন, যেরূপ অল্প কথায় তাহা অঙ্কিত

* Amelia—by Fielding.

† Les Miserables—by Victor Hugo.

করিতেন, সেরূপ বড় বেশী কেহ পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন, সেক্ষপিয়র ও মিলটনেরও এ বিষয়ে ক্রটী ছিল *। তাঁহাদেরই যদি ক্রটি থাকিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে স্কট বা হুগো, মলিয়ের বা গেইট্যা, টলষ্টয় বা মাঞ্জোনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কি না, কে বলিতে পারে?

মনুষ্য-চরিত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেই চলিবে না, তাহা অঙ্কিত করিতে হইবে। সেক্ষপিয়র, টলষ্টয় যদি এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রও সে হিসাবে কৃতকার্য্য হন নাই বলিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালীরা মনে করিয়া থাকে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ ক্রটি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের একটা বিশেষত্ব ছিল,—তিনি বিনা আড়ম্বরে, অল্প কথায়, সামান্য ঘটনার সাহায্য লইয়া বড় বড় চরিত্র পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান

* William Barry লিখিয়াছিলেন,—(Nineteenth Century, 1894, page 719) "It does not seem that Shakespeare and Milton have communicated their deep insight into life, or their essentially spiritual view of man's nature."

ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকেরা একটা চরিত্র পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে এত বাজে কথার প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন, অকারণ এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সূচনা করেন যে,চরিত্র পরিস্ফুট হইলেও সে সকল বর্ণনা পাঠকের সাতিশয় বিরক্তিকর হইয়া উঠে। বিখ্যাত সমালোচক গর্ডন সাহেব বলিয়াছেন,—"Can any one point out to us one of the novelists, who is capable of making his hero and heroine enter a room, at the very climax of their fate, without delaying the catastrophe, to tell us that it is a square room with four walls, and three windows, that each window has two white muslin curtains, carefully tucked back, that there are six chairs and a sofa—* * * ?" সমালোচক সত্য কথাই বলিয়াছেন। ফরাসী ঔপন্যাসিকরা তবু অনেকটা ভাল; কিন্তু জর্ম্মান নভেল পড়িতে মনুষ্যের ধৈর্য্য থাকে না। ইংরাজী উপন্যাস এতটা মন্দ না হইলেও ক্রমে হইয়া উঠিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও উপন্যাস পড়িতে কখন কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে, এরূপ শুনি নাই।

তাঁহার কোনও উপন্যাসে এমন অংশ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা পরিত্যজ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অধিকাংশ পাশ্চাত্য উপন্যাস হইতে শ্রেষ্ঠতর।

উভয় দেশের ঔপন্যাসিক উপাদানও বিভিন্ন। ইউরোপীয়েরা বর্ত্তমান যুগে যাহা লইয়া উপন্যাস গড়িয়াছেন, হিন্দুরা তাহা লইয়া উপন্যাস গড়েন নাই। পাশ্চাত্য উপন্যাস-কারেরা 'একটা বৃত্তিকে রক্ত মাংস দিয়া মনুষ্যাকারে গড়িয়াছেন; আমরা মানুষ গড়িয়া তাহাকে নানা বৃত্তি দিয়াছি। একপক্ষে একটা বৃত্তি সজীব মনুষ্য, অপর পক্ষে মনুষ্য বৃত্তিনিচয়ের সমষ্টি মাত্র। রুচি, নীতি, শিক্ষা অনুসারে সম্ভবতঃ এইরূপ বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে। কারণ যাহাই হউক, আমরা কিন্তু নানা বৃত্তি শিরা ধমনী সংযুক্ত একটী সজীব মনুষ্য দেখিবার অধিকতর অনুরাগী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা সে চিত্র দেখিতে পাই। ইউরোপীয় উপন্যাসে বড় বেশী দেখিতে পাই না। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আমাদের চক্ষে শ্রেষ্ঠতর।

বর্ত্তমান যুগে ইংলণ্ডীয় উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সহিত তুলনা হইবার যোগ্যই নহে। ইংলণ্ডের উপন্যাস দিন দিন অধঃপতিত হইতেছে। স্কট, অষ্টেন যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে অবস্থায় আর নাই। পণ্ডিতচূড়ামণি William Barry তাঁহার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধে (Democratic Ideals) লিখিয়াছেন,—"We observe accordingly a marvellous decline in the poetical value of the writings now held up to our admiration. A crude and violent Realism, falsely so called, usurps the place of honour, while trifling personal gossip fills our journals—"

কবিত্ব উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ; যে উপন্যাসে তাহা নাই, সে উপন্যাস অপাঠ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে কবিত্ব আছে, বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডের কোনও উপন্যাসে তাহা নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদেশী উপন্যাস-কারের ন্যায় উৎকট সুখের চিত্র বা "Realism"র খাতিরে উৎকট লালসার চিত্র অঙ্কিত করিতে ব্যাকুল হয়েন নাই। উৎকৃষ্ট লেখকেরা সে সব চিত্র কখন অঙ্কিত করেন না,

তাঁহারা কাব্য তুল্য উপন্যাস সৃষ্টি করেন। * উৎকট চিত্র কাব্যে বা উপন্যাসে প্রবেশ করিলে সাহিত্যের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। জর্ম্মানী ও ইংলণ্ডের অবনতি বিগত শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আগষ্ট ষ্ট্রাইণ্ডবর্গের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সুইডেন নিভিয়া গিয়াছে। আজ আটাশ বৎসর † ফ্রান্সে বাতি জ্বলে নাই। বাঙ্গালাও গিয়াছে—সম্রাটবিহীন বিশৃঙ্খল রাজ্যে আজ শত শত দস্যুর অস্ত্রাঘাতে বাঙ্গালা উপন্যাস জর্জ্জরিত।

বঙ্কিমচন্দ্র একা যাহা করিয়াছিলেন, পৃথিবীর অন্য কোনও ব্যক্তি তাহা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি অনন্যসাহায্যে বাঙ্গালা উপন্যাস গড়িয়াছিলেন; গড়িতে তাঁহার পঁচিশ বৎসরও লাগে নাই। ইংলণ্ডে পঁচিশ বৎসরে ইংরাজী উপন্যাস গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু সে কার্য্য এক জনের দ্বারা হয় নাই,—সপ্তরথীর সম্মিলিত শক্তিতে হইয়াছিল। রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্মলেট, ষ্টার্ণ,

* "The greatest novelists always a small class, ...oduce work which is as admirable in its art as the ...nest poetry"—Dunlop's History of fiction.

† [illegible]

ডাক্তার জন্‌সন্‌, চার্লস জনষ্টোন, গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি ঔপন্যাসিকেরা পঁচিশ বৎসরে যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় সেই কার্য্য সেই সময়ে একাকী সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তা ছাড়া ইংলণ্ডে প্রথম উপন্যাস "পমেলা" সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিল, বাঙ্গালায় প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" নিন্দা ও বিদ্রূপের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে রিচার্ডসন প্রভৃতির সময়ে অধিকাংশ ব্যক্তি শিক্ষিত, বাঙ্গালায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগে অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত ও বাঙ্গালা-বিদ্বেষী। এত অসুবিধার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র একা যাহা করিয়াছিলেন, ইউরোপের কোনও ঔপন্যাসিক তাহা করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় অল্প সময়ের মধ্যে ভাষা ও উপন্যাস যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে সেরূপ উন্নতি সেই সময়ের মধ্যে হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যতটা ঋণী, পৃথিবীর কোনও জাতি কোনও উপন্যাসকারের নিকট ততটা ঋণী নহে। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-জগতে অতুলনীয়, প্রতিদ্বন্দ্বি-বিহীন।

পুস্তক লিখিবার প্রণালী।

বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক লিখিবার প্রণালী এস্থলে উল্লেখ করিলে বোধ হয় কেহ বিরক্ত হইবেন না। তাঁহার লিখিবার একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি খাতা বাঁধিয়া পুস্তকের আখ্যানাংশ স্থির করিয়া লইয়া লিখিতে বসিতেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ পূর্ব্বাহ্নে নির্দ্দিষ্ট হইত—প্রত্যেক পরিচ্ছেদে কোন্ কোন্ ঘটনার সমাবেশ হইবে—কোন্ কোন্ নরনারী অবতীর্ণ হইবে, তাহাও একপ্রকার নিরূপিত হইত। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম পুনঃ পুনঃ ঘটিত। এমন কি সময় সময় দুই এক পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত হইত, দুই এক পরিচ্ছেদ পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিত। যে পরিচ্ছেদ কমলমণি ও কুন্দনন্দিনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সে পরিচ্ছেদে হয়ত দেখিলাম, হীরার আয়ি আসিয়া "কেষ্টরস্" ও "হষ্টিরসে"র অবতারণা করিতেছে। যে পরিচ্ছেদে দলনী-বেগমের আসিবার কথা, সে পরিচ্ছেদে লরেন্স ফষ্টার আসিয়া দেখা দিল। এত কাটাকাটি করিতে, এত পরিবর্ত্তন করিতে,

সম্পূর্ণ লিখিত পরিচ্ছেদ এককালে উঠাইয়া দিতে আমি আর কোন গ্রন্থকারকে দেখি নাই। আমি কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায়কে কখন এক ছত্র পরিবর্ত্তন করিতে দেখি নাই। রমেশ বাবু লেখা কমাইতেন না, বরং বাড়াইতেন। হেম বাবু (কবি) খুব দ্রুত লিখিয়া যাইতেন, পরিশেষে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ত পরিবর্ত্তন করিতেন,—লিখিবার সময় করিতেন—পর দিন করিতেন—ছয় মাস, এক বৎসর পরেও করিতেন। যতক্ষণ না কথাটী তাঁহার পছন্দসই হইত—যতক্ষণ না ভাবটি তাঁহার মনঃপূত হইত, ততক্ষণ তিনি পরিবর্ত্তন করিতেন। একটা কথা বা একটা ভাব লইয়া এতটা সময় ব্যয় করিতে আমি অপর কাহাকেও দেখি নাই।

যতদিন তিনি গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে বিনিযুক্ত ছিলেন, ততদিন তাঁহার লিখিবার একটা সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। কলিকাতার সাবকিতালার বাসায় অবস্থান কালে দেখিয়াছি, তিনি রাত্রি আটটার পর লিখিতে আরম্ভ

করিতেন; এবং রাত্রি দুইটা আড়াইটা পর্য্যন্ত লিখিতেন। তখন তাঁহার বাম পার্শ্বে একটা কাচের ফর্সিতে বিপুলোদর কলিকায় তামাকু সাজা থাকিত; এবং দক্ষিণ দিকে কিছু আহার্য্য থাকিত। প্রতাপ চাটুর্য্যের গলিতে আসিয়া এ কাচের ফর্সি সরিয়া দাঁড়াইল; এবং কৃষ্ণচরিত্র-লেখকের জন্য রূপার ফর্সি আসিল।

সরকারি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সকল সময়ে একটু একটু লিখিতেন—রাত্রি জাগিয়া লিখিবার অভ্যাস ক্রমে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় যখনই সময় পাইতেন তখনই কিছু কিছু লিখিতেন। সময় কখন বৃথা নষ্ট করিতেন না।

লিখিবার সময় তাঁহাকে কখন বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় গম্ভীর, কখন বা তরলমতি বালকের ন্যায় চঞ্চল দেখিতাম। কখন হয়ত তিনি এক ছত্র লিখিয়া তখনই তাহা কাটিয়া দিতেন। আবার একটু ভাবিতেন—লিখিবার পুনর্ব্বার উদ্যোগ করিতেন, পরমুহূর্ত্তেই হয়ত লেখনী পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন, এবং গৃহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাকিতেন। কখন

বাতায়নসম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া সুদূর সৌধচূড়া পানে চাহিয়া থাকিতেন—কখন বা কোন পুস্তক বা দ্রব্যাদির পাত্রে হস্ত বিমর্ষণ করিতেন। তখন যে তিনি বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া অন্তর্জগতেই নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন, এমন আমার মনে হয় না। লিখিবার সময় আমরা কেহ আসিয়া পড়িলে তিনি কখন বিরক্ত হইতেন না, এমন কি আলাপ করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। এমন দিন অনেক গিয়াছে, যে দিন বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও এক ছত্র লিখিতে পারিতেন না।. যদি বা লিখিতেন, তাহাও আবার কাটিয়া দিতেন। আবার এমন অনেক দিন গিয়াছে, যে দিন তাঁহার লেখনী উচ্ছ্বসিতা তরঙ্গিণীর ন্যায় দুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সে সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

আমার বেশ স্মরণ আছে, সানকিভাঙ্গার বাটীতে একদিন আমার ভগিনীপতি পূজ্যপাদ স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন, "আপনার রচনার মধ্যে আপনি কোন্ পুস্তক খানিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন ?"

তিনি বলিলেন, "তুমি বল দেখি ?"

কৃষ্ণধন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি বলিব না— লিখিয়া রাখিতেছি। আমি জানিতে চাই, আপনার সহিত আমার মতের মিল হয় কি না।"

কৃষ্ণধন বাবু লিখিয়া রাখিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র পর-মুহূর্ত্তে একটুও চিন্তা না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কমলাকান্তের দপ্তর।"

কৃষ্ণধন বাবু কাগজ উল্টাইয়া দেখাইলেন; তাহাতে লেখা রহিয়াছে—কমলাকান্তের দপ্তর।

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

উপন্যাসনিচয়ের মধ্যে "কৃষ্ণকান্তের উইলের" স্থান সর্ব্বোচ্চ। কাব্যাংশে "কপালকুণ্ডলা" শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। "বিষবৃক্ষ" "চন্দ্রশেখর," "রাজসিংহ" (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ) প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। সর্ব্বনিম্ন স্থান সম্ভবতঃ "মৃণালিনী" অধিকার করিয়াছে। ক্ষুদ্র উপন্যাসের কথা তুলিলাম না।

প্রথম তিন খানি পুস্তক (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী) সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "প্রথম তিনখানি বইয়ের জন্য আমি ইংরেজী সাহিত্যের কাছে ঋণী, তবে দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে আইভান্‌হো পড়ি নাই। কপালকুণ্ডলা লেখার সময় সেক্সপীয়র বড় বেশী পড়িতাম। মৃণালিনীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি পড়িতাম।"

বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর একজাতীয় উপন্যাস। তিন খানি গ্রন্থের নায়কের সম্মুখে এক একটি প্রলোভন। কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী-রূপে "চন্দ্রশেখরে" জন্ম গ্রহণ করিল; আবার শৈবলিনী মরিয়া রোহিণী হইল। তিন খানি গ্রন্থের একই প্রতিপাদ্য। তিনটি নায়কের কেহই দুর্ব্বলহৃদয় নহেন; প্রলোভনের সহিত তিন জনই প্রাণপণে যুঝিয়াছিলেন। যাঁহার প্রণয় নিকৃষ্ট, যিনি গুণ ছাড়িয়া রূপের সেবা করিতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি অবশেষে প্রণয়িনীকে সংহার করিয়া নিজে আত্মঘাতী হইলেন। যাঁহার প্রণয় অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, যিনি গুণকে উপেক্ষা না করিয়া রূপের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি ধ্বংস হইয়াও

হইলেন না। আর যাঁহার প্রণয় বিশুদ্ধ, রূপজ-মোহ-বর্জ্জিত ও কামনাশূন্য, যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী ও আত্মসংযমী, তিনি চিরদিন অক্ষয়, অমর হইয়া রহিলেন। গোবিন্দলাল নিকৃষ্ট প্রেমিক—প্রতাপ শ্রেষ্ঠ সাধক, নিকৃষ্ট-প্রেমিকের চিত্র—দেবতার অধঃপতনের চিত্র কৃষ্ণকান্তের উইলে। মিল্টনের 'Paradise regained' অপেক্ষা 'Paradise Lost' শ্রেষ্ঠতর। কৃষ্ণকান্তের উইলে যতটা ক্রমবিকাশ আছে, চন্দ্রশেখরে ততটা নাই। প্রতাপ গোড়ায় মানুষ, মধ্যে দেবতা, শেষে দেবতা। গোবিন্দলাল গোড়ায় দেবতা, মধ্যে মানুষ, শেষে পশু। গোবিন্দলাল ও ভ্রমরকে আঁকিতে যতটা art বা কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছে, প্রতাপ ও শৈবলিনীর অঙ্কনে ততটা art বা কৌশলের প্রয়োজন হয় নাই। এই কারণে কৃষ্ণকান্তের উইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

উপন্যাসের বৈচিত্র্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর বৈচিত্র্য এই যে, প্রত্যেক উপন্যাসেই ধনবান্ ব্যক্তির প্রসঙ্গ আছে। ক্ষুদ্র উপন্যাস

রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়, ইন্দিরাও বাদ যায় নাই। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী সীতারাম, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ প্রভৃতিতে রাজা বাদশাহের কথা—বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী,দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি ধনবান্ জমীদার লইয়া। কপালকুণ্ডলাতে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেও আমরা ঐশ্বর্য্যশালিনী মতিবিবির কথা ও পরোক্ষে বাদশাহের কথা শুনিতে পাই। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা দরিদ্র হইলেও তাহারা রাজার ভাণ্ডার লুটিতেছে—রাজাকে দূরীভূত করিয়া রাজ্যাভিলাষী হইয়াছে। তাই বলিতে ছিলাম, ক্ষমতাশালী বা ধনশালী ব্যক্তির প্রসঙ্গ বঙ্কিম চন্দ্রের সকল উপন্যাসেই আছে।

আর একটা বৈচিত্র্য এই যে, কোনও উপন্যাসে য়িকার সন্তান সন্ততি নাই। উপনায়িকার থাকিতে পারে, কিন্তু নায়িকার নাই। ভ্রমরের একটি সন্তা হইয়াছিল, কিন্তু কয়দিনমাত্র জীবিত থাকিয়া মরি গিয়াছিল—আমরা তাহাকে ত্তকের জন্য দেখিতে পাই নাই।

উপন্যাসের পরিচয়।

দুর্গেশনন্দিনী।

[ইতিবৃত্ত।]

সকলেই অবগত আছেন, দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। যখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর, তখন তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। বোধ হয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ লেখা শেষ হয়। তখন তিনি খুলনায়। রচনা শেষ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না, উপন্যাস খানি প্রকাশের যোগ্য হইয়াছে কি না। তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীব চন্দ্রকে আদ্যন্ত শুনাইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিমর্ষ ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার আত্মনির্ভরতা জন্মে নাই—তখনও তিনি তাঁহার শক্তি বুঝিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন।

কয়েক মাস কাটিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কয়েক মাস লেখনী ধারণ করিলেন না। যে লেখনী কিছুকাল পরে 'কপালকুণ্ডলা' প্রসব করিবে, সে লেখনী উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল। অবশেষে ভ্রাতৃদ্বয়ের ভুল ভাঙ্গিল।— সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মস্থল অভিমুখে ধাবিত হইলেন; এবং দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া দ্বিতীয়বার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফল এই দাঁড়াইল,— সঞ্জীবচন্দ্র, দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কাঁটালপাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং মুদ্রাযন্ত্রের শরণ লইয়া অচিরে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ করিলেন। *

প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু যশ হইল না। না হউক, গ্রন্থকার আপনাকে তখন কতকটা চিনিলেন। উপেক্ষিত লেখনী উঠাইয়া লইয়া তিনি কপালকুণ্ডলা লিখিলেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পড়িয়া কাহাকেও শুনাই-

* দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধীয় এই আখ্যায়িকা আমি বাল্যকালে পূজ্যপাদ সঞ্জীবচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে কোনও কথা কোনও দিন তুলেন নাই। তুলিলে পাছে ভ্রাতৃবর লজ্জা পান, তাই বোধ হয় তুলেন নাই। পিতার নিকট অথবা অন্য কাহারও নিকট এ সম্বন্ধে কিছু শুনি নাই।

লেন না—অথবা দেখিতে দিলেন না। তখন তাঁহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই বিশ্বাস, এই আত্মনির্ভরতা তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। একবার ঘা খাইয়া তিনি পাণ্ডুলিপি বাহিরের কাহাকেও আর দেখান নাই। কিন্তু আমি গোপনে তাহা দেখিতাম। আমার এক্ষণে ঠিক স্মরণ হয় না, বোধ হয় আমি এ জন্য তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইয়া থাকিব। যে জন্যই হউক, আমার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পাণ্ডুলিপি অপর কেহ দেখে, এটা তিনি পছন্দ করিতেন না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি একদা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট অসত্য কথা বলিয়াছিলাম। রমেশ বাবু তখন মেদিনীপুরের কলেক্‌টার। লোয়াদার ডাক্ বাংলোতে বসিয়া তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার কাকা এক্ষণে কি বই লিখিতেছেন?" কাকার মনোভাব স্মরণ করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, "জানি না।" অথচ কিছু দিন পূর্ব্বে আমি তাঁহার খাতা দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু একজনকে পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেন, আমার খুড়িমাকে। যতটুকু লিখিতেন, ততটুকু পড়িয়া

শুনাইতেন। শুনাইতেন, অথবা নিজে শুনিতেন। তিনি বলিতেন, কাণের ন্যায় সমালোচক নাই; একটু তাল কাটিলেই কাণ তাহা ধরিয়া দেয়।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, আয়েষা-চরিত্র স্কটের আইভ্যানহোর অন্তর্গত রেবেকা চরিত্রের অনুকরণ মাত্র। আয়েষা, রেবেকার প্রতিকৃতি বটে— অনুকরণ নহে। বঙ্কিমচন্দ্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন," 'আইভ্যানহো' পড়িবার আগে দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছিলাম।" তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন ও বুঝিতেন, দুর্গেশনন্দিনী একখানি তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস মাত্র। তাহা রচনা করিয়া অথবা তাহার রচয়িতা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরব কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় নাই। বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস, দুর্গেশনন্দিনী,—ইংলণ্ডের প্রথম উপন্যাস "পমেলা।" এই পমেলারও একটা কলঙ্ক আছে। ফরাসীরা বলেন, Marianne (by Marivaxx) গ্রন্থের অধিকাংশ ঘটনা ও চরিত্র চুরি করিয়া পমেলায় বসান হইয়াছে।

আর বঙ্কিমচন্দ্র যদি আইভ্যানহো হইতে আয়েষা-চরিত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বা বিশেষ কি

অপরাধ করিয়াছেন? সেক্ষপিয়র এরূপ অপরাধ করেন নাই কি? জিরাল্ডি সিন্থিওর উপন্যাস হইতে কি ওথেলোর প্লট লওয়া হয় নাই? হলিনসেডের গল্প হইতে কি ম্যাক্‌বেথের আখ্যানাংশ গৃহীত হয় নাই? না, প্লুটার্ক হইতে কোরিওলেনাস্ উৎপন্ন হয় নাই?

তা' ছাড়া আর এক কথা আছে; এক ভাব কি দুই কবির আসিতে পারে না? মধুসূদন দত্ত যখন "মেঘনাদ বধ" লেখেন, তখন তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ছিলেন। "উত্তররামচরিতের" কথা কখন তিনি শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ তিনি কিরূপে উত্তরচরিতের স্থান বিশেষের ভাব স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন? * বুঝিলাম যেন, মধুসূদন ইউরোপীয় কাব্য পড়িয়া তাহার ভাব মেঘনাদ বধের অষ্টম সর্গে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন †। কিন্তু ভবভূতির সহিত তাঁহার কোনরূপ পরিচয়ের সম্ভাবনা দেখি না।

কতকাল পূর্ব্বে কালিদাস লিখিয়াছিলেন,—

তমেকদৃশ্যং নয়নৈঃ পিবন্ত্যঃ

* মেঘনাদবধ—৪র্থ সর্গ—ছিনু মোরা সুলোচনা—ইত্যাদি।

† প্রেতলোকের বর্ণনা।

নার্য্যো ন জগ্মু র্বিষয়ান্তরাণি।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং
সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা॥ *

তার পর যুগযুগান্তর বহিয়া গেল। সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মনে সহসা সে ভাবের উদয় হইল কেন? তিনি পৃথিবীর অপর প্রান্তে সমুদ্রকূলে বসিয়া নবোদিত সূর্য্য পানে চাহিয়া লিখিলেন,—

"——Sound needed none
Nor any voice of joy; his spirit drank
The spectacle; sensation, soul, and form
All melted into him; they swallowed up
His animal being; in them did he live,
And by them did he live; they were his life." †

কালিদাস লিখিলেন, সুরূপা রমণী ব্যাভিচারিণী হয় না। সেক্ষপিয়র সে ভাব কোথায় পাইলেন? ‡ তাই বলিতেছিলাম, দুই কবির এক ভাব আসা বিচিত্র নহে।

* কুমারসম্ভব।
† Excursion.
‡ Romeo Juliet.

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়া মনে হইল, উহা স্কটের আইবানহো পড়িয়া লিখিত। অনেক দিন পরে বঙ্কিম বাবুকে একবার ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগে আইবানহো পড়ি নাই।' আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমিই হিন্দু পেট্রিয়টে দুর্গেশনন্দিনীর নিন্দা করিয়াছিলে?' আমি বলিয়াছিলাম, 'না, হিন্দু পেট্রিয়টে যে সমালোচনা হইয়াছিল, তাহা তোমারই কাছে প্রথম শুনিলাম।' তিনি বলিয়াছিলেন, 'সমালোচনা অন্যায় হয় নাই, এবং পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম, উহা তোমারই লেখা—প্রতিকূল হইলেও অমন সমালোচনা পড়িয়া সুখ হয়—সমালোচক জানিতেন না যে, তখন আমি আইবানহো পড়ি নাই, তাই নিন্দা করিয়াছিলেন।"*

রাজসাহী কলেজের শিক্ষক বাবু লোকনাথ চক্রবর্তী জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, দুর্গেশনন্দিনীর অভিনব সংস্করণে দিগ্‌গজকে নূতনরূপ দেওয়া হইল কেন? বঙ্কিম বাবু উত্তর দেন যে, "এক শ্রেণীর অনুকরণপ্রিয়

* প্রদীপ—১৩০৫।

লেখক, বিদ্যাদিগ্‌গজ চরিত্রের নামে বঙ্গ সাহিত্যে অশ্লীলতা আনিতেছে। তাহাদের মুখবন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে সে চরিত্রের কোন কোন স্থল নূতন করিতে হইয়াছে।”

দুর্গেশনন্দিনী, নূতন যুগের প্রথম উপন্যাস। যখন প্রকাশিত হয়, তখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও প্রতিষ্ঠা ছিল না। একজন অপরিচিত নবীন গ্রন্থকারের উপন্যাস অনুকরণ-প্লাবিত বঙ্গদেশে কিরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে তখনকার একখানি সাময়িক পত্র হইতে সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

সমালোচনা।

“বাঙ্গালাতে যত গদ্যকাব্য হইয়াছে, তৎসকলই প্রায় বিদ্যাসুন্দরের ছায়াস্বরূপ বোধ হয়; এবং সেই বিদ্যাসুন্দরও সংস্কৃত চৌর পঞ্চাশতের অনুকরণ মাত্র। ফলে এক্ষণকার গ্রন্থকারেরা আমাদিগের এক প্রাচীনা কুটুম্বিনীর সদৃশ বোধ হন। ঐ কুটুম্বিনীর নিকট বাল্যকালে আমরা রূপকথা শুনিতাম, এবং তিনি প্রত্যহ আমাদিগকে কহিতেন, “এক রাজার দুই রাণী, সো দো,

সোকে রাজা বড় ভালবাসিতেন, দোকে দেখিতে পারিতেন না।" তিনি এক দিবসের নিমিত্তেও এই উপষ্টম্ভের অন্যথা করিতেন না, নব্য গ্রন্থকারেরাও সেইরূপ আদর্শের অন্যথা করিতে বিমুখ। রত্নাবলীতে শ্রীহর্ষ নায়কের আদর্শ স্বরূপে বৎসরাজকে পৌরুষবিহীন অল্প-বুদ্ধি রোদনশীল কামাতুর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তদবধি সেই ভাব নায়ক-মাত্রেতেই দৃষ্ট হয়, কুত্রাপি অন্যথা দেখা যায় না। এই প্রযুক্ত আমরা বঙ্গীয় সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইয়াও বাঙ্গালী গদ্যকাব্য-পাঠে অত্যন্ত অনুরাগবিহীন। পরন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করায় সে বিরাগের দূরী-করণ হইয়াছে। আমরা তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার কল্পনা, গ্রন্থন, রচনা সকলই নূতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতে কাহাকেই চর্ব্বিত চর্ব্বণের ক্লেশ পাইতে হয় না। যাঁহারা ইংরাজী গদ্যকাব্য পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহা-দিগের মনে দুর্গেশনন্দিনীর অনেক স্থানে ইংরাজী নবেলের প্রতিভা লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতিভার কোন বিশেষ হানি হয় নাই। যাঁহারা

নূতন সরস মনোমুগ্ধকর গল্পের অনুরাগী; যাঁহারা বীর্য্যবৎ বাক্যের আদরকারী; যাঁহারা বিনানুপ্রাসে রচনার চাতুর্য্য হইতে পারে এমত জ্ঞান করেন; যাঁহারা মহদ্‌গুণে পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা দুর্গেশনন্দিনীতে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন; কারণ ইহা তাঁহাদের সকল অভীষ্টের সম্যক প্রকারে পোষক সন্দেহ নাই।

* * * *

"গল্পের মুখ্য পদার্থ আদিরস হইলেও তাহার কুত্রাপি অসহনীয় বর্ণন হয় নাই, ও স্থানে স্থানে উপহাস বর্ণন দ্বারা চিত্ত বিস্ফারণের উপায় করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের বর্ণন শক্তি বিলক্ষণ বলবতী এবং যে কোন বিষয়ের আদর্শ শব্দে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাই মনোজ্ঞ বোধ হয়। নায়িকার রূপ বর্ণনা গ্রন্থকার দিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু এতদ্দেশের নব্য প্রচলিত প্রথায় তিল কলা তাল বেল প্রভৃতি কয়েক ফল মূলের সমাহার করিলেই তাহা নিস্পন্ন হইয়া থাকে, কেহই তাহার পরিবর্ত্তন করেন না। বঙ্কিম বাবু তাহার অন্যথায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন তাহা তিলোত্তমার রূপ বর্ণনে প্রতীত হইবে।

* * *

"শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু হাস্য-রসোদ্দীপনে বিলক্ষণ যত্নশীল; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এইক্ষণে বাঙ্গালী পুস্তক ভদ্র মহিলারা পাঠ করিয়া থাকেন ইহা তিনি সর্ব্বত্র স্মরণ রাখেন নাই, অথবা তাঁহার পুস্তক তাহাদিগের গ্রাহ্য করিবার সম্যক চেষ্টা পায়েন নাই। অনেক কথা আছে যাহা স্পষ্টাপেক্ষা পরোক্ষে ভদ্র হয়, ইহা বিস্মৃত হওয়া অনেক গ্রন্থকারের সহৃদয়তার হানিকর হইয়া থাকে।

* * *

"গ্রন্থকারের বর্ণনায় প্রধান সেনাপতি কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা যে প্রকারে জগৎসিংহের বন্দী ও পীড়িতাবস্থায় সেবা করিয়াছে তাহা কদাপি কোন যবন-সম্বন্ধে সংলগ্ন বোধ হয় না। আসমানির চরিত্রও স্থানে স্থানে ইউরোপীয় প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর আসমানির রূপ ব্যাজস্তুতিতে যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃত বর্ণনে তাহার লক্ষণ রক্ষা করা হয় নাই, পরস্পর অত্যন্ত অসংলগ্ন বোধ হয়। রচনা সম্বন্ধে বক্তব্য যে তাহা সাধারণতঃ শুদ্ধ ওজোগুণবিশিষ্ট এবং স্বভাবসিদ্ধ হইলেও স্থানে স্থানে চ্যুত সংস্কৃতিদোষে আক্লিষ্ট আছে। কয়েক স্থানে গ্রন্থকার

"লক্ষ ত্যাগ করিয়া" পদ লিখিয়াছেন, ইহা পরিশুদ্ধ গৌড়ীয় নহে। লোকে লম্ফ "প্রদান" করিয়া থাকে, কদাপি "ত্যাগ" করে না, কেবল পল্লীগ্রামবাসীরা "লাফ ছাড়িয়া" থাকে, বোধ হয় বঙ্কিমবাবু তাহারই অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক তাঁহার গ্রন্থখানি যে রসব্যঞ্জক, ভাবদ্যোতক ও নূতন প্রণালীর আদর্শস্বরূপ হইয়াছে এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে সম্যক সাধুবাদ করিলাম।"*

'আশমনির অভিসারে'র কথা অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন; কিন্তু প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা নাই,—কিছু কিছু পরিত্যাগ করা হইয়াছে। পরিত্যক্ত অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

দুর্গেশনন্দিনী—পরিত্যক্ত অংশ।

"হাঁ খাইবে বই কি—এই খাও, দেখ" বলিয়া আশমনি হস্ত ধরিয়া টানিয়া বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ভোজন পাত্রের নিকট বসাইল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "ছি! ছি! ছি! রাম, রাম, রাম! করিলে কি? করিলে কি? উচ্ছিষ্ট মুখ, তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে?"

* রহস্য সন্দর্ভ—২য় পর্ব্ব।

"ক্ষতি কি? পিরীতে সব হয়।"

ব্রাহ্মণ নীরব হইয়া রহিলেন।

"খাও।"

"গণ্ডুষ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করিয়াছি, তুমি আমায় স্পর্শ করিলে, আবার খাইব?"

"হাঁ খাইবে বই কি? আমারই উচ্ছিষ্ট খাইবে।"

এই বলিয়া আশমনি ভোজন পাত্র হইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া আপনি খাইল। ব্রাহ্মণ অবাক হইয়া রহিলেন।

আশমনি উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন পাত্রে রাখিয়া কহিল, "খাও।"

ব্রাহ্মণের বাঙ নিষ্পত্তি নাই।

"খাও; শোন।"

আশমনি গজপতির কানে কানে কি কহিল।

ব্রাহ্মণ আসন হইতে অর্দ্ধ হস্ত লাফাইয়া উঠিলেন।

"তবে খাই," বলিয়া দিগ্‌গজ উচ্ছিষ্ট অন্ন গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলেন। নিমেষ মধ্যে ভোজন পাত্র শূন্য করিয়া কহিলেন—

"সুন্দরি! কই?"

"মর্, এ টো মুখে ?"

"হম্ হম্—আঁচাই আঁচাই" বলিয়া গজপতি আস্তে ব্যস্তে মুখে জল দিতে লাগিলেন; কতক জল লাগিল, কতক জল লাগিল না; দন্ত মধ্যে আধপোয়া চালের অন্ন পান্তা হাঁড়িতে রহিল।

"কই সুন্দরি—অধর-সুধা কই ?"

"মর্ আগে হাত মুখ মোছ।"

ব্রাহ্মণ ত্রস্ত হইয়া কোচায় হাত মুখ পুঁছিতে লাগিলেন।

* * * *

"এখন সুন্দরি ?"

"এ দিকে আইস।" দিগ্‌গজ আশমনির কাছে গিয়া বসিলেন।

"মুখের কাছে মুখ আন।" দিগ্‌গজ আশমনির মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

"হাঁ কর।" যা বলে তাই। দিগ্‌গজ আধ হাত হাঁ করিলেন। আশমনি রুমাল হইতে একটি তাম্বুল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিল; দিগ্‌গজ হাঁ করিয়া রহিলেন।

পাণ চিবাইয়া পাণের পিকে গাল পরিপূর্ণ হইলে

আশমনি সেই সমুদায় ছেপ্ দিগ্গজের হাঁর ভিতর নিক্ষেপ করিল।

দিগ্গজ এক গাল থুতু মুখের মধ্যে পাইয়া অকষ্ট বন্ধে পড়িলেন; প্রেয়সী মুখে পাণ দিয়াছে, ফেলিতে পারেন না, পাছে অরসিক বলে; গিলিতেও পারেন না, এই ভোজনের পর এক গাল থুতু কেমন করেই বা গেলেন; নীলকণ্ঠের বিষের ন্যায় গালের মধ্যেই রহিল।

এই অবকাশে আশমনি একটি খড়িকা লইয়া দিগ্-গজের বিপুল নাসিকার মধ্যে প্রেরণ করিল; হাঁছি আসিল, আর মুখ মধ্যস্থ সমুদয় অমৃত রাশি বেগে নির্গত হইয়া দিগ্গজের ক্ষীণ বপুঃ প্লাবিত করিল।

—:•:—

কপালকুণ্ডলা।

[ইতিবৃত্ত]

নাগোয়াতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন একজন কাপালিকের দর্শন পাইয়াছিলেন। তখন অনেক রাত্রি। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভৃত্যেরা সকলেই নিদ্রিত। এমন সময় বাটীর দ্বারে সবলে করাঘাত হইল। পুনঃ পুনঃ

করাঘাতে ভৃত্যেরা জাগরিত হইয়া দ্বার খুলিল। দেখিল, সম্মুখে একজন সন্ন্যাসী। ভৃত্যেরা ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "বাবুকে ডাক।" ভৃত্যেরা প্রথমে ইতস্ততঃ করিল, পরে পরামর্শ করিয়া বাবুকে উঠাইল। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী নরকপাল-হস্তে দণ্ডায়মান। তাঁহার আয়ত মুখ-মণ্ডল শ্মশ্রু-জটা-পরিবেষ্টিত, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ললাটে অঙ্গাররেখা, সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন, এ ব্যক্তি কাপালিক। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডাকিতেছ কেন?"

কাপালিক। আমার সঙ্গে এস।

বঙ্কিম। কোথায়

কাপালিক। সমুদ্রতীরে—বালিয়াড়িতে।

বঙ্কিম। আমি যাব না।

কাপালিক দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল। এবং পরদিবস নিশীথে ঠিক সেই সময়ে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ করিল; এবং পূর্ব্বানুরূপ উত্তর পাইয়া প্রস্থান করিল। তৃতীয় দিবসও আসিয়াছিল। এইরূপে

উপর্য্যুপরি তিন দিবস প্রত্যাখ্যাত হইয়া কাপালিক আর আসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সে বালিয়াড়ি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা কপালকুণ্ডলায় আছে। আমার মনে হয়, এই কাপালিক-দর্শনই কপালকুণ্ডলার ভিত্তি।

কপালকুণ্ডলা—পরিত্যক্ত অংশ।

চতুর্থ সংস্করণ কপালকুণ্ডলার শেষ দুই ছত্র ছিল,— "সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে, বসন্ত বায়ু বিক্ষিপ্ত বীচি-মালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নব-কুমার প্রাণত্যাগ করিলেন।"

পরবর্ত্তী কোনও এক সংস্করণে শেষ দুই ছত্র ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিল ; যথা—

"সেই অনন্তগঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে, বসন্ত বায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল ?"

বিষবৃক্ষ।

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ উপন্যাস। প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

* * *

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ বাবুর নিকট বলিয়াছিলেন, "কুন্দনন্দিনীর বিষ খাওয়াটা যে নীতিবিরুদ্ধ, তাহা আমি স্বীকার করি।"

শ্রীশ বাবু, বঙ্কিমচন্দ্রকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; "শুনেছি, বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা?"

বঙ্কিমচন্দ্র নাকি উত্তর দিয়াছিলেন, "কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হইয়াছে।"

হরদেব ঘোষালের পত্র দুইখানি শুনিতে পাই স্বর্গীয় জগদীশ নাথ রায় কর্ত্তৃক লিখিত।

পুস্তকখানি অতি ধীরভাবে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। এ চাঞ্চল্য—শক্তির। ইঞ্জিনে ষ্টীম হইলে ইঞ্জিনখানি

যেমন মৃদু মৃদু কাঁপিতে থাকে, এ চাঞ্চল্য তদ্রূপ। গ্রন্থকার কালিদাসের কবিতা-পাঠ-উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া পাঠকদিগকে বলিতেছেন, 'তোমরা অধৈর্য্য হইও না।' কিন্তু কবি তখন নিজেই একটু অধৈর্য্য। অগাধ ভাবরাশি তখন তাঁহার হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে—ধনী তাঁহার ধন জগতকে দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যস্ত হইবার কথাই বটে। ক্ষুদ্র এক অধ্যায়ের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়া, তাহার বৈধব্য ঘটাইয়া কবি তাঁহার ধনরাশি পরিপূর্ণ পেটিকা খুলিলেন। কালিদাস মেঘদূত লিখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে যাহা দান করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ লিখিয়া সদ্য-গঠিত বঙ্গসাহিত্যকে তদপেক্ষা অধিক ধনরত্ন প্রদান করিলেন।

বিষবৃক্ষে, ইংরাজিতে যাহাকে প্লট (Plot) বলে, তাহা নাই। বাঙ্গালা উপন্যাসে সচরাচর প্লট দেখা যায় না। বিষবৃক্ষে একস্থানে প্লটের উদ্ভব হইতেছিল, গ্রন্থকার অমনি তাহা পদদলিত করিয়া রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। যে কারণেই তিনি এরূপ করুন, বিষবৃক্ষে প্লট একেবারে নাই।

বিষবৃক্ষে কোন আড়ম্বর নাই—অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ নাই। একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মচারী একবার দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহাতে কোনও অসাধারণত্ব দৃষ্ট হয় না। সংসারে সচরাচর যাহা ঘটে, তাহা লইয়াই বিষবৃক্ষ।

গ্রন্থের তিনটি চরিত্র প্রধান,—কুন্দনন্দিনী, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রনাথ। তন্মধ্যে কুন্দনন্দিনীর চরিত্র অঙ্কন করিতে গ্রন্থকার যতটা কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, এতটা কৌশল আর কোনও চরিত্রে প্রদর্শন করেন নাই। কপালকুণ্ডলা ও ভ্রমরের চরিত্রে এই art র মাত্রা প্রচুর দেখা যায়। কুন্দনন্দিনীতেও তাই। আমরা কুন্দনন্দিনীর চরিত্রালোচনা সর্ব্বাগ্রে করিব।

কুন্দনন্দিনী।

কুন্দ স্বল্পভাষিণী, লজ্জাশীলা। নগেন্দ্র কিছু বলিলে কুন্দ "তাহার চক্ষু দুইটি নগেন্দ্রের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে, কিছুই বলে না।" ইহা কৌমারের কথা। তার অনেক দিন পরে নবযৌবনে যখন সে তাহার প্রথম স্বামী তারাচরণ কর্তৃক অনুরুদ্ধা হইয়া

দেবেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিতে আসিল, তখন সে ঘোমটা দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, অবশেষে কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। বয়সে লজ্জার মাত্রা বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঘোমটার কথা বলিতেছি না—কান্নার কথা বলিতেছি। স্বামী তাহার বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ করিতে পীড়ন করে নাই—ঘোমটা খুলিয়া দেয় নাই, তবু কুন্দ কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। অত্যধিক লজ্জায় নিপীড়িত না হইলে কেহ কাঁদিতে পারে না। তাহার মুখ অপর পুরুষকে দেখাইতে হইল, ইহাই তাহার লজ্জা বা দুঃখের কারণ।

তার পর বৈধব্যগ্রস্ত হইয়া কুন্দ, নগেন্দ্রনাথের গৃহে আসিল। সূর্য্যমুখীর নিকট তখন কুন্দের আদর কমিয়াছে। কুন্দ সূর্য্যমুখীর নিকট না থাকিয়া অন্যান্য পৌর স্ত্রীর নিকট থাকিত। কুন্দ সেই পুরবাসিনী-দিগের সংসর্গে থাকিয়াও তাহাদের মত বাক্‌পটু বা প্রগল্‌ভা হইতে পারে নাই। হরিদাসী বৈষ্ণবী গান গায়িতে আসিয়া কুন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি কিছু ফরমাস করিলে না?"

কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল,

কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, "কীর্ত্তন গায়িতে বল না।"

এ লজ্জা কি সুন্দর! কি স্বাভাবিক!

ক্ষুদ্র কথা ছাড়িয়া এবার কুন্দের হৃদয়ের পরিচয় দিব। একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে (ষোড়শ) কবি একখানি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। সঙ্ক্ষেপে তাহার পরিচয় দিব।

কুন্দ কাঙ্গালিনী,—নগেন্দ্রনাথকে সুধু দেখিবার বাসনা করে—তদ্ভিন্ন তাহার অন্য বাসনা নাই; যে গৃহে অপরিমিত ধনরাশি লুক্কায়িত আছে, কুন্দ দূর হইতে সে গৃহটি দেখিবার বাসনা করে—এতদ্ভিন্ন সে ধনলাভের প্রত্যাশা রাখে না। এমন সময় অকস্মাৎ তাহার কাণের কাছে একজন (কমলমণি) বলিয়া দিল, "ওরে, এ ধনরাশি তোর—কিন্তু এ ধনরাশি তুই স্পর্শ করিলে সূর্য্যমুখী প্রাণে বাঁচিবে না—সোণার সংসার ছারখারে যাইবে।"

কুন্দ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে শুনিল, সে অপরিমিত ধনরাশি তাহার। সে আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু যখন শুনিল যে, সে ধনরাশি স্পৃষ্ট হইলে সূর্য্যমুখী প্রাণে বাঁচিবে না, তখন কুন্দ নিজের বাসনা-কামনা পদদলিত

করিয়া, ধনের আশা বুকে চাপিয়া, বাপীসলিলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে চলিল, কুন্দ ইহলোকের সমস্ত ত্যাগ করিয়া পরলোকের পথান্বেষণে চলিল।

অসামান্য কৌশলী কবি, কুন্দকে সরোবর-সোপানোপরি বসাইয়া এক অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিলেন। উপরে ইহলোক—নীচে পরলোক, উভয়ের মধ্যস্থলে সোপানোপরি বসিয়া কুন্দ চিন্তা করিতে লাগিল, 'এখন কোন্ দিকে যাই ?' কিছুই যখন স্থির করিতে পারিতেছে না, তখন ইহলোকের সর্ব্বস্ব নগেন্দ্রকে চুপি চুপি প্রেমভরে ডাকিতে আরম্ভ করিল। ডাকিতে ডাকিতে, নগেন্দ্রকে ভাবিতে ভাবিতে কুন্দ যখন ইহকালের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া স্থির করিল, "মরা হবে না." তখন সহসা সূর্য্যমুখীর দুঃখের কথা মনে পড়িল; অমনই স্থির করিল, নগেন্দ্রকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে "কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তাই ডুবে মরি। মরিবই মরিব।" পরের মঙ্গলের জন্য ইহকালের সুখসাধসহ জীবন বিসর্জ্জন করিতে দুঃখিনী বালিকা বুকে আবার বল বাঁধিল। কিন্তু প্রবল প্রেমের সম্মুখে দুর্ব্বলা পরদুঃখকাতরতা পাছে দাঁড়াইতে না পারে,

তাই বিস্মৃত-প্রায় পরলোকের ধ্বনি সাহঙ্কারে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল,—স্বর্গারূঢ়া জননীর কথা স্মরণ হইবামাত্র কুন্দ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টার ন্যায় গাত্রোত্থান করিল, এবং 'অস্খলিত সংকল্পে' জীবন বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইল।

এমনই সময়ে—এক মহামুহূর্ত্তে—উপন্যাসের মহা-সন্ধিক্ষণে কুন্দনন্দিনীর ইহকালের সম্পদ্, কাঙ্গালিনীর অপরিমিত ধনরাশি আসিয়া কুন্দের গাত্র স্পর্শ করিল; কুন্দ অমনই সব ভুলিয়া গেল,—সূর্য্যমুখীকে ভুলিল—পরলোকগতা জননীকে ভুলিল। ইহলোকের মুকুটমণি বিজয়ী প্রেম, বীণার ঝঙ্কারে প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি হরণ করিতে লাগিল।

তখন এক অপূর্ব্ব লীলা দেখিলাম; দেখিলাম—একদিকে উদ্দাম লালসা, অপর দিকে নির্ম্মল প্রেম; একদিকে বাত্যাবিতাড়িত বারিধির ব্যোম-প্রতিঘাতী গর্জ্জন, অপরদিকে প্রভাতের কোলাহল মধ্যে প[illegible] হইতে পত্রান্তরে শিশিরবিন্দু পতনের শব্দ; একদিকে 'সহস্রবদন নিঃসৃত অপরিমিত প্রেম-পরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী বাক্যাবলী, অপরদিকে ভ্রমরগুঞ্জনপ্রতিধ্বনিবৎ সুখ

একটি মাত্র কথা। নগেন্দ্র বলিতেছেন, " 'শুন কুন্দ! এখন বিধবা-বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি'।

"কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল, 'না'।

"আবার নগেন্দ্র বলিলেন, 'কেন কুন্দ! বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?' কুন্দ আবার বলিল, 'না'। নগেন্দ্র বলিল, 'তবে না কেন? বল বল—বল আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভালবাসিবে কি না'?

"কুন্দ বলিল, 'না।'

"তখন নগেন্দ্র যেন সহস্র মুখে, অপরিমিত প্রেম-পরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন। কুন্দ বলিল, 'না'।"

ইহাই কুন্দের প্রথম প্রেম-সম্ভাষণ। চারি বৎসর পরে নগেন্দ্রের সহিত কুন্দের এই প্রথম বাক্যালাপ! এই চারি বৎসরে চারি যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এই চারি যুগের কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের পর আজ মহাদুঃখের দিনে বাপীতটে নিভৃতে উভয়ের সাক্ষাৎ। মহাদুঃখভারে নিপীড়িত হইয়া কুন্দ আজ বাপীজলে ডুবিয়া মরিতে আসিয়াছে—পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার জীবন বলি দিতে আসিয়াছে। এই দুঃখের দিনে প্রাণাধিকের

সহিত নিভৃতে কুন্দের এই প্রথম সাক্ষাৎ—এই প্রথম বাক্যালাপ। নগেন্দ্র বুঝিয়াছেন, কুন্দ তাঁহাকে ভালবাসে—কুন্দও জানিয়াছে, নগেন্দ্র তাহাকে ভালবাসেন। কুন্দ শুনিতেছে, নগেন্দ্র বলিতেছেন, " 'শুন কুন্দ! আমি বহুকষ্টে এতদিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি। মদ খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না'।"

এই প্রেম-সম্ভাষণের উত্তরে কুন্দ বলিল, "না"। নগেন্দ্র "অপরিমিত প্রেম-পরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন," কুন্দ সকল কথার উত্তরে কহিল, "না"। যাহাকে বাপীতটে দেখিবামাত্র কুন্দ আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই প্রাণাধিকের প্রেম-সম্ভাষণেও কি কুন্দর হৃদয় বিচলিত হইল না?—একটা মিষ্ট কথা, একটা প্রেমের কথাও কি বলিতে পারিল না? লজ্জা প্রযুক্তই কি বলিতে পারে নাই? শুধু একটা অর্থহীন "না", একটু নীরব রোদনই কি নগেন্দ্রনাথের আকুল হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনি?

হাঁ, তাই বটে। এই "না" কথাটি ছাড়া কুন্দ আর কিছু বলিতে পারে না। যদি বলিত, তাহা হইলে আমরা কুন্দকে চিনিতে পারিতাম না। ক্ষুদ্র একটি কথায় কুন্দ তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তাহার পরদুঃখ-কাতরতা, তাহার লজ্জাশীলতা, তাহার গভীর প্রেম, তাহার কোমলতা, তাহার ভয় যেরূপে বুঝাইয়াছে, তাহা শতাব্দী-ব্যাপী বক্তৃতাতেও বুঝাইতে পারা যায় না। এত সুন্দর কথা, এত বড় অর্থময় কথা সমুদায় বিষবৃক্ষের মধ্যে নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোনও পুস্তকে আছে কিনা সন্দেহস্থল।

কুন্দনন্দিনী-চরিত্রের সমুদায় অংশ আলোচনা করিতে হইলে একখানি পুস্তিকা লিখিতে হয়। আমরা তাহাতে নিরস্ত থাকিয়া কুন্দনন্দিনীর দুই একটি দোষের কথা মাত্র উল্লেখ করিব।

কুন্দ দারুণ অভিমানিনী। অভিমান এত বেশী যে, হিতাহিত চিন্তা করিবারও তাহার অবকাশ থাকে না। একদা সূর্য্যমুখী তাহাকে তাড়না করিলেন, কুন্দ অমনই গৃহত্যাগ করিয়া চলিল। যে কুন্দ "নিতান্ত অবলা—নিতান্ত ভীরুস্বভাবসম্পন্না," সে কুন্দ গভীর

নিশীথে একাকিনী গৃহত্যাগ করিয়া চলিল। পথ চিনে না—কোথায় যাইবে তাহা জানে না—মাথার উপর মেঘের গর্জ্জন—চারিদিকে নিশাচরের চীৎকার, কুন্দ তবু চলিল। কুন্দ এ শক্তি কোথা হইতে পাইল?

আবার যখন নগেন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুন্দের সহিত সাক্ষাতে বিরত থাকিলেন, তখন কুন্দ বিষ খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে কুন্দ বলিয়াছিল, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার এমনি করিয়া আমার নিকট বসিতে—তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আজিও আমার তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

কুন্দ মরিল অভিমানসঞ্জাত দুঃখে—গৃহত্যাগ করিল অভিমানভরে। অভিমানে অন্ধ হইয়া, দুঃখে অধীর হইয়া কুন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিস্মৃত হইল—আত্মহত্যায় যে মহাপাপ, তাহা হিন্দুর মেয়ে হইয়াও একবার ভাবিয়া দেখিল না। আর একদিন কুন্দ কমলের কথা শুনিয়া বাপী-সলিলে ডুবিয়া মরিতে আসিয়াছিল। কিন্তু সে

দিনে আর এ দিনে অনেক প্রভেদ। সে দিন কুন্দ পরের মঙ্গলার্থ আপন জীবন বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছিল, আর আজ নিজের চিন্তায় বিভোর হইয়া অসঙ্কোচে মহাপাপে লিপ্ত হইল। কুন্দ যখন বিষ পান করে, তখন সে সূর্য্যমুখীর প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ অনবগত ছিল। অতএব সূর্য্যমুখীর সুখের পথ হইতে অপসৃত হইবার মানসে কুন্দ যে বিষপান করিয়াছিল, এ কথা কোনমতেই বলা যায় না। কুন্দ নিজেই বলিতেছে, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে, তাহা হইলে আমি মরিতাম না।"

গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কুন্দকে একদিনও ধর্ম্মের কথা, ভগবানের কথা স্মরণ করিতে দেখি নাই। কুন্দ কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসিত বটে, কিন্তু সে ভালবাসায় ঈশ্বর-প্রীতি বিন্দুমাত্রও ছিল না। কীর্ত্তনের সুর শ্রুতি-মধুর, তাই হয়ত কুন্দ কীর্ত্তন শুনিতে চাহিয়াছিল।

কুন্দর চরিত্রে যদি একটুও ধর্ম্মভাব থাকিত, তাহা হইলে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে সহজে সম্মত হইত না। দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ দোষাবহ আমি বলিতেছি না—দোষাবহ কিনা, সে বিচার পণ্ডিতেরা করিবেন;

আমি বলিতেছি, যখন হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই—যখন কুন্দের আত্মীয়া বা পরিচিতাদিগের মধ্যে কেহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে, এরূপ কথা কুন্দ শুনে নাই, তখন আজন্ম-পুষ্ট সংস্কার পদদলিত করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার পূর্ব্বে কুন্দর একটু ইতস্ততঃ করা উচিত ছিল। তা' ছাড়া কুন্দ জানিত যে, যাঁহাকে সে দ্বিতীয় স্বামীরূপে গ্রহণ করিতেছে, তিনি বিপত্নীক নহেন বা পত্নী হইতে সংসৃপ্ত নহেন। এরূপ অবস্থায় পতিপরায়ণা সূর্য্যমুখীকে মর্ম্মপীড়িত করিয়া আত্মসুখের জন্য দ্বিতীয় স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইবার পূর্ব্বে কুন্দর একটু চিন্তা করা উচিত ছিল। কুন্দ বালিকা নহে—অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী; কুন্দ বুদ্ধিহীনা বা অধীরা নহে—কুন্দ স্থির বুদ্ধিশালিনী; কুন্দ পিতৃমাতৃহীনা অভিভাবকশূন্যা—কেহ বলপূর্ব্বক তাহার বিবাহ দিয়া দেয় নাই। যদি কেহ কিছু বল প্রয়োগ করিয়া থাকে, তবে সে সূর্য্যমুখী। কেন না নগেন্দ্রের মুখে আমরা শুনিলাম, "সূর্য্যমুখী উদ্‌যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে।" কিন্তু বুদ্ধিমতী কুন্দনন্দিনী কি এতই আত্মচিন্তায় প্রমত্ত ছিল যে, সে বুঝিতে পারে নাই, সূর্য্যমুখী এ উদ্‌যোগে আপন চিতাশয্যা

রচনা করিতেছে? যদি তাহা সে বুঝিয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, এক প্রেমের শক্তি ছাড়া অন্য কোনও শক্তির প্রভাব কুন্দ এ বিবাহব্যাপারে অনুভব করে নাই। এই প্রেমের শক্তি কুন্দকে আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছিল—কুন্দের অন্যান্য বৃত্তিনিচয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। যে দিন কুন্দ পরের মঙ্গল-মন্দির-দ্বারে আত্মবলি দিতে আসিয়াছিল, কুন্দের সে দিন আর নাই—কুন্দ এক্ষণে নগেন্দ্রনাথের ভালবাসা পাইয়া আত্ম-পরায়ণা ধর্ম্মহীনা হইয়াছে—সে এক্ষণে সর্ব্বধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া শুধু নগেন্দ্রনাথ-অভিলাষিণী।

আর একটা কথা কুন্দনন্দিনীর মুখে ভাল শুনায় নাই। কুন্দ বাপী-কূলে বসিয়া ভ বতেছিল, "আমার নগেন্দ্র! আ মো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্য-মুখীর নগেন্দ্র। আচ্ছা সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো।" কথাটা কি কুলবধূর উপযুক্ত এ আকাঙ্ক্ষা, এ হিংসা কোনও ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর নিকট প্রত্যাশা করা যায় না।

হিন্দু বিধবার নিকটও প্রত্যাশা করা যায় না। যতদিন না কুন্দ শুনে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত—যতদিন

না নগেন্দ্র কর্ত্তৃক বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, ততদিন কুন্দ দ্বিচারিণীর ন্যায় অন্য পুরুষের চিন্তা এরূপভাবে মনোমধ্যে আসিতে দিতে পারে না। স্বাধীনতাপ্রয়াসী সাম্যবাদীরা হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন; কিন্তু আমি চিরজাগ্রত সতীধর্ম্মের দোহাই দিয়া শতবার বলিব, কুন্দ দ্বিচারিণীর ন্যায় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যে ধর্ম্মের প্রতিধ্বনি লবঙ্গলতার মুখে শুনিয়াছিলাম, সে ধর্ম্ম হিন্দুর; যাহা কুন্দের মুখে শুনিলাম, তাহা হিন্দুর নয়—হিন্দু-সতীধর্ম্ম কখনও তাহা নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। লবঙ্গলতা বলিয়াছিলেন, "যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।" আর কুন্দনন্দিনীর মুখে কি শুনিলাম? কুন্দ নিজের স্বামীকে বিস্মৃত হইয়া পরের স্বামী কামনা করিল। এ কামনা সতীধর্ম্ম সহ্য করিতে পারে না।

সত্য বটে কুন্দ তারাচরণকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে

নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়াছিল। ভালবাসার উপর কাহারও হাত নাই—কুন্দরও হাত ছিল না, সে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। বেশ করিয়াছিল, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু কুন্দ অপরের ছায়াঙ্কিত হৃদয় লইয়া কিরূপে তারাচরণের সহধর্ম্মিণী হইল? বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে কোনও দিন কি কুন্দ তারাচরণকে তাহার হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিল? কাণা ফুলওয়ালী রজনী, কুন্দকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারিত—বলিতে পারিত, ভবিষ্যৎ-স্বামীকে মুক্তকণ্ঠে বল, "আমার এই পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত।" * কুন্দ তাহা বলে নাই; না বলিয়া তাহার কলুষিত হৃদয় লইয়া তিন বৎসর স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হইয়া রহিল।

তার পর কুন্দ বিধবা হইল। তখন তাহার বয়স সতর বৎসর। সতর বৎসর বয়সে কুন্দ বেশ বুঝিয়াছে, হিন্দু সতী-ধর্ম্ম কি, হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য কি। কিন্তু একদিনও তাহাকে সে কর্ত্তব্য পালন করিতে দেখি নাই—একদিনও তাহাকে মৃতস্বামীর ধ্যানানুরত দেখি নাই। অধিকন্তু মনে হইল, কুন্দ যেন স্বামীর মৃত্যুতে সুখী

* রজনী—পঞ্চম খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ।

হইল—নিষ্কৃতি লাভ করিল—লাগাম ছাড়িয়া নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতে পারিল। এ রকম মেয়ে, এ রকম বধূ হিন্দু-গৃহে দেখিতে বাসনা করি না।

তাই বলিতেছিলাম, কুন্দনন্দিনীর চরিত্রে সকল সদ্‌গুণ আছে, কেবল ধর্ম্মভাবের অভাব। কবি ইচ্ছাপূর্ব্বকই কুন্দকে এ ভাব দেন নাই। যদি দিতেন, তাহা হইলে ঘটনার সামঞ্জস্য থাকিত না। কুন্দ সৌন্দর্য্যে তিলোত্তমা, কোমলতায় শেলির লজ্জাবতী লতা, সারল্যে মিরান্দা, প্রেমে শকুন্তলা—কিন্তু এক ধর্ম্মভাবের অভাবে কুন্দ, শৈবলিনী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চে অধিষ্ঠিত।

এই ত গেল সংসারীর কথা; তা'ছাড়া কুন্দ-চরিত্রের আর এক দিক্ আছে। কুন্দ সংসারের কিছু জানে না—সমাজ-বন্ধনের ধার ধারে না; প্রাণ যাহাকে চায় তাহাকে সে ভালবাসে। কুন্দ প্রাণ ভরিয়া নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসিল। তারপর তারাচরণকে বিবাহ করিল। তারাচরণ মরিয়া গেল, কুন্দ ফিরিয়া আসিয়া আবার নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতে লাগিল। সাম্যবাদীরা বলেন, এ ভালবাসায় কোন দোষ নাই; কেন না, "স্বাধীন মকরকেতু, স্বাধীন প্রণয়।" আমরা বলি, কুন্দ-

নন্দিনী দূর হইতে দেখিতেই ভাল—কাব্যে, উপন্যাসে, আকাশপথে, সাম্যবাদীর গৃহে সে "শরীরী চন্দ্রকর" বিরাজ করুক, কিন্তু আমাদের হিন্দু-গৃহে—সূর্য্যালোকে সে "চন্দ্রকরের" প্রয়োজন নাই। তাই কি কুন্দ মরিল?

কুন্দ ও সূর্য্যমুখীর চরিত্র তুলনা করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"কুন্দ চটুল স্রোতস্বিনী, সূর্য্যমুখী গভীর সমূদ্র। * * * অম্লানবদনে সূর্য্যমুখী সুন্দরতম; কুন্দ সুন্দর বলিতে মন উঠে না—কেমন বাধো বাধো ঠেকে। * * * কুন্দর ভালবাসা স্বার্থবিজড়িত না হউক, কিন্তু নিঃস্বার্থপরতার পূর্ণ বিকাশ নহে। পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার সুখ বলি সূর্য্যমুখী সহজেই পারে, কুন্দ একটু ইতস্ততঃ করে, আপনার সুখের দিকে ছল্‌ছল্ নেত্রে একবার ফিরিয়া তাকায়। * * * কুন্দ নয়ন দিয়া দেখিবার সামগ্রী—হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার সামগ্রী নহে। কুন্দ বাহিরের সৌন্দর্য্য, তাহাকে লইয়া ঘরকন্না চলে না। কুন্দ মানবী, বালিকা,—আমরা তাহাকে স্নেহ করি, ভালবাসি, তাহার জন্য অশ্রু ফেলি। সূর্য্যমুখী—দেবী, সংসারী, তাঁহাকে

ভালবাসি, ভক্তি করি, প্রণাম করি। সূর্য্যমুখী বঙ্গনারীর অলঙ্কার, বঙ্গভূমির অহঙ্কার, নারী-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। * * * বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত আলোচনা করিয়া অনুমান করিতে পারা যায় যে, লজ্জাশীলা ভক্তিমতী পতিব্রতা স্ত্রীই বাঙ্গালীর নারী হৃদয়ের আদর্শ। বাঙ্গালী স্ত্রীর পাতিব্রত্যই ধর্ম্ম। ভালবাসা পাইবার জন্য হৃদয়ের কাতরতা, কিংবা যাহাকে ভালবাসি, তাহার উপেক্ষায় মর্ম্মদহন, পাতিব্রত্যের লক্ষণ নহে—সুখে দুঃখে স্বামীর সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ একীকরণই পাতিব্রত্যের লক্ষণ।" *

সূর্য্যমুখী।

সূর্য্যমুখী রমণী-কুল-রত্ন। রূপ, গুণ যথেষ্ট। তাহার বাহির যেমন, অন্তর তেমন। তাহার পবিত্র হৃদয়ে অসীম প্রেম; এ প্রেমের সবটুকুই স্বামী-চরণে সমর্পিত। নীলাকাশ-প্রতিবিম্বিত-নীলাম্বু-হৃদয়বৎ সূর্য্যমুখীর হৃদয় স্বামীর ছায়াতে পূর্ণ—স্বামী ছাড়া তাহার হৃদয়ে আর কিছু নাই। স্বামী তাহার সঙ্গী, সাথী, ক্রীড়া-সহচর;

* প্রসঙ্গ।

স্বামী তাহার ধ্যান, জ্ঞান, সুখ, শান্তি; স্বামী তাহার বাসনা, কামনা, ইহকাল, পরকাল। যে ভক্তি ও প্রেম সূর্য্যমুখী স্বামী-পদে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সে ভক্তি ও প্রেম ঈশ্বরেরও বাঞ্ছনীয়। যে আত্মবিস্মৃতি লইয়া সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভালবাসিয়াছিলেন, সে আত্মবিস্মৃতি কুন্দনন্দিনীর পক্ষেও দুর্ল্লভ। সূর্য্যমুখী জীবনধারণ করিয়াছিলেন, স্বামীর সুখের জন্য—মরিলে পাছে তাহার দুঃখ বাড়ে,তাই সূর্য্যমুখী মরেন নাই। সমুদয় গ্রন্থমধ্যে যদি কেহ পরের মঙ্গলমন্দিরে আত্মবলি দিয়া থাকে, তবে সে সূর্য্যমুখী। সূর্য্যমুখী আদর্শ রমণী, আদর্শ স্ত্রী।

আদর্শ—যত দিন সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করেন নাই। যে দিন তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, সেই দিন তিনি আদর্শ রমণীর সিংহাসন হইতে বিদূরিতা হইলেন। বঙ্গকুলবধূ কোন অবস্থাতেই গৃহত্যাগ করিতে পারে না। শুধু বঙ্গকুলবধূ কেন, কোন সভ্যজাতির কোনও কুলবধূ পারে না। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া নিজ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখাইলেন। এ দুর্ব্বলতা অমার্জ্জনীয়।

বিষবৃক্ষ—পরিত্যক্ত অংশ।

এই পুস্তকের বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বঙ্গদর্শনে যে অবস্থায় বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হইয়াছিল, শেষ সংস্করণেও বিষবৃক্ষের প্রায় তদ্রূপ অবস্থা রহিয়া গিয়াছে। দুই এক স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিত্যক্ত অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শুনে কীচক মেরে উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।—ইহার পরে ঃ—

আর একজন কোথা হইতে গায়িল ঃ—

আমার নাম হীরা মালিনী,
মাতাল হয়ে বাচাল হলো, দেখিতে
নারি আমি ধনী।

দেবেন্দ্র জড়ীভূত কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! তুমি ধনী কে? ভূত না প্রেতিনী?"

তখন ঠুন! ঠুন ঝনাৎ! প্রেতিনী আসিয়া বাবুর কাছে বসিল। প্রেতিনীর ঢাকাই সাড়ী পরা, হাতে বাজু বালা, কালো চুড়ি; গলায় চিক, কণ্ঠমালা, কানে ঝুমকা, কাঁকালে গোট; পায়ে ছয় গাছা মল

গায়ে আতর গোলাবের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। দেবেন্দ্র প্রেতিনীর মুখের কাছে আলো ধরিলেন। চিনিতে পারিলেন না। চুপি চুপি মনের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবা কোন্ গাছ থেকে?" শেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "পারলেম্ না বাপ্!" * * *

হীরা স্বচ্ছন্দে দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছ, বৈষ্ণবী দিদি?"

তখন মাতাল বলিল, "বৈষ্ণবী দিদি! ও বাবা ও গাঁয়ের দত্ত বাড়ীর পেত্নী নাকি?"

এই বলিয়া আবার আলো স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। বলিল, "তারপর মালিনী মাসী—কি মনে কোরে?"

হীরা বলিল, "মনে করে আর কি? দত্তের বাড়ী এক ডাকাতে দিনে ডাকাতি করিয়া এসেছে, তাই ডাকাত ধরতে এয়েছি।"

শুনিয়া বাবু গান ধরিলেন।

"আমার আঁটা ঘরে সিঁধ মেরেছে,
কোন্ ডাকাতের এ ডাকাতি।

যৌবনের জেলখানাতে রাখ্‌বো

তারে দিবারাতি ॥

মন বাক্‌শ তার লজ্জা তালা,

কল কোরে তার ভাঙ্গলো ডালা,

লুটে নিলে প্রেমনিধি তার,

ভাঙ্গা বাক্‌শে মেরে নাতি ॥

তা, ডাকাতি করতে গিয়ে থাকি, গিয়েছি বাপ্‌—কিন্তু হীরা মতির জন্যে নয়, কেবল ফুলটা ফলটা খুঁজি।"

হীরা। কি ফুল—কুন্দ ?

দে। Hurrah! কুন্দ কলি!—Three cheers for কুন্দনন্দিনী! বদ্ধ্যাতে মন্দ জাতিকং! কুন্দনন্দি-ন্দি-ন্দিনী!

বলিয়াই গীত।—

কুন্দকলি মন্দ বলি নিন্দে করে কাল ভ্রমরা—

তবে—ঘেঁচুবনের মেঠো মালিনী মাসি, কি মনে কোরে ?

হী। কুন্দনন্দিনীর কাছ থেকে।

দে। Hurrah! Hurrah! for কুন্দনন্দিনী। বল, বলত, বলত কি বলিয়া পাঠিয়েছে ? না হবে কেন ? আজ তিন বৎসরের পীরিত।

হীরা বিস্মিত হইল। আরও বিশেষ শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিল :—"এতদিনের পীরিত তাহা জান্‌তেম না। প্রথম পীরিত হলো কেমন করে?"

দে। আরে, ভারি নাকি শক্ত কথা! তারার সহিত বন্ধুতা থাকাতে তাকে বলিলাম, বউ দেখা—তা' সে বউ দেখালে। সেই অবধি পীরিত। কিন্তু এক গেলাস খাও বাপ্‌ সুধু মুখে আর ভাল লাগে না।

দেবেন্দ্র তখন এক পাত্র ব্রাণ্ডি হীরার হাতে দিল। হীরা তাহা হাতে করিয়া আবার নামাইয়া রাখিল, জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?"

দে। তারপর তোমাদের গিন্নীর জ্বালায় দিন কত দেখা শুনা হয় নাই। তারপর এখন বৈষ্ণবী হয়ে যাতায়াত করিতেছি। ছুঁড়ি বড় ভয় তরাসে; কিছুতে কথা কয় না। তবে আজি যে রকম কুশলে এয়েছি, তাহা ছাড়ায় না—না হবে কেন—আমি দেবেন্দ্র।—অহং দেবেন্দ্র বাবু—হেউ! শিখে হো ছল ভেলা নট নাগর তারপর মালিনী মাসি? কি বলিয়া পাঠ্‌য়েছে? ভাল আছ ত, মালিনী মাসি? প্রাতঃ প্রণাম।

হীরা প্রায়বরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে দেবেন্দ্রের এই সকল

কথা বাহির হইতে শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। পরে হাসি সম্বরণ করিয়া বলিল, "রাত্রি ঢের হইল, এখন প্রণাম হই।" এই বলিয়া হীরা মৃদু হাসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া, প্রস্থান করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

(অনাথিনী)

"ও সূর্য্যমুখি! রাক্ষসি! ওঠ! দেখ আপনা কীর্ত্তি দেখ! অনাথিনীকে ফেরাও"।

আনন্দমঠ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ইংরাজদের কিরূপ ধারণা তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে Encyclopædia Britannica হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম :—

"Of all his (Bankim Chandra's) works, however, by far the most important from its astonishing political consequences was

the *Ananda Math*, which was published in 1882, about the time of the agitation arising out of the Ilbert Bill. † † † The general moral of the *Ananda Math*, then, is that British rule and British education are to be accepted as the only alternative to Musalman oppression, a moral which Bankim chandra developed in his *Dharmatattwa* † † † But though the *Ananda Math* is in form an apology for the loyal acceptance of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration, sooner or later, of a Hindu Kingdom in India. This is especially evident in the occasional verses in the book, of which the *Bande Mataram* is the most famous."

শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন,—"বিখ্যাত সমালোচক কোলরিজ সেক্‌স্‌পিয়ারের "রিচার্ড দি সেকেণ্ড"—নামক নাটকে ইংলণ্ডের স্তুতিবাদ পাঠ করিয়া

বলিয়াছিলেন যে, "রিচার্ড দি সেকেণ্ড" আর কোনও সৌন্দর্য্য না থাকিলেও, এই স্তোত্র উহাকে ইংরাজি সাহিত্যে এক অমূল্য পদার্থে পরিণত করিত। আমরাও সেইরূপ বলিতে পারি যে, সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার আনন্দমঠে সৌন্দর্য্যের লেশ মাত্র না থাকিলেও, কেবল "বন্দে মাতরম্" গীতের জন্য, আনন্দমঠ, বাঙ্গলা সাহিত্য-জগতে এক অমূল্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইত।" *

আনন্দমঠে অনেক সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা একখানি তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস মাত্র; কেন না, ইহাতে নৈপুণ্য—ইংরাজিতে যাহাকে art বলে, তাহা খুব কম। আনন্দমঠ স্বদেশ-প্রেমে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু ইহাতে ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব বড় বেশী নাই। তবু আনন্দমঠে যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা কোনও গ্রন্থে নাই,—কেন না ইহা inspired—অনুপ্রাণিত—সজীব।

---

* স্বদেশ প্রতিমা।

সমালোচনা।

"বঙ্কিম, তুমি মাতার সুসন্তান; তুমি বঙ্গের নরকান্ধকারে শাপভ্রষ্ট দেবতা। কেন না, তুমি যে উদ্দেশ্য বুকে ধরিয়া, যে আগুণ লেখনীতে মাখিয়া আনন্দমঠ লিখিতে বসিয়াছিলে, তাহা সপ্তম স্বর্গের মহামৃত অপেক্ষাও পবিত্র এবং দুর্লভ। আজ বঙ্গের সপ্তকোটী হৃদয়-তন্ত্রীর তারস্বর তোমার স্বরে মিলিত, সপ্তকোটী প্রাণ তোমার জ্বলন্ত প্রাণে অনুপ্রাণিত। আজ দ্বিসপ্ত কোটী সজল চক্ষু স্বর্গের দিকে রাখিয়া দ্বিসপ্তকোটী হস্ত তুলিয়া সমস্ত বঙ্গের নরনারী তোমাকে নীরব গম্ভীরে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। তুমিই ধন্য এবং কৃতার্থ।

* * * *

"লেখক ভূমিকা বা বিজ্ঞাপনে যে তিনটি কথা বলিয়াছেন, এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিন্তু তাহার একটিও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। বাঙ্গালীর স্ত্রী যে অবস্থাবিশেষে বাঙ্গালীর সহায় নয়, এ কথা গ্রন্থোল্লিখিত কোন স্ত্রীচরিত্রে প্রদর্শিত হয় নাই।

"শান্তি দেবী, দানবী, মানবী, পিশাচী রাক্ষসী যাহা খুসী হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে নয়—একশ সওয়াশ বৎসর পূর্ব্বের বীরভূম অঞ্চলের বাঙ্গালীর কুল-বধূ, অথবা আজ কালকার নবীনা বঙ্গবাসিণীও নয়। তবে শান্তির সাহায্যে বা তদভাবে বাঙ্গালীর কি? কল্যাণী যেমন স্বামীর অসহায় নয়, তেমনি সহায়ও নয়। কার্য্যক্ষেত্রে তাহার কোন কার্য্য নাই। 'সমাজ বিপ্লব, অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র।' জয়োৎ-ফুল্ল সন্তানদিগের লুটপাটে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু 'বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী' এ কথার প্রকৃত অর্থযুক্ত কোন দৃষ্টান্ত গ্রন্থে নাই।

"আনন্দমঠে মানবচরিত্রের ক্রমবিকাশের কোন চিত্র নাই। এ বাগানের মালী, আস্ত আস্ত, বড় বড় ফুটন্ত ফুলগুলি দিয়া স্বপ্নের রাজ্যে বসিয়া মালা গাঁথিতেই সুপটু। কিন্তু একটীও অস্ফুট কলিকা ফুটাইয়া পাঠকের প্রাণে তাহার বৈচিত্র্য অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। কবি, জীবানন্দ ও ভবানন্দের চরিত্র কিছু বিচিত্র করিতে চাহিয়াছেন। জীবানন্দকে আঁকিবার সময় তুলি আঁকা বাঁকা হইয়া চিত্রকরের

হাতের কাঁচাম প্রকাশ করিয়াছে। নিমাইএর ঘরেই প্রথমে এই ছবির গলদ ধরা পড়িয়াছে। * * তৎপরে আনন্দমঠে শান্তির সঙ্গে কলহকালে এই কালিমা ঘনতম হইয়াছে। * * ভবানন্দের চরিত্র, এর অপেক্ষা স্বাভাবিক বোধ হইল। * *

"শান্তির অবতারণা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হইয়াছে। এই নিষ্ফলতার সঙ্গে সঙ্গে জীবানন্দ, ভবানন্দের পতনও অর্থশূন্য হইয়াছে বলিলেও দোষ হয় না। * *

"সত্যানন্দের চরিত্র কিছু স্বপ্নময়, কিছু ঐন্দ্রজালিকতা-পূর্ণ, কিন্তু আসক্তিবর্জ্জিত, এবং কার্য্যময়। তাঁহার হৃদয়ে মাতৃভক্তি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং তেজ একত্র সমাবিষ্ট, জটিলতা-ভেদী তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সরলতাময় অন্তর তাঁহার উচ্চ ভূষণ। কিন্তু * * অদ্ভুত চরিত্রে জনসমাজের উপকার অল্পই হয়। আনন্দমঠের চরিত্রগুলির প্রায়ই পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। সত্যানন্দের চরিত্রও কবি ভাল করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই।

"জীবানন্দের প্রায়শ্চিত্তের খেলা খেলিয়া বাঙ্গালীর কুসুম-কোমল প্রাণের দুর্ব্বলতা না দেখাইলেই ভাল হইত। জীবানন্দের মৃতদেহ বাঁচাইয়া চারি কুল রাখিতে

গিয়া, সকল কুলের ধ্বংস হইয়াছে। এ প্রতিজ্ঞা নয়, এ প্রায়শ্চিত্ত নয়, সুধু ফাঁকি। * *

"কবি নিজ কলমে আনন্দমঠকে উপন্যাস বলিয়া কোথাও কিছু বলেন নাই। সাধারণের বিশ্বাসানুসারে আমরা এই গ্রন্থকে উপন্যাস মনে করিয়াছি। উহাকে রূপকময় আখ্যায়িকা বলিলেও বলা যায়, কিন্তু তাহাতে আনন্দমঠের গৌরব কিছুই থাকে না।" *

সুদীর্ঘ সমালোচনার অত্যল্প অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। সমালোচক মহাশয়ের সহিত সকল বিষয়ে একমত হইতে না পারিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সুবিবেচক।

বন্দে মাতরম্।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে, একদা আমার ভগিনী (বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা) তাঁহার পিতার নিকট "বন্দে মাতরম্" গানের কথা তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "একদিন দেখিবে

* নব্য-ভারত, ১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত।

—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এই গান লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে—বাঙ্গালী মাতিয়াছে।”

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে আমি এই গল্পটি আমার ভগিনীর নিকট শুনিয়াছিলাম।

বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিতেছেন, “একদিন সন্ধ্যার পর গিয়া দেখি অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সমাগম হইয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বাবু, নবীন বাবু প্রভৃতি। নবীন বাবু কথায় কথায় আনন্দমঠের সুপরিচিত “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীতটির একাংশ আবৃত্তি করিয়া বঙ্কিম বাবুকে বলিলেন, ‘এমন ভাল জিনিসটীকে আধ সংস্কৃত, আধ বাঙ্গলায় লিখিয়া মাটী করা হইয়াছে; এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। লোকের ভাল লাগে না। বঙ্কিম বাবু ঈষৎ কুপিত স্বরে বলিলেন—‘আচ্ছা ভাই, ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল লেগেছে, তাই ও রকম লিখিছি। লোকের ভাল লাগে কিনা ভেবে আমি লিখ্‌ব’!” *

“বন্দে মাতরম্” শব্দের অর্থ লইয়া ইংলণ্ডে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা

* সাধনা, তৃতীয় বর্ষ।

বলেন, ইহার মর্ম্মার্থ—"Hail to thee, Mother!" কিংবা "I reverence thee, Mother!" Dr. G. A. Grierson বলেন, "হিন্দুধর্ম্মের কোনও দেবীর উদ্দেশে—সম্ভবতঃ সংহারকর্ত্রী কালীর উদ্দেশে এই গান লিখিত হইয়াছে," * সার হেনরি কটন প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতটি জননী বঙ্গভূমির আবাহন মাত্র।" † W. H. Lee এই গানটির যে মর্ম্মানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা কটন সাহেবের মতের পোষকতা করে। J. D. Anderson লিখিলেন,—"আনন্দমঠের ১ম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যাইতেছে, বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা কালী-প্রতিমার পূজা করিয়া বলিতেছে, মা—যা হইয়াছেন; আর একটি মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমাকে দেখাইয়া বলিতেছে, মা—যা হইবেন। বন্দে মাতরম্ স্তোত্র এই দুই প্রতিমাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে।" ‡

বিলাতে বসিয়া S. M. Mitra বলেন, "Bankim Chandra composed it in a fit of patriotic ex-

* লণ্ডন টাইমস্, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬।

† ঐ ঐ ১৩ই ঐ ঐ।

‡ লণ্ডন টাইমস্, ২৪এ সেপ্টেম্বর ১৯০৬।

citement after a good hearty dinner, which he always enjoyed." *

এইরূপ নানা মত সঙ্কলন করিয়া ব্রিটানিকা বলিতেছেন, "The poem, then, is the work of Hindu idealist who personified Bengal under the form of a purified and spiritualised Kali. * * * Lines 10, 11 and 12 are capable of very dangerous meanings in the mouths of unscrupulous agitators. * *

"During Bankim Chandra's lifetime the *Bande Mataram*, though its dangerous tendency was recognised, was not used as a party war-cry; it was not raised, for instance, during the Ilbert Bill agitation, nor by the students who flocked round the court during the trial of Surendra Nath Banerji in 1883. It has, however, obtained an evil notoriety in the agitation that followed the partition

* Indian Problems, London, ১৯০৪.

of Bengal. That Bankim Chandra himself foresaw or desired any such use of it is impossible to believe."

বাঙ্গালী বেশ জানে, "বন্দে মাতরম্" গানের অর্থ কি; বাঙ্গালী জানে, গানের ভিতর বিদ্রোহবহ্নির ধূম নাই—সংহারকর্ত্রী কালীরও আবাহন নাই; গানটি জন্মভূমির স্তোত্র মাত্র। জন্মভূমিকে জননীরূপে—আরাধ্যাদেবীরূপে—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সর্ব্বক্ষমতাময়ী প্রকৃতি-রূপে কল্পনা করিয়া কবি তাঁহার আবাহন গাহিতেছেন। কমলাকান্ত যে প্রতিমার পূজা করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সত্যানন্দও সেই প্রতিমার আবাহন গাহিয়াছিলেন। উভয়ের মন্ত্র এক, হৃদয় এক, প্রতিমা এক। একজন ডাকিতেছিলেন, "মা" "মা" রবে; আর একজন গাহিতেছিলেন, "বন্দে মাতরম্।" একজন ভক্তের প্রতিমা—"রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত।"* আর একজন ভক্তের প্রতিমাও তাই,—

* কমলাকান্তের দপ্তর, একাদশ পরিচ্ছেদ।

"দশভুজ দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়ণে নিযুক্ত।" * একজন বলিতেছেন, "এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজ দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব।" আর একজন বলিতেছেন, "এই মা যা হইবেন।" একজন বলিতেছেন, "এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিনী—অনন্তরত্নভূষিতা—"আর একজন গাহিতেছেন, "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরং।" এক জন যে হৃদয় লইয়া গাহিতেছেন, "জয় জয় ভক্তি শক্তি দায়িকে," আর একজনের হৃদয়েও সেই সুর প্রতিধ্বনিত হইয়া শব্দতরঙ্গ উঠিতেছে,—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।"

তাই বলিতেছিলাম, উভয়ের—কমলাকান্ত ও সত্যানন্দের—মন্ত্র এক, হৃদয় এক, প্রতিমা এক।

---

* আনন্দমঠ, প্রথমখণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ।

ধ্যানে বা কল্পনায় বা মন্ত্রে দোষ নাই, দোষ—মন্ত্রের অসদ্ব্যবহারে, দোষ—দেশকালপাত্রে। বঙ্কিমচন্দ্র কোনও দিন মনে স্থান দেন নাই যে, তাঁহার আরাধ্য দেবীর পূজার মন্ত্র একদিন নরঘাতী বর্ব্বরের মুখে ধ্বনিত হইবে; কিন্তু তিনি ইহা বেশ জানিতেন, একদিন না একদিন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ভক্তি-পূর্ব্বক ধ্বনিত হইয়া বাঙ্গালায় নূতন জীবন আনিবে—নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিবে। কেমন করিয়া জানিতে বা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা জানি না, তবে দুই এক জনের নিকট এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

কাঁটালপাড়া নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিশ বৎসর আগেকার একটি কথা বলিয়াছেন, তিনি সে সময় বঙ্গদর্শনের কার্য্যাধ্যক্ষ, অথবা প্রুফ-রিডার অথবা এমনই একটা কাজ লইয়া বঙ্গদর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, একদা তিনি বঙ্গদর্শনের কাপি চাহিতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "কাপি লেখা নাই।" রাম বাবু বলেন, "কাপির অভাবে কাজ বন্ধ আছে।" বঙ্কিমচন্দ্র তখন নাকি ঝটিতি "বন্দেমাতরম্" গানটি লিখিয়া দিলেন।

আমার বিশ্বাস, এ গান ঝটিতি লিখিবার নয়। ধ্যানস্থ না হইলে—তন্ময় না হইলে—অনুপ্রাণিত না হইলে এ গান লেখা যায় না। তা' ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ লেখকদিগের ন্যায় যা'-কিছু-একটা লিখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ছাপাইতে দিতেন না।

বন্দেমাতরম্ গানের একটা ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে দত্ত হইল। এ অনুবাদ সাহেবের নয়—বাঙ্গালীর। অনুবাদকারী নিজের নাম গোপন করিয়া রাম শর্ম্মা নামে পরিচয় দিয়াছেন।

•

Mother, to thee I bow!
Rich with fine streams and fruits art thou!
Cool breezes, cornfields green, are thine,
Mother mine!

The silver thrilling moonlight night,
Gay groves with blooms and flowers bedight!
Sweet smiles, mellifluous speech, are thine,
Giver of bliss and boons benign,
Mother mine!

With many million ardent throats,
Singing thy praise with swelling notes
With many million sturdy hands,
Defending thee with sharpen'd brands,
How art thou weak, when these are thine,
Mother mine!
Yes, might immense is thine,
From throng on throng of ruthless foes,
From perils dire, and whelming woes,
Defender and Deliverer thou!
To thee I bow,
Mother mine!
Wisdom and Righteousness thou art!
Thou, sovereign spirit of the heart,
And vital air within!
Thou givest vigor to the arm,
And to the breast devotion warm;
In every home, in every shrine,
The image all adore is thine,
Mother mine!

Thou, ten-armed Durga, whom fell demons
fear !

Thou, lotus-ranging Lakshmi, ever dear !
Goddess of Art, bright Saraswati thou !
To thee I bow !

O Fortune's Pow'r divine !
Faultlessly fair,
Beyond compare,
Rich with fine streams and fruits art thou ,
Mother mine !

Mother, to thee I bow !
With robe of green, devoid of guile,
With grace adorn'd and lovely smile,
Earth ever bounteous, thou !
Nourisher, cherisher benign,
Mother mine !

আনন্দমঠ—পরিত্যক্ত অংশ।

প্রথম সংস্করণ—পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শান্তি। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছতলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কৃষ্ণাজিন বিস্তারণপূর্ব্বক, তদুপরি শয়ন করিল।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ ঠাকুর প্রত্যাগত হইলেন। হরিণচর্ম্মের উপর মানুষ শুইয়া আছে, ক্ষীণ প্রদীপালোকে অতটা ঠাওর হইল না। জীবানন্দ তাহারই উপরে উপবেশন করিতে গেলেন। উপবেশন করিতে গিয়া শান্তির হাঁটুর উপর বসিলেন। হাঁটু অকস্মাৎ উচু হইয়া জীবানন্দকে ফেলিয়া দিল।

জীবানন্দের একটু লাগিল। জীবানন্দ উঠিয়া একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কে হে তুমি বেল্লিক?"

শান্তি। আমি বেল্লিক না, তুমি বেল্লিক। মানুষের হাঁটুর উপর কি বসবার জায়গা?

জীব। তা কে জানে যে তুমি আমার ঘরে চুরি করিয়া শুইয়া আছ?

শান্তি। তোমার ঘর কিসের?

জীব। কার ঘর?

শান্তি। আমার ঘর।

জীব। মন্দ নয়, কে হে তুমি?

শান্তি। তোমার বোনাই।

জীব। তুমি আমার হও না হও, আমি তোমার বোধ হইতেছে। তোমার গলার সঙ্গে আমার ব্রাহ্মণীর গলার একটু সাদৃশ্য আছে।

শান্তি। বহুদিন তোমার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার একাত্মভাব ছিল, সেই জন্য বোধ হয় গলার আওয়াজ এক রকম হয়ে গেছে।

জীব। তোর যে বড় জোর জোর কথা দেখ্‌তে পাই? মঠের ভিতর না হতো এক ঘুষোয় দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিতুম।

শান্তি। দাঁত ভেঙ্গেছে অনেক সাঙাত। কাল রাজনগরে কটা দাঁত ভেঙ্গেছিলে, হিসাব দাও দেখি। বড়াইয়ে কাজ নেই; আমি এখানে ঘুমুই।

তোমরা সন্তানের দল, লেজ গুটিয়ে, বামুন ঠাকরুণদের আঁচলের ভিতর লুকোওগে ।

এখন জীবানন্দ ঠাকুর কিছু ফাঁপরে পড়িলেন। মঠের ভিতর সন্তানে সন্তানে মারামারি করা সত্যানন্দের নিষেধ। কিন্তু এরও বড় মুখের দৌড়, দু ঘা না দিলেও নয়। রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। অথচ গলার আওয়াজটা মধ্যে মধ্যে বড় মিঠা লাগিতেছে, যেন কি মনে হয়, যেন কে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া ডাকিতেছে, আর বলিতেছে, এলেই ঠ্যাঙে লাঠি মারবো। জীবানন্দের উঠিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না, বসিতেও পারেন না। ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন, "মহাশয়, এ ঘর আমার, চিরকাল ভোগদখল করিতেছি, আপনি বাহিরে যান।"

শান্তি। এ ঘর আমার, চিরকাল ভোগ দখল করিতেছি, আপনি বাহিরে যান।

জীব। মঠের ভিতর মারামারি করিতে নাই বলিয়াই লাথি মারিয়া তোমায় নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিই নাই, কিন্তু এখনি মহারাজের অনুমতি আনিয়া তোমায় তাড়াইয়া দিতে পারি।

শান্তি। আমি মহারাজের অনুমতি আনিয়াই তোমায় তাড়াইয়া দিতেছি। তুমি দূর হও।

জীব। তাহা হইলে এখন তোমার। মহারাজকে কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি; আগে বল, তোমার নাম কি।

শান্তি। আমার নাম নবীনানন্দ গোস্বামী, তোমার নাম কি?

জীব। আমার নাম জীবানন্দ গোস্বামী।

শান্তি। তুমিই জীবানন্দ গোস্বামী। তাই এমন?

জীব। তাই কেমন?

শান্তি। লোকে বলে, আমি কি কর্‌বো?

জীব। লোকে কি বলে?

শান্তি। তা' আমার বল্‌তে ভয়ই কি? লোকে বলে জীবানন্দ ঠাকুর বড় গণ্ডমূর্খ।

জীব। গণ্ডমূর্খ, আর কি বলে?

শান্তি। মোটা বুদ্ধি।

জীব। আর কি বলে?

শান্তি। যুদ্ধে কাপুরুষ।

জীবানন্দের সর্ব্ব শরীর রাগে থর্‌ থর করিতে লাগিল, বলিলেন, "আর কিছু আছে?"

শান্তি। আছে অনেক কথা—নিমাই বলে আপনার একটি ভগিনী আছে।

জীব। তুমি বড় বেল্লিক হে—

শান্তি। তুমি ভল্লুক হে।

জীব। তুমি উল্লুক, অর্ব্বাচীন, নাস্তিক, বিধর্ম্মী, ভণ্ড, পামর!

শান্তি। তুমি—যলায় বায়াবোচীচঃ,—তুমি স্বশ্চ্ছিশ্চ্ শাৎ—তুমি ষ্টূত্তিষ্ট্ যাদাস্নটোঃ।

জীব। বের শালা এখান থেকে—তোর দাড়ি ছিঁড়িব।

শান্তি তখন গণিল প্রমাদ! দাড়ি ধরিলেই মুস্কিল! পরচুলো খসিয়া পড়িবে। শান্তি সহসা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নে তৎপর হইল।

জীবানন্দ পিছু পিছু ছুটিল। মনে মনে ইচ্ছা ভণ্ড মঠের বাহিরে গেলে দুই ঘা দিব। শান্তি যাই হউক স্ত্রীলোক—দৌড়ধাপে অনভ্যস্ত। জীবানন্দ এ সকল কাজে সুশিক্ষিত। শীঘ্র গিয়া শান্তিকে ধরিল, এবং তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া প্রহার করিবে বলিয়া তাহাকে কায়দা করিয়া জাপ্টাইয়া ধরিতে গেল।

স্পর্শমাত্রেই জীবানন্দ চমকিয়া শান্তিকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু শান্তি বাহু দ্বারা জীবানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিল।

জীবানন্দ বলিল, "একি! তুমি যে স্ত্রীলোক! ছাড! ছাড়! ছাড়!" কিন্তু শান্তি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো, তোমরা দেখ গো! এক জন গোঁসাই জোর করিয়া স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিতেছে।"

জীবানন্দ তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! অমন কথা মুখে এনো না। ছাড়! ছাড়! আমার ঘাট হয়েছে, ছাড়!"

শান্তি ছাড়ে না; আরও চেঁচায; শান্তির কাছে জোর করিয়া ছাড়ানও সহজ নয়। জীবানন্দ যোড়হাত করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার পায়ে পড়ি, ছাড়।" শেষ স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে অরণ্য পরিপূরিত হইয়া গেল।

এ দিকে মঠের গোঁসাইরা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া, অনেকে ঘুমুচির ভিতর প্রদীপ জ্বালিয়া লাঠি সোঁটা লইয়া বাহির হইলেন।

দেখিয়া জীবানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। শান্তি বলিল, "অত কাঁপিতেছ কেন? তুমি ত বড় ভীত পুরুষ! আবার লোকে তোমাকে বলে মহাবীর?"

গোঁসাইরা আলো লইয়া নিকটবর্ত্তী হইল দেখিয়া জীবানন্দ সকাতরে বলিলেন, "আমি অতিশয় কাপুরুষ, তুমি আমায় ছাড়, আমি পলাই।"

শান্তি। জোর করিয়া ছাড়াও না।

জীবানন্দ লজ্জায় স্বীকার করিতে পারিলেন না যে, তিনি স্ত্রীলোকের জোরে পারিতেছেন না। বলিলেন, "তুমি বড় পাপিষ্ঠা।"

শান্তি তখন মুচ্‌কি হাসিয়া বিলোল কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া বলিল, "প্রাণাধিক, আমি তোমার প্রতি অতিশয় আসক্ত। তোমার দাসী হইব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি, আমায় গ্রহণ করিবে, স্বীকার কর, ছাড়িয়া দিতেছি।"

জীব। দূর হ পাপিষ্ঠা! দূর হ পাপিষ্ঠা! অমন কথা আমাকে কাণে শুনিতে নাই।

শান্তি। আমি পাপিষ্ঠা, তাতে সন্দেহ নাই; নইলে স্ত্রী-জাতি হইয়া পুরুষের কাছে প্রেমভিক্ষা

চাইতে যাইব কেন—আমার কথাটি রাখিবে? ছাড়িয়া দিতেছি।

জীব। ছি! ছি! ছি! আমি ব্রহ্মচারী—আমাকে অমন কথা বলিতে নাই—তুমি আমার—

শান্তি সভয়ে বলিল, "চুপ কর! চুপ কর! চুপ কর! আমি শান্তি।"

এই বলিয়া শান্তি জীবানন্দকে ছাড়িয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। পরে যোড়হাত করিয়া বলিল, "প্রভু! অপরাধ নিও না। কিন্তু ছি! পুরুষ মানুষের ভালবাসার ভাল করাকে ধিক্! আমাকে চিনিতেই পারিলে না!"

তখন জীবানন্দের মনে সকল কথা প্রস্ফুট হইল। শান্তি নইলে এ কার্য্য আর কার? শান্তি নইলে এ রঙ্গ আর কে জানে? শান্তি নইলে কার বাহুতে এত বল? তখন আনন্দিত হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া জীবানন্দ কি বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু অবকাশ পাইলেন না, গোঁসাইয়েরা আসিয়া পড়িয়াছিল। ধীরানন্দ আগে আগে। ধীরানন্দ এই সময়ে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলমাল কিসের?"

জীবানন্দ ফাঁপরে পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন? শান্তি সেই সময়ে তাঁহাকে চুপি চুপি বলিল, "কেমন বলিয়া দিই—তুমি আমায় ধরিয়াছিলে?"

এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া শান্তি ধীরানন্দের কথার উত্তর দিল—বলিল, "গোলমাল—একটা স্ত্রীলোকে চেঁচাইতেছিল। 'আমার সতীত্ব নষ্ট করিল! আমার সতীত্ব নষ্ট করিল' বলিয়া চেঁচাইতেছিল। কিন্তু কই? জীবানন্দ ঠাকুর এত খুঁজিলেন, আমি এত খুঁজিলাম, দেখিতে পাইলাম না। এই বনটার ভিতর আপনারা একবার দেখুন দেখি—ও দিকে শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

গোঁসাইদিগকে শান্তি অরণ্যের নিবিড় অংশ দেখাইয়া দিল। জীবানন্দ শান্তিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈষ্ণবদিগকে এত দুঃখ দিয়া কি ফল? ও বনে গেলে কি ওরা ফিরিবে? সাপেই খাক্ কি বাঘেই খাক্।"

শান্তি। যখন বৈষ্ণব স্ত্রীলোকের নাম শুনেছে, তখন একটু কষ্ট না পেলে ফিরিবে না। তা না হয় ফিরাইতেছি।

এই বলিয়া শান্তি গোঁসাইজিদের ডাকিয়া বলিলেন, "আপনারা একটু সতর্ক থাকিবেন। কি জানি ভৌতিক মায়াও হইতে পারে।"

শুনিয়া এক জন গোঁসাই বলিল, "তাই সম্ভব। নহিলে স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিবে?"

গোঁসাইয়েরা সকলেই এই মতে মত দিল, ভৌতিক মায়া স্থির করিয়া সকলেই মঠে ফিরিল, জীবানন্দ বলিল, "এসো আমরা এইখানে বসি—এ ব্যাপারটা আমাকে বুঝাইয়া বল—তুমি, এখানে কেন—কি প্রকারে আসিলে—এ বেশই বা কেন? এত রঙ্গই বা কোথায় শিখিলে?"

শান্তি বলিল, "আমি কেন আসিলাম?—তোমার জন্য আসিয়াছি। কি প্রকারে আসিলাম?—হাঁটিয়া। এ বেশ কেন?—আমার সখ্। আর এত রঙ্গ শিখিলাম কোথায়?—একটি পুরুষ মানুষের কাছে। সব তোমায় ভাঙ্গিয়া বলিব। কিন্তু এখানে বনে বসিব কেন? চল তোমার কুঞ্জে যাই।"

জীব। আমার কুঞ্জ কোথায়?

শান্তি। মঠে।

জীব। সেখানে স্ত্রীলোক যাইতে আসিতে নিষেধ।

শান্তি। আমি কি স্ত্রীলোক?

জীব। আমি মহারাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিব না।

শান্তি। আমার প্রতি মহারাজের অনুমতি আছে। কুঞ্জেই চল, সব বলিতেছি। বিশেষ ঘরের ভিতর না গেলে আমার দাড়ি খুলিব না। দাড়ি না খুলিলে তুমি পোড়ার মুখ চিনিতে পারিবে না। ছিঃ! পুরুষ এমন!

উপরে যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পঞ্চম সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় ভালই করিয়াছিলেন। আমরা শান্তিকে অধিকতর শান্ত ও সংযত দেখিলাম। কিন্তু বিপুল কবিত্বরস হইতে বঞ্চিত হইলাম। সেক্ষপীয়ার প্রণীত Merchant of Venice এর এক স্থানে (Act V. scene i) Portiaর মুখ হইতে এইরূপে একটা কথা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। মূল সংস্করণে ছিল;—

I will never come in your bed until I see

the ring. প্রথম অংশ অশ্লীল বোধে Clarendon seriesএ পরিবর্ত্তিত হইল; লিখিত হইল, "I will never be your wife." এ পরিবর্ত্তনে শ্লীলতা সংরক্ষিত হইল বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যটুকু বিনষ্ট হইল।

আনন্দমঠে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দুই একটি প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিলাম:—

উপক্রমণিকা—প্রথম পাতা শেষ ছত্র।

বঙ্গদর্শনে আছে—

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "প্রিয়জনের প্রাণসর্ব্বস্ব।" এই শেষ ছত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণে লিখিলেন—"ভক্তি।"

ভক্তি কথাটি তদবধি আর পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

প্রথম সংস্করণের পুস্তক-শেষে যে চারি ছত্র লিখিত ছিল, তাহা পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিম্নে সেই ছত্র কয়টি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল, বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ

যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।"

সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র আর বলেন নাই। সম্ভবতঃ দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া বলিতে আর সাহস করেন নাই।

রাধারাণী—পরিচয়।

গৃহ-বিগ্রহ রাধাবল্লভজীউর রথযাত্রা প্রতিবৎসর মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। পূজনীয় যাদবচন্দ্র তখন জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটী লইয়া গৃহে বসিয়াছিলেন। রথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধানার্থ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দুই মাস পরে "রাধারাণী" লিখিত হয়। আমার মনে হয়, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "রাধারাণী" রচনা করিয়াছিলেন।

রাজসিংহ—পরিচয়।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার 'রাজসিংহ' সম্পূর্ণ করা হইতেছে না কেন?"

তার কিছু আগে 'রাজসিংহ' 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইতে হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর বাবুর কথার উত্তর করিলেন, "কেহ কেহ বলেন, আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলে পিলে মাটি হইতেছে।' তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।"

উত্তরে বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও চন্দ্রশেখর বাবু বলিয়াছিলেন, "মাণিকলালের মত ২.১ টা ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।" এই কথায় বঙ্কিম বাবু কি ভাবিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে রাজসিংহের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। *

---

* সাধনা, তৃতীয় বর্ষ।

যুগলাঙ্গুরীয়—পরিচয়।

তাম্রলিপ্তের ঘটনা লইয়া যুগলাঙ্গুরীয় রচিত। যুগলাঙ্গুরীয় রচিত হইবার প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র একবার তমলুকে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তমলুকের হাকিম। তমলুক পূর্ব্বে যখন তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বিবিধ নামে * পরিচিত ছিল, তখন সমুদ্র তমলুকের পদধৌত করিত। এক্ষণে সমুদ্র অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। সমুদ্র গিয়াছে, রূপনারায়ণ আসিয়াছে। কোথা হইতে কবে এ বিপুলকায় নদ আসিয়া তমলুকের পদনিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে আসিলেন, তখন তমলুকের সে বাণিজ্য নাই, সে শ্রী নাই; কিন্তু স্মৃতি ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে কবিকুলতিলক মধুসূদন দত্ত তমলুকে আসিয়াছিলেন; তখন কবিবরের প্রথম যৌবন। তাঁহার মনের গতি চঞ্চল। হিন্দুধর্ম্মের উপর আস্থাশূন্য

---

* তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তী, তমালিকা, তমালিনী, তমোলিপ্ত, তমোলিপ্তী ইত্যাদি।

হইয়া তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রাজনারায়ণ দত্ত মহাশয় দেখিলেন, পুত্রকে কলিকাতার সংসর্গ হইতে দূরে না রাখিলে পুত্র অচিরে ধর্ম্মত্যাগী হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি মধুসূদনকে তমলুকের রাজার * নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজনারায়ণ বাবু, রাজার উকীল ছিলেন। রাজা সানন্দে তাঁহার উদ্যান-বাটী ছাড়িয়া দিলেন। এই উদ্যান-বাটীর পদনিম্নে রূপনারায়ণ প্রবাহিত। সে উদ্যান, সে বাটীর এক্ষণে চিহ্ন নাই; কেবল কয়েকখানা ইট আছে। কয়েকদিন পরে তাহাও থাকিবে না। মানুষের ধনৈশ্বর্য্যের এইরূপ চিহ্নই থাকে। রাজা বিপন্ন হইয়া একজন দ্বারবানের নামে বাড়ী বেনামী করিলেন। দ্বারবান লুকাইয়া ওয়াটসন কোম্পানীকে বাড়ী বেচিয়া আসিল। কোম্পানীকেও কিছুকাল পরে ডেরাডাণ্ডা উঠাইয়া চলিয়া যাইতে হইল। রূপনারায়ণও দেখিয়া শুনিয়া সরিয়া পড়িল।

কিন্তু মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে আসিয়া-

---

* লোকে রাজা বলিয়া ডাকিত; কিন্তু রাজা নহেন—ক্ষুদ্র জমিদার মাত্র।

ছিলেন, তখন সে উদ্যান-বাটী সৌন্দর্য্যশালী ছিল। জানি না কেন, মধুসূদনের তমলুক ভাল লাগে নাই। তিনি তাঁহার সুহৃদ্ গৌরমোহন বসাককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তমলুককে "nasty place" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "Muse disdains to 'repair' to such a place as I am writing you from, i, e, Tamluk."

কিন্তু গৌর বাবু যখন তমলুকের হাকিম (Sub Divisional officer) হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার তমলুক ভাল লাগিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তমলুকে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারও তমলুক ভাল লাগিয়াছিল। সে সময়—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তমলুক হতশ্রী হইলেও "nasty place" নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে বিশালহৃদয় রূপনারায়ণে দেখিলেন, "মৃদু পবনোত্থিত অতুঙ্গ তরঙ্গে বালার্ক-রশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে।" আর বঙ্কিম

সেই সমুদ্রবৎ বিপুলকায় রূপনারায়ণ তটোপরি দেখিলেন, "এক বিচিত্র অট্টালিকা। তাহার নিকট একটী সুনির্ম্মিত বৃক্ষবাটিকা।" এই দৃশ্য—তমলুকের এই দৃশ্য—তাঁহার হৃদয়ে গভীর অঙ্কপাত করিয়াছিল। পনর বৎসরেও তিনি তাহা ভুলেন নাই। পনর বৎসর পরে তিনি তমলুকের এই চিত্র উঠাইয়া লইয়া যুগলাঙ্গুরীয়তে আঁকিয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর—পরিচয়।

প্রতাপ যেখানে বলিতেছেন যে,"তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম," সেই স্থল উল্লেখ করিয়া লোকনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে, প্রতাপের অসাধারণ বলবান্ চরিত্রে সে রূপ ভাব কেন? বঙ্কিম বাবু দেখাইয়াছিলেন যে, প্রতাপ বস্তুতঃ অসাধারণ হইলেও নিজের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস তেমন দৃঢ় ছিল না। সেই তাঁহার মহত্ত্ব এবং তাহাই প্রকৃতি সঙ্গত।

চন্দ্রশেখর—পরিত্যক্ত অংশ।

চন্দ্রশেখর বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৮১ সালের ভাদ্র মাসে চন্দ্রশেখর উক্ত পত্রিকায় সম্পূর্ণ হয়। তার পর যখন ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দ্রশেখর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল, চন্দ্রশেখর নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে। আবার পরবর্ত্তী সংস্করণে এই নূতন কলেবরের উপর নানা বর্ণের রং দেওয়া হইল।

প্রথম সংস্করণ—উপক্রমণিকা—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয় না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা! (হাসিতে হয় তোমরা হাসিও—আপত্তি নাই। আমি জানি, অঙ্কুরেও বৃক্ষের গুণ আছে। জন্মাবধি মানব-হৃদয়ের ধর্ম্ম স্নেহশালিতা।) বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

বন্ধনীর ভিতরের অংশ প্রথম সংস্করণে ছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে ভীমা পুষ্করিণী ছিল—শৈবালিনী, লরেন্স ফষ্টর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি

অনেকেই আসিয়াছিল। পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থারম্ভে দলনী বেগমকে আনা হইল; দ্বিতীয় স্থান, শৈবলিনী প্রভৃতিকে দেওয়া হইল।

প্রথম সংস্করণে দ্বিতীয় খণ্ডে “ভ্রাতার স্নেহ” বলিয়া একটা পরিচ্ছেদ ছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তা' ছাড়া আরও কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে; অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

“এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন।

গুরগণ খাঁ বিহ্বলের ন্যায় বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

দলনী বিবি আবার ফিরিয়া আসিলেন।

গুরগণ খাঁর পদতলে পতিত হইলেন, বলিলেন, “আমি মুখরা বালিকা—কি বলিতে কি বলিলাম—আমার উপর রাগ করিবেন না। নবাবের অনিষ্ট ঘটিলে আমি নিশ্চিত প্রাণত্যাগ করিব। আমায় রক্ষা করুন—ভগিনী বধ করিবেন না। আমায় রক্ষা করুন। যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউন।”

ভগিনীর কাতরোক্তি শুনিয়া সেনাপতি কহিলেন, "যুদ্ধের কোন সূচনা এখনও হয় নাই। তুমি কেন অনর্থক কাতর হইতেছ? যুদ্ধ কোথায়?"

দলনী কহিলেন,"আপনি তবে নৌকা ছাড়িয়া দিউন।"

গুরগণ খাঁ কহিলেন, "সে নবাবের ইচ্ছা।"

দলনী দেখিলেন, সকল কথা বৃথা হইল। ভগ্নাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন। গমনকালে বলিলেন, "আপনি সাবধান থাকিবেন। আমাকে আপনার শত্রু করিবেন না। আত্মরক্ষার্থ আমি আপনার শত্রুতা করিতে পারি।"

* * *

এক জন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুরগণ খাঁ আজ্ঞা করিলেন, "শীঘ্র ঘোড়া লইয়া আইস।"

গুরগণ খাঁর অশ্বালয়ে সর্ব্বদা অশ্ব সজ্জিত থাকিত। তখনই সজ্জিত অশ্ব সম্মুখে আনীত হইল, তদুপরি আরোহণ করিয়া গুরগণ খাঁ অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া দলনীর পূর্ব্বেই দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ রাত্রে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে?"

প্রহরী চিনিয়া অভিবাদন করিল। কহিল, "হুজুরের হুকুম।"

গুরগণ খাঁ কহিলেন, "আচ্ছা! আমার হুকুম আর তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। বদলির সময়ে এ কথা প্রহরীকে বুঝাইয়া দিও।"

'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রহরী সেলাম করিল। গুরগণ খাঁ ফিরিলেন।

যাইবার সময় পথিমধ্যে গুরগণ খাঁ দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়া গিয়াছিলেন। চিনিয়াছিলেন। দ্রুতবেগে তাহাদিগের পার্শ্ব দিয়া অশ্ব ধাবিত করিয়াছিলেন, রাত্রে তদবস্থায় কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। এখন দুর্গদ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আবার সেই দুই জন স্ত্রীলোকের সম্মুখীন হইলেন। তখন অশ্ব থামাইলেন। বলিলেন, "বেগম সাহেব, তোমার সঙ্গে কে?" বলা বাহুল্য যে ঐ দুইটি স্ত্রীলোকের মধ্যে একটি দলনী—পদব্রজে দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন।

দলনী 'বেগম সাহেব' সম্বোধন শুনিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল,—তাহার হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া গেল—কিন্তু তখনই ভ্রাতাকে চিনিতে পারিল—উত্তর

করিল, "আমার সঙ্গে কুল্‌সম্‌—পথিমধ্যে বিপদ্ ঘটাই-তেছেন কেন?"

গুরগণ খাঁ কহিল, "তোমাদের দুর্গপ্রবেশ আমি নিষেধ করিয়া আসিয়াছি।"

শুনিয়া দলনী ক্রমে ক্রমে, ছিন্ন বল্লীবৎ ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বলিলেন, "ভ্রাতঃ আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না?"

গুরগণ খাঁ বলিলেন, "আমার গৃহে আইস। আমি তোমাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিব। আমার কোন অনু-চরের গৃহে তোমার স্থান করিয়া দিব।"

দলনী বলিল, "তুমি যাও। গঙ্গার তরঙ্গ মধ্যে আমার স্থান হইবে।"

তৃতীয় খণ্ডে অগাধ জলে সাঁতারের কথা সকলেরই স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা। প্রতাপ জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল নিশিতে জাহ্নবীজলে সাঁতার কাটিতে কাটিতে শৈব-লিনীকে শপথ করাইতেছেন। প্রতাপ বলিতেছেন, —"শপথ কর যে, এ জন্মে আমি তোমার ভ্রাতা—তুমি আমার ভগিনী। তুমি আমার কন্যাতুল্যা—আমি তোমার পিতৃতুল্য—তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ

নাই। এ জন্মে তুমি আমাকে অন্য চক্ষে দেখিবে না—অন্যরূপে ভাবিবে না। শপথ কর।"

এ শপথের কথা প্রথম সংস্করণে আছে, পরবর্ত্তী সংস্করণে নাই।

প্রথম সংস্করণে একটা পরিশিষ্ট ছিল, তৃতীয় সংস্করণে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিম্নে সে পরিচ্ছেদটি উদ্ধৃত করিলাম ;—

পরিশিষ্ট।

লরেন্স ফষ্টর, নবাবের তাম্বু বাহিরে আসিয়া কি করিবেন, কোথা যাইবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, যবন এবং ইংরেজ উভয়েই তাঁহার শত্রু। বিহ্বলের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ইংরাজ সেনা একদল যবনকে প্রহার করিয়া তাড়াইতে তাড়াইতে লইয়া যাইতেছিল। ফষ্টর এক জন মৃত যবনের বন্দুক কুড়াইয়া লইয়া সেই ইংরেজদিগের সঙ্গে মিশিলেন। কিন্তু পরিচ্ছদে ধরা পড়িলেন। সেই রেজিমেণ্টের পোষাক তাঁহার পরা ছিল না।

সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? পোষাক পর নাই কেন?"

ফষ্টর বলিল, "আমি লরেন্স ফষ্টর, মুসলমানেরা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল।"

সার্জেণ্ট বলিল, "দুই জন ইহাকে সেনাপতির নিকট লইয়া যাও। সেনাপতির আজ্ঞা আছে, বন্দী কেহ হস্তগত হইলে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে।" যুদ্ধাবসানে লরেন্স ফষ্টর, সেনাপতির নিকটে আনীত হইলেন। সেনাপতি দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "জানি। লরেন্স ফষ্টর পলাতক, রাজবিদ্রোহী—যবন-সেনামধ্যে পদগ্রহণ করিয়াছে; উহাকে ফাঁসি দেওয়া যাইবে।"

বিচারান্তে যুদ্ধের পরে রীতিমত বিচার হইয়া ফষ্টরের ফাঁসি হইল।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া গৃহে আসিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীর সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়াই জানিল যে, শৈবলিনী রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। আহ্লাদে, সুন্দরী চন্দ্রশেখরকে সবিশেষ কহিল। আহ্লাদে চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীকে আলিঙ্গন করিতে

প্রায় সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সেই দিনই পুনর্ব্বার সংসার পাতিয়া, শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন। রমানন্দ স্বামী আসিলে একটা লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন স্থির করিলেন।

রমানন্দ স্বামী প্রতাপের মৃত্যুসংবাদ লইয়া আসিলেন। কেন প্রতাপ মরিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলেন না। চন্দ্রশেখর কিয়দ্দিবস প্রতাপের শোকে এত অধীর হইয়া রহিলেন যে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের কথা বিস্মৃত হইয়া রহিলেন। রমানন্দ স্বামী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

নবাব কাসেম আলি খাঁ উদয়নালা হইতে মুঙ্গেরে পলাইলেন। তথায় জগৎশেঠদিগকে গঙ্গাজলে নিমগ্ন করিয়া বধ করিলেন। এবং যে সকল ইংরেজ বন্দী ছিল, তাহাদিগকে সমরুর হস্তে বধ করাইলেন। এই সকল দুষ্কার্য্য করিয়া, মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পাটনা যাত্রা করিলেন।

গুরগণ্ খাঁ অতি চতুর। তিনি নবাবের আদেশ ক্রমে উদয়নালা যাইবার জন্য, নবাবের পশ্চাৎ যাত্রা

করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু উদয়নালা পর্য্যন্ত যান নাই—নবাবের অগ্রেই ফিরিয়াছিলেন, ভাব গতিক বুঝিয়া নবাবের সহিত যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এরূপ কৌশল করিতেন। কিন্তু এক্ষণে নবাবের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলেন। পথিমধ্যে নবাব, সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা বিদ্রোহের ছল করিয়া গুরগণ খাঁকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

তাহার পরে নবাবের অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিল, তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন, —বাঙ্গালার শেষ যবন রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেন।

কুল্‌সম্ যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের ভৃত্যবর্গের সহিত পলায়ন করিয়াছিল। কাসেম আলি ফকিরি গ্রহণ করিলে, সে মীরজাফরের অবরোধে নিযুক্ত হইল। দলনীকে কখনও ভুলিল না।"

কৃষ্ণকান্তের উইল।

গোবিন্দলালের অধঃপতনের প্রথম কারণ, রোহিণীর প্রতি তাহার দয়া। গোবিন্দলাল প্রথমবারে চোর রোহিণীকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিল, দ্বিতীয়বারে আত্মঘাতিনী রোহিণীর জীবন রক্ষা করিল। এই দয়া, এই উপকার গোবিন্দলালের কালস্বরূপ হইল। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যে উপকার করে, সে উপকৃত ব্যক্তিকে কখন বিস্মৃত হইতে পারে না। গোবিন্দলাল, রোহিণীর উপকার করিয়া তাহার প্রতি দয়া দেখাইয়া তাহাকে হৃদয়ের একাংশে আসন প্রদান করিল।

গোবিন্দলালের অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ হইল, তাহার চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ। ভ্রমর যদি গোবিন্দলালের চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ না দিত, তাহা হইলে গোবিন্দলালের হৃদয়ে নিদারুণ অভিমান সঞ্জাত হইবার সুযোগ হইত না। দুর্ব্বলহৃদয় অভিমানী ব্যক্তি মাত্রই মনে করে, আমায় যদি লোকে অকারণ চোর মনে করিল, তবে সত্য সত্য চোর হওয়ায় দোষ কি? গোবিন্দলাল যখন দেখিল, তাহার সকল স্নেহের আধার, বিশ্বাসের

আধার ভ্রমর তাহাকে অন্য রমণীগত মনে করিয়াছে, তখন আর ভ্রমরের নিকট স্নেহ, বিশ্বাস রাখিবার প্রয়োজন কি?

তৃতীয় কারণ, কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল। এই উইল গোবিন্দলালের অভিমান অনলে ফুৎকার প্রদান করিল। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী ও বুদ্ধিমান্ হইলেও তিনি ভ্রমে পতিত হইয়া সমস্ত বিষয় ভ্রমরকে দান করিলেন। গোবিন্দলালের অভিমান সহস্রমুখে গর্জ্জিয়া উঠিল। অভিমানী হৃদয় লইয়া গোবিন্দলাল গৃহত্যাগ করিল।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল, কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই পরিবর্ত্তিত অংশগুলি লইয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল শাস্ত্রী মহাশয় "ভারতবর্ষে" একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি জ্ঞানগর্ভ; আমি এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

"কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন চতুর্থখণ্ডে ১২৮২ সালে ইহার প্রথম নয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। পরে বঙ্কিম বঙ্গদর্শনের

বিলোপ সাধন করেন। ১২৮৪ সালে বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বকার অসমাপ্ত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮৪ সালের বঙ্গদর্শনের দশম পরিচ্ছেদ হইতে প্রকাশিত হইয়া সমাপ্ত হয়। দশম পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ডের ৪০৯, ৪৫১, ৫৬১, পৃষ্ঠা দেখ। দশম পরিচ্ছেদ পড়িবার পূর্ব্বে প্রথম নবম পরিচ্ছেদ আর একবার পড়িলে ভাল হয় না? কেন না যাহা এক বৎসর পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ না থাকাই সম্ভব।' ১২৮৫ সালে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সহিত পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দুইটী স্থলে বিশেষ প্রভেদ আছে। গ্রন্থের মধ্যে দুইটী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রথম পরিবর্ত্তন রোহিণী-চরিত্রে, দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন গোবিন্দলালের পরিণামে। কেন এই দুইটী পরিবর্ত্তন হইল ও ইহাতে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কিনা, তাহাই আমাদের বিচার্য্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য পরিবর্ত্তনগুলিও সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। এই গুলি আলোচনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি ও

নিজ রচনা সংশোধনপ্রণালীর উদাহরণ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রথম পরিবর্ত্তন রোহিণী-চরিত্র। বঙ্গদর্শনের রোহিণী এইরূপ। ব্রহ্মানন্দ যখন হরলালের জাল উইল আসল উইলের পরিবর্ত্তে স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়া হরলালকে টাকা ও জাল উইল ফেরত দিতেছিল, রোহিণী তখন 'বেড়ার গোড়ায় দাঁড়াইয়া' সমস্ত দেখিতেছিল। ব্রহ্মানন্দ টাকা ফেরৎ দিলেন, কিন্তু রোহিণীর মনে অর্থলালসা জাগিয়া উঠিল। সে অর্থলোভে নিজে যাচিয়া হরলালের নিকট উপস্থিত হইল। বঙ্গদর্শনে আছে—

"এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইলে পর একটা স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরলাল তাঁহাকে অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেও?"

স্ত্রীলোকটি দুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, "দাসী।"

হর। কেও? রোহিণী?

স্ত্রীলোকটি বলিল "আজ্ঞে।"

* * * *

দুই চারিটি মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল,

"কাকার কাছে যে জন্য আসিয়াছিলেন তাহার কি হইল ?"

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জন্য আসিয়াছিলাম ?" রোহিণী হাসিয়া মৃদু মৃদু শ্লোক বলিল—

"যাও যাও আর কেলে সোনা কাজ কি সোহাগ বাড়িয়ে।

শুনেছি সব মনের কথা বেড়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে॥"

হরলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বটে, তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই। এখন কি একটা নূতন রোজগারের পন্থা হইল ?"

রো। হইল বই কি ?

হর। কার কাছে? কর্ত্তার কাছে এ সব কথা যাবে নাকি ?

রো। রোজগার বড় বাবুর কাছেই হবে।

হর। কিরূপে ?

রো। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।

হরলাল বিস্মিত হইলেন। বলিলেন "সে কি

রোহিণী?" পরে কহিলেন "আশ্চর্য্যই বা কি? তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে উইল বদ্‌লাইবে?"

রো। সে কথাটা আপনার সাক্ষাতে নাই বা বলিলাম। না পারি, আপনার টাকা আপনি ফেরৎ লইবেন।

হর। ফেরৎ? তবে টাকা আগে দিতে হইবে নাকি?

রো। সব।

হর। কেন? এত অবিশ্বাস কেন?

রো। আপনিই বা আমায় অবিশ্বাস করেন কেন?

হর। কবে এটা পারবে?

রো। আজিকেই রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

হরলাল বলিলেন 'ভাল।' এই বলিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাজার টাকার নোট গণিয়া দিলেন।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটা বঙ্কিম আস্ত উঠাইয়া দিয়াছেন। উপরের এই কয় পংক্তিতে রোহিণী-চরিত্র কি স্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। সে আড় পাতিয়া কথা শুনে, অর্থ

লোভে জাল উইল বদল করিতে নিজে উপযাচিকা হইয়া হরলালের সহিত সাক্ষাৎ করে, নির্লজ্জার মত শ্লোক আওড়ায়, চিরদিন দুষ্কর্মরতা দুর্বৃত্তার ন্যায় আগে টাকা লইতে চায়, শেষে হরলালকে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎ করিতে বলে। হরলালের "নূতন রোজগারের পন্থা" কথাটীর মধ্যে "নূতন" শব্দ বঙ্কিমচন্দ্রের যদি কোনও ইঙ্গিত অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে রোহিণী-চরিত্রে বড়ই কালিমা পড়ে। আমরা তাহা না হয় না ধরিলাম। কিন্তু আর আর যে দোষগুলি দেখিলাম, তাহা হইতে রোহিণীকে মুক্ত করা অসম্ভব। বঙ্গদর্শনে রোহিণী-চরিত্র বর্ণনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন—

"তাহার বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে বিংশতি বৎসর মাত্র দেখাইত। * * * * নিরম্বু একাদশী করিত না। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, সে মাছও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবা-বিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল "পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি। * * * * পল্লীর মেয়েরা যেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে গানের মজলিস করিত, রোহিণী সেখানে আখড়াধারী।

টপ্পা, শ্যামাবিষয়, কীর্ত্তন, পাঁচালী, কবি রোহিণীর কণ্ঠাগ্রে। শুনা গিয়াছে, রোহিণী ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র অনেক জানিত।"

এ অংশটুকুতেও রোহিণীর নির্লজ্জতা পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। "পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি", এ কথা যে রমণী প্রকাশ্যে বলিতে পারে, তাহার নির্লজ্জতা যে চরম সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে অণু-মাত্রও সন্দেহ নাই।

বঙ্গদর্শনে রোহিণীর আর এক নীচতা ছিল। উইল বদলাইবার সুবিধার জন্য এক নীচ রমণীর প্রলোভন দেখাইয়া রোহিণী কৃষ্ণকান্তের ভৃত্য হরিকে সরাইয়াছিল।

"হরি তখন মতি গোয়ালিনীর গৃহে সেই বহুবিলাসিনী সুন্দরীকে কেবল হরি-মাত্র পরায়ণা মনে করিয়া তাহার সতীত্বের প্রশংসা করিতেছিলেন, সেও রোহিণীর কৌশল। নহিলে দ্বার খোলা থাকে না।" [বঙ্গদর্শন]

আবার ৯ম পরিচ্ছেদে ছিল, "এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া রোহিণী প্রথমতঃ হরি খানসামাকে হস্তগত করিল। হরি যথাকালে কৃষ্ণকান্তের শয়ন-কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিয়া যথেপ্সিত স্থানে সুখানুসন্ধানে গমন করিল।"

এই ঘৃণ্য উপায় রোহিণীর আর এক পাপ।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত পঞ্চম পরিচ্ছেদটী গ্রন্থে আস্তস্ত উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ও তৎপরিবর্ত্তে একটী নূতন পরিচ্ছেদ রচিত হইয়াছিল। পুরাতন বঙ্গদর্শন সহজ-প্রাপ্য নয়, সেজন্য আমরা এখানে উক্ত অংশ উদ্ধৃত করিলাম। এই অংশে রোহিণীর বাক্‌চাতুর্য্য বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

"সুপ্তা সুন্দরীর প্রথম নিদ্রাভঙ্গে নয়নোন্মীলনবৎ, পৃথিবীমণ্ডলে প্রভাতোদয় হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিণীর সহিত হরলাল কথোপকথন করিতেছিল। যেন পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবরমধ্যে সর্পদম্পতী গরল উদ্গীর্ণ করিতে-ছিল। কৃষ্ণকান্তের যথার্থ উইল রোহিণীর হস্তে।

হরলাল বলিল "তারপর, আমাকে উইলখানি দাও না।"

রো। সে কথা ত বলিয়াছি। উইলখানি আমার নিকটে থাকিবে।

হরলাল তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "তোমার পুরস্কার তোমাকে দিয়াছি। এখন ও উইল আমার।"

রো। আপনারই রহিল। কিন্তু আমার কাছে থাকুক না কেন? আমি ত চিরদিন আপনারই আজ্ঞাকারী। ইহা আর কাহারও হস্তে যাইবে না, বা আর কেহ দেখিতে পাইবে না।

হর। তুমি স্ত্রীলোক। কোথায় রাখিবে, কাহার হাতে পড়িবে, উভয়েই মারা যাইব।

রো। আমি উইল এমত স্থানে রাখিব যে অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি না দিলে আপনিও সন্ধান পাইবেন না।

হর। তোমার ইচ্ছা যে তুমি ইহার দ্বারা আমাকে হস্তগত রাখ। না? কিম্বা গোবিন্দলালের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কর।

রো। গোবিন্দলালের মুখে আগুণ। আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না।

হর। আর যদি কোনও প্রকারে আমি কর্ত্তাকে জানাই যে রোহিণী তাঁহার ঘরে চুরি করিয়াছে।

রো। আমি তাহা হইলে কর্ত্তার নিকটে এই উইল খানি ফিরাইয়া দিব। আর বলিব যে আমি এই উইল ব্যতীত কিছুই চুরি করি নাই। তাও বড় বাবুর কথায়

করিয়াছি। তাহাতে বড় বাবুর উপকার কি অপকার হইবে তাহা আপনি বিচার করুন। স্মরণ করিয়া দেখুন আসল উইলে আপনার শূন্যভাগ। আমাকে থানায় যাইতে হয় আমি মহৎ সঙ্গে যাইব।

হরলাল ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া রোহিণীর হস্ত ধারণ করিলেন, এবং বলে উইলখানি কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। রোহিণী তখন উইল তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা হয় আপনি উইল লইয়া যাউন। আমি কর্তার নিকট সংবাদ দিই যে, তাঁহার উইল চুরি গিয়াছে, তিনি নূতন উইল করুন।"

হরলাল পরাস্ত হইলেন। তিনি ক্রোধে উইল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন "তবে অধঃপাতে যাও।"

এই বলিয়া হরলাল সে স্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। রোহিণী উইল লইয়া নিজালয়ে প্রবেশ করিল।"

এই টাকা লইবার পর গোবিন্দলালকে দেখিয়া রোহিণীর মনে সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি বঙ্গদর্শনে ছিল, পরে বঙ্কিম উহা পরিবর্জ্জিত করেন ;—

"সুমতি বলিতেছেন, 'এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতে আছে?'

কুমতি। হাজার টাকা দেয় কে? টাকায় কত উপকার।

সুমতি। তা গোবিন্দলালের কাছেও টাকা পাওয়া যায়। তার কাছে ঐ হাজার টাকা লইয়া কেন উইল ফিরাইয়া দাও না? (N. B. এই কথাটা সুমতি বলিয়াছিল কি কুমতি বলিয়াছিল, লেখক ঠিক বলিতে পারেন না।)

কুমতি। টাকা চায় কে? আর গোবিন্দলাল উইল বদল হইয়াছে জানিতে পারিলে টাকাই বা দিবে কেন? উইল যে বদল হইয়াছে ইহা জানিতে পারিলেই তাহার কার্য্যোদ্ধার হইবে। তখনই সে কৃষ্ণকান্তকে বলিবে, মহাশয়ের উইল বদল হইয়াছে। নূতন উইল করুন। সে টাকা দিবে কেন?

সুমতি। ভাল টাকাই কি এত পরম পদার্থ; কি হইবে টাকায়? তোমার এতদিন হাজার টাকা ছিল না তাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছিল? হাজার টাকা কতদিন যাইবে? হরলালের টাকা হরলালকে ফিরাইয়া দাও,

আর কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।" [অষ্টম পরিচ্ছেদ।]

এখন দেখা যাক্, রোহিণীর চরিত্র-পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কৃষ্ণকান্তের উইলের চরিত্রগুলির মধ্যে রোহিণী এক প্রধান চরিত্র। রোহিণীই উইল সংক্রান্ত গোলমালে প্রধান কার্য্যকারিণী, রোহিণীই গোবিন্দলালের অধঃপতনে সহায়তাকারিণী। এত বড় একটা চরিত্রকে একেবারে নিছাঁক দুর্ব্বৃত্ততাপূর্ণ করিয়া দোষরাশির সমষ্টিরূপে আঁকিলে পাঠকবর্গের বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও রোহিণীর দিকে থাকে না। নিপুণ লোকের প্রধান কৌশল এই যে পাপীর চিত্র আঁকিলে পাপের প্রতি পাঠকের ঘৃণা জন্মায় বটে, কিন্তু পাপীর প্রতি সহানুভূতি ফুটিয়া উঠে। তাই বঙ্কিম রোহিণী-চরিত্রে এরূপ পরিবর্ত্তন করিলেন যে তাহার কলঙ্কিত জীবনের কাহিনীও আমাদের মনে সহানুভূতি জাগাইয়া দেয়। ভোগলালসাপূর্ণ তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে হরলাল কেন প্রলোভন উপস্থিত করিল? কেন তাহাকে বিবাহ করিবে বলিল? বঙ্কিম রোহিণী-চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিলেন, রোহিণী টাকার জন্য উইল বদ্লাইতে যায় নাই। হরলাল তাহাকে

বিবাহ করিবে এই আশায় গিয়াছিল। পাছে হরলালের প্রতি এই আকস্মিক অনুরাগ বিচিত্র বোধ হয়, তাই বঙ্কিম আর একটী উপাখ্যান জুড়িয়া দিলেন। একদিন হরলাল বিপন্ন রোহিণীকে বদ্‌মাইসদের হাত হইতে উদ্ধার করেন। রোহিণী সে জন্য কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতাকেই অনুরাগের পূর্ব্বলক্ষণ বলা যাইতে পারে। আর যৌবনে রোহিণী সংযমে অনভ্যস্তা ছিল, তাই অত শীঘ্র তাহার অধঃপতন হইল। রোহিণী উইল চুরি করিতে গিয়াছিল, কতকটা যেন এই কৃতজ্ঞতায়, কতকটা যেন বিবাহ-লালসায়। রোহিণী হরলালের বিবাহিতা পত্নী হইতে চাহিয়াছিল। অন্য কোনও নিকৃষ্ট সম্বন্ধ তাহার অভিপ্রেত ছিল না। পরে গোবিন্দ-লালের সহিত তাহার নিকৃষ্ট সম্বন্ধ কেন হইল, তাহার বিচারের স্থল এ নহে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে রোহিণীর মন যে পাপরতা ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কৃষ্ণকান্তের উইলে পাই নাই। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর যে ঘৃণিত চরিত্র বঙ্কিম আঁকিয়াছিলেন, তাহা পাঠকের মনে কেবল ঘৃণার পূর্ণ স্রোত প্রবাহিত করিতে সমর্থ। সহানুভূতির

লেশমাত্রও তাহাতে উদয় হইত না। তাই রোহিণীর কেবল পাপভরা জীবনের বদলে তাহার ক্রমশঃ অধঃপতন বঙ্কিম আঁকিয়াছেন। তাই নির্লজ্জতার পরিবর্তে বর্তমান তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা মুখরা রোহিণীরও লজ্জাবিজড়িত ভাব দেখিতে পাই। তাই সন্তুষ্টচিত্তে নিম্নোদ্ধৃত পরিবর্তিত অংশ পাঠ করি :—

"হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সম্মত করিতে না পারিয়া সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেল। বলিল "এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এ কাজ তোমায় করিতে হইবে।"

রোহিণী নোট লইল না। বলিল "টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।"

ঐ পরিচ্ছেদের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র আবার লিখিলেন "হরলাল আহ্লাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকট রাখিল। দেখিয়া রোহিণী বলিল, "নোট না। শুধু উইলখানা রাখুন।"

"হরলাল তখন জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেল।" পূর্বোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে,

রোহিণী টাকার লোভে উইল বদ্‌লানরূপ ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। হরলালকে বিবাহ করিবে এই আশাই তাহার ছিল। কিন্তু বঙ্গদর্শনে রোহিণী যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে সে অর্থলোভে পড়িয়াছিল, একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নোট ফেরৎ দিবার প্রসঙ্গ বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিতরূপ ছিল। রোহিণী কেন জাল উইল রাখিয়াছিল। গোবিন্দলাল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রোহিণী বলিল "হরলাল বাবুর অনুরোধে।"

"গোবিন্দলাল অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া ভ্রূকুটী করিলেন। দেখিয়া রোহিণী বলিল 'তাহা নহে। এই কার্য্যের জন্য তিনি আমাকে এক হাজার টাকা দিয়াছেন। নোট আজিও আমার ঘরে আছে। আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি আনিয়া দেখাইতেছি।' * * *

"গোবিন্দলাল বলিলেন—'আমার কথা শুন। আগে বড় বাবুর সে টাকাগুলি আনিয়া দাও। সে টাকা তোমার রাখা উচিত নহে। আমি সে টাকা তাহার কাছে পাঠাইয়া দিব।' * * * *

"রোহিণী গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে হরলাল দত্তের নোট বাহির করিয়া লইতে আসিল। ঘরে দ্বাররুদ্ধ

করিয়া সিন্দুক হইতে নোট বাহির করিল। ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে আসিতেছিল, কিন্তু গেল না। মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া নোটগুলির উপর পা রাখিয়া রোহিণী কাঁদিতে বসিল। * * * * *

"রোহিণী উঠিয়া, নোট গুড়াইয়া লইয়া......গোবিন্দলালের কাছে নোট ফিরাইয়া দিল।......গোবিন্দলাল হরলালের হাজার টাকা ডাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। লিখিয়া দিলেন, আপনি যেজন্য রোহিণীকে টাকা দিয়াছিলেন তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। রোহিণী টাকা ফিরাইয়া দিতেছে।"

রোহিণী-চরিত্র হইতে এই হীনতাটুকু অপসারিত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ একেবারে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই পরিবর্ত্তনে রোহিণী-চরিত্রের সংশোধন হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে চিত্রিত রোহিণী অপেক্ষা গ্রন্থে চিত্রিত রোহিণী বহুল উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

এই সঙ্গে আর একটী ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা উচিত। কৃষ্ণকান্ত যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন বৈদ্য শশব্যস্তে একরাশি বটিকা লইয়া ছুটিলেন। তাহার পর বঙ্গদর্শনে ছিল—

"মনে মনে স্থির সংকল্প অগ্র কৃষ্ণকান্তকে সংহার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র পরে ইহা উঠাইয়া দেন। রসিকত হিসাবেও ইহা কিছুই নহে, অতএব অনর্থক বৈদ্যকে 'হাতুড়ে কবিরাজ' করিয়া কোনও লাভ নাই। কাজেই বৈদ্য চরিত্রটীও পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে

জলমগ্না রোহিণীকে উদ্ধার করিবার পর, বঙ্গদর্শনে ছিল "গোবিন্দলাল জানিতেন, যাহাকে ডাক্তারের Sylvester's Method বলেন তদ্দ্বারা নিঃশ্বাস বাহির করান যাইতে পারে।" পরে এটুকু উঠাইয়া দেওয় হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র স্থলে স্থলে গোবিন্দলাল সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুস্তকাকারে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশের সময় তাহা পরিহার করিয়াছেন। তাহা সমীচীন হইয়াছে, কেন না পাঠক ও সমালোচক নিজেই তাহার বিচার করিবেন, গ্রন্থকারের মধ্যবর্ত্তিতার কোনও প্রয়োজন নাই। গ্রন্থকার কিছু না লিখিলেই সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পরিবর্জ্জিত মন্তব্যগুলি এই —

"জলমগ্না রোহিণীকে গোবিন্দলাল যখন উদ্ধার

করিল, তখন বঙ্গদর্শনে মন্তব্য ছিল "আজি গোবিন্দলালের পরীক্ষার দিন। আজ গোবিন্দলাল পিতল কি সোনা বুঝা যাইবে।"

গোবিন্দলালের অধঃপতনের প্রারম্ভে মন্তব্য ছিল "গোবিন্দলালের প্রধান ভ্রম যাহা, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্য, তাঁহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম্ম পরের সুখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন জন্য নহে। ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিত্রতার জন্য পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোনও কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নহে। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।"

অস্থানে প্রযুক্ত রসিকতা যে বিসদৃশ শুনায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা জানিতেন। তাই কন্যার দুঃখে ব্যাকুলহৃদয় মাধবীনাথের মুখে বঙ্গদর্শনে যে পূর্ব্ববঙ্গের অনুকরণে উচ্চারণ প্রযুক্ত হইয়াছিল, বঙ্কিম পরে তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে ছিল——

"মাধবীনাথ। কেমন হে বেড়াইতে যাইবে?

নিশাকর। কোথায়?

মা। জিলা জশ্—শ্—শর—

নি। জশ্—শরে কেন?

মা। নীলকুটি কিন্‌ব।"

পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ দাঁড়ায়—

"মা। কেমন হে বেড়াইতে যাইবে?

নি। কোথায়?

মা। যশোর।

নি। সেখানে কেন?

মা। নীলকুটি কিন্‌ব।"

ঘটনা অসম্ভব বলিয়া যাহাতে বোধ না হয়, সে দিকে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। গোবিন্দলালকে ভ্রমর শেষ যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ এইভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়——

"এই পাঁচ বৎসরে আমি কয় লক্ষ টাকা জমাইয়াছি। পঁচিশ হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। পাঁচ হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটী বাড়ী প্রস্তুত করিব। বিশ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্ব্বাহ হইবে।"

পরে "কয় লক্ষ" স্থলে "অনেক টাকা" "পঁচিশ হাজার" স্থলে "আট হাজার," "পাঁচ হাজার" স্থলে "তিন হাজার," ও "বিশ হাজার" স্থলে "পাঁচ হাজার" লিখিত হয়। এ পরিবর্ত্তন সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত টিপ্পনীটি রোহিণীর মৃত্যু-বর্ণনার কৈফিয়ৎ। সেটি এই—"অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গ-দর্শন বাহির হওয়ার পরে, অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন"রোহিণীকে মারিলেন কেন ?"অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি 'আমার ঘাট হইয়াছে।' কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস-পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।" [বঙ্গদর্শন ১২৮৪, মাঘ]

আর প্রধান পরিবর্ত্তন গোবিন্দলালের শেষজীবনের ইতিহাস। বঙ্গদর্শনে লিখিত হয় গোবিন্দলাল আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। রোহিণীর মূর্ত্তি যখন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলালের সম্মুখে দণ্ডায়মানা বলিয়া প্রতিভাত, রোহিণীর "প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।" উক্তি

যখন বিকৃত-মস্তিষ্ক গোবিন্দলালের কর্ণে ধ্বনিত বলিয়া বোধ হইতেছিল, তখন নিম্নলিখিতরূপে বঙ্গদর্শনে গোবিন্দলালের পরিণাম সূচিত হইয়াছিল।

"গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ় জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন। পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।"

এই আত্মহত্যা গোবিন্দলালের তৎকালীন মানসিক অবস্থায় সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যায় প্রায়শ্চিত্ত হয় না। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কলুষিত চিন্তা পরিহার করিয়া ভগবানের চরণ ধ্যানে শান্তিলাভই বাঞ্ছনীয়। তাই বঙ্কিম পরে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিলেন—

"গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন; তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া সোপান-শিলার উপরে পতিত হইলেন। মূর্চ্ছাবস্থায় মানস চক্ষে দেখিলেন,

সহসা রোহিণীর মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় ভ্রমরমূর্ত্তি সম্মুখে উদিত হইল। ভ্রমর মূর্ত্তি বলিল, "মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"

গোবিন্দলাল সে রাত্রে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। একরাত্রে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসরের পর তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।"

ভ্রমরের অনুরোধে গোবিন্দলাল ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। অনুতাপে নির্ম্মলচিত্ত হওয়াতে

শান্তিলাভও করিলেন। পরিশিষ্টে নিম্নোদ্ধৃত কিয়দংশ সংযোজিত করিয়া বঙ্কিম তাহা দেখাইয়াছেন। বঙ্গদর্শনে ইহা ছিল না। "ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে সেই মন্দিরদ্বারে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। শচীকান্ত সেইখানে ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "এই মন্দিরে কি আছে দেখিব।" শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া সুবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি দেখাইল। সন্ন্যাসী বলিল "এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়"।

শচীকান্ত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু পরে বিস্ময় দূর হইল, তিনি গোবিন্দলালের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য যত্ন করিলেন। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন "আজ আমার দ্বাদশবর্ষ অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপনপূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।"

শচীকান্ত যুক্তকরে বলিল "বিষয় আপনার। আপনি উপভোগ করুন।"

গোবিন্দলাল বলিলেন "বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা

ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে কাজ নাই, তুমিই উহা ভোগ করিতে থাক।"

শচীকান্ত বিনীত ভাবে বলিল "সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?" গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ-পাদপদ্মে মনস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি, তিনিই আমার ভ্রমর। ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।"

পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেমে নিরাশ হইয়া নায়ক বা নায়িকার আত্মহত্যা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ভিক্টর হিউগোর Toilers of the sea উপন্যাসের নায়ক মনের মত রমণীকে পরের হাতে সঁপিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। আমাদের দেশের প্রকৃতি অন্যরূপ। আজকাল পাশ্চাত্য গ্রন্থাদির অনুকরণে এইরূপ আত্মহত্যা সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' উপন্যাসে

অমরনাথকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করান নাই। পূর্ব্বোক্ত Toilers of the sea উপন্যাসের নায়কের যে দশা, অমরনাথেরও সেই দশা। কিন্তু অমরনাথ ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করিল, আর পূর্ব্বোক্ত নায়ক আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে এইখানে প্রভেদ। আয়েসাও প্রণয়ে নিরাশ হইয়া আত্মহত্যার ইচ্ছা দমন করিয়াছিল। চন্দ্রশেখরে প্রতাপের মৃত্যু আত্মহত্যা নহে—আত্মোৎসর্গ। গোবিন্দলালের পরিণাম প্রথমে বঙ্কিম বাবু যেরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা পাশ্চাত্য ভাবের প্রেরণাতেই ঘটিয়াছিল। পরে প্রাচ্যভাবের অনুসরণে আত্মঘাতী গোবিন্দলালের পরিবর্ত্তে অনুতাপবিশুদ্ধহৃদয় ভগবৎপদে সমর্পিতপ্রাণ গোবিন্দলালের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রোহিণীচরিত্র ও গোবিন্দলালের পরিণাম, এই দুইটীর পরিবর্ত্তনই "কৃষ্ণকান্তের উইলে" প্রধান। আমরা কারণসহ এই পরিবর্ত্তন দুটী বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছি।

ইন্দিরা—পরিচয়।

'ইন্দিরা' ১২৮০ সালে পুস্তকাকারে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহার আকার অতি ক্ষুদ্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মুদ্রাঙ্কনের সময় 'ইন্দিরা', 'উপকথা'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। চতুর্থবারে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল। পঞ্চমবারে "ইন্দিরা" বিপুলাকার ধারণ করিল। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের মূল্য ছিল চারি আনা—পঞ্চম সংস্করণে মূল্য হইল দেড় টাকা। এই অনুপাতে আকারও বাড়িল। পনরটি নূতন পরিচ্ছেদ এই বর্দ্ধিত সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইল।

পুস্তকখানি নূতন কলেবর ধারণ করিলেও মূল আখ্যানাংশের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আগে র-বাবু ও সুভাষিণী ছিল না; তাহারা আসিল; সঙ্গে সঙ্গে হারাণীও নূতন বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া আসিল।

প্রথম বারের মুদ্রিত গ্রন্থের যে যে অংশ পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ—

"হারাণী নামে রামরাম দত্তের একজন পরিচারিকা ছিল। আমার সঙ্গে তাহার বড় ভাব—সেও দাসী

আমিও দাসী—না হইবে কেন? আমি তাহাকে বলিলাম, "ঝি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর্। ঐ বাবুটী কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।"

হারাণী মৃদু হাসিল। বলিল, "ছি দিদি ঠাকরুণ! তোমার এ রোগ আছে, তা জানিতাম না।"

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, "মানুষের সকল দিন সমান যায় না। এখন তুই গুরুমহাশয়গিরি রাখ—আমার এ উপকার করবি কি না বল্?"

হারাণী বলিল, "তোমার জন্য এ কাজ আমি করিব, কিন্তু আর কারো জন্য হইলে করিতাম না।"

হারাণীর নীতিশিক্ষা এইরূপ।

হারাণী স্বীকৃতা হইয়া গেল, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ততক্ষণ আমি কাটামাছের মত ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম। চারিদণ্ড পরে হারাণী ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "বাবুর অসুখ করিয়াছে—বাবু এ বেলা যাইতে পারিলেন না—আমি তাঁহার বিছানা লইতে আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কি জানি যদি অপরাহ্নে চলিয়া

যান,—তুই একটু নির্জ্জন পাইলেই তাঁহাকে বলিস্ যে আমাদের রাঁধুনী ঠাকুরাণী বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'এ বেলা আপনার খাওয়া ভাল হয় নাই, রাত্রি থাকিয়া খাইয়া যাইবেন। কিন্তু রাঁধুনীর নিমন্ত্রণ, কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিবেন না। কোনও ছল করিয়া থাকিবেন।' হারাণী আবার হাসিয়া বলিল, "ছি!" কিন্তু দৌত্য স্বীকৃত হইয়া গেল। হারাণী অপরাহ্ণে আসিয়া আমাকে বলিল, "তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহা বলিয়াছি। বাবুটি মানুষ ভাল নহেন—রাজি হইয়াছেন।"

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে একটু নিন্দা করিলাম। আমি চিনিয়াছিলাম যে, তিনি আমার স্বামী, এই জন্য যাহা করিতেছিলাম, তাহাতে আমার বিবেচনায় দোষ ছিল না। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এমত কোনও মতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম—এ জন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমত কোনও

লক্ষণও দেখি নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে মনে নিন্দা করিলাম। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী—তাঁহার মন্দ ভাবা আমার অকর্ত্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিলাম না। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কখন দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।

অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহাকে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতে হইল না। তিনি কলিকাতায় কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। রামরাম দত্তের সঙ্গে তাঁহার দেনা পাওনা ছিল। সেই সূত্রেই তাঁহার সঙ্গে নূতন আত্মীয়তা। অপরাহ্ণে হারাণীর কথায় স্বীকৃত হইয়া রামরামের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, "যদি আসিয়াছি, তবে একবার হিসাবটা দেখিয়া গেলে ভাল হইত।" রামরাম বাবু বলিলেন, "ক্ষতি কি? কিন্তু কাগজপত্র সব আড়তে আছে, আনিতে পাঠাই। আসিতে রাত্র হইবে। যদি অনুগ্রহ করিয়া কাল প্রাতে একবার পদার্পণ করেন—কিম্বা অদ্য অবস্থিতি করেন, তবেই

হইতে পারে।" কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, "তাহার বিচিত্র কি? এ আমারই ঘর। একবারে কাল প্রাতেই যাইব।"

[পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদের ভূরিভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে ; আমি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।]

"আমি মাতাকে বলিলাম, "আমি আসিয়াছি, এ এ কথা তাঁহাকে জানাইও না। আমি এতদিন ঘরে ছিলাম না, কি জানি তিনি যদি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন, তবে আসিবেন না। অন্য কোন ছলে এখানে তাঁহাকে আনাও। তিনি এখানে আসিলে আমি সন্দেহ মিটাইব।"

মাতা এ কথা পিতাকে বলিলে তিনি সম্মত হইলেন। পত্রে লিখিলেন, "আমি উইল করিব। তুমি আমার জামাতা এবং পরম আত্মীয় আর সদ্বিবেচক। অতএব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উইল করিব। তুমি পত্র পাঠ এখানে আসিবে।" তিনি পত্রপাঠ আসিলেন। তিনি এখানে আসিলে পিতা তাঁহাকে যথার্থ কথা জানাইলেন।

শুনিয়া স্বামী মৌনাবলম্বন করিলেন। পরে বলিলেন

"আপনি পূজ্য ব্যক্তি। যে ছলেই হউক এখানে আসিয়া যে আপনার দর্শন লাভ করিলাম, ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনার কন্যা এতদিন গৃহে ছিলেন না—কোথায় কি চরিত্রে কাহার গৃহে ছিলেন, তাহা কেহ জানে না। অতএব তাহাকে আমি গ্রহণ করিব না।"

পিতা মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইলেন। এ কথা মাতাকে বলিলেন, মা আমাকে বলিলেন। আমি সমবয়স্কদিগকে বলিলাম, "তোমরা উঁহাদিগকে চিন্তা করিতে মানা কর। তাঁকে একবার অন্তঃপুরে আন—তাহা হইলেই আমি উঁহাকে গ্রহণ করাইব।"

কিন্তু অন্তঃপুরে আসিতে কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন, "আমি সে স্ত্রীকে গ্রহণ করিব না, তাহাকে সম্ভাষণও করিব না।" শেষে মাতার রোদন ও সমবয়স্কদিগের ব্যঙ্গের জ্বালায় সন্ধ্যার পর অন্তঃপুরে জল খাইতে আসিলেন।

তিনি জলযোগ করিতে আসনে বসিলেন। কেহ তাঁহার নিকট দাঁড়াইল না—সকলেই সরিয়া গেল। তিনি অন্যমনে, মুখ নত করিয়া, আহার করিতেছিলেন, এমত সময়ে আমি নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া

দাঁড়াইয়া তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ দেখ্, কামিনী, তুই আজও কি কচি খুকি যে আমার ঘাড়ের উপর পড়িস্?"

কামিনী আমার কনিষ্ঠ ভগিনীর নাম।

আমি বলিলাম, "আমি কামিনী নই, কে বল, তবে ছাড়িব।"

আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এ কি এ?"

আমি তাঁহার চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "চতুরচূড়ামণি! আমার নাম ইন্দিরা—আমি হরমোহন দত্তের কন্যা, এই বাড়ীতে থাকি। আপনাকে প্রাতঃপ্রণাম—আপনার কুমুদিনীর মঙ্গল ত?"

তিনি অবাক হইলেন। আমাকে দেখিয়াই যে তাঁহার আহ্লাদ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। বলিলেন, "এ আবার কোন্ রঙ্গ কুমুদিনী? তুমি কোথা হইতে?" আমি বলিলাম, "কুমুদিনী আমার আর একটি নাম। তুমি বড় গোবরগণেশ, তাই এতদিন আমাকে চিনিতে পার নাই। কিন্তু তোমাকে যখন রামরাম দত্তের বাড়ী ভোজন করিতে দেখিয়াছিলাম, আমি

তখনই তোমাকে চিনিয়াছিলাম। নচেৎ সে দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম না। প্রাণাধিক—আমি কুলটা নহি।"

তিনি একটু আত্মবিস্মৃতের মত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এতদিন এত ছলনা করিয়াছিলে কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি প্রথম সাক্ষাতের দিনে বলিয়াছিলে যে, তোমার স্ত্রী পাইলেও গ্রহণ করিবে না। নচেৎ সেই দিন পরিচয় দিতাম।" দানপত্রখানি আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলাম। তাহা খুলিয়া দেখাইয়া বলিলাম, "সেই রাত্রেই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, হয় তুমি আমায় গ্রহণ করিবে, নচেৎ আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই এইখানি লেখাইয়া লইয়াছি। কিন্তু ইহা আমি ভাল করি নাই। তোমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছি। তোমার অভিরুচি হয়, আমি তোমার উঠান ঝাঁটি দিয়া খাইব—তাহা হইলেও তোমাকে দেখিতে পাইব, দানপত্র আমি এই নষ্ট করিলাম।"

এই বলিয়া সেই দানপত্র তাঁহার সম্মুখে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলাম।

তিনি গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমায় ত্যাগ করিলে আমি প্রাণে মরিব। তুমি আমার গৃহে গৃহিণী হইবে চল।"

মৃণালিনী।

মৃণালিনীর প্রথম দুই পরিচ্ছেদ সপ্তম বা অষ্টম সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই দুই পরিচ্ছেদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রঙ্গভূমি।

মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি তুর্কস্থানীয় কুতব-উদ্দীন, যুধিষ্ঠির ও পৃথ্বীরাজের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। দিল্লী, কান্যকুব্জ, মগধাদি প্রাচীন সাম্রাজ্য সকল যবন করকবলিত হইয়াছে। অশোক বা হর্ষবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্য বা শিলাদিত্য ইহাঁদের পরিত্যক্ত ছত্রতলে

যবনমুণ্ড আশ্রিত হইয়াছে। যবনের শ্বেতছত্রে সকলের গৌরব ছায়ান্ধকারব্যাপ্ত করিয়াছে।

বঙ্গীয় ৬০৬ অব্দে যবন কর্ত্তৃক মগধ জয় হইল। *প্রভূত রত্নরাশি সঞ্চিত করিয়া বিজয়ী সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজি রাজপ্রতিনিধির চরণে উপঢৌকন প্রদান করিলেন।

কুতব-উদ্দীন প্রসন্ন হইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে পূর্ব্ব ভারতের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। গৌরবে বখ্‌তিয়ার খিলিজি রাজ-প্রতিনিধির সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন।

কেবল ইহাই নহে, বিজয়ী সেনাপতির সম্মানার্থে কুতব-উদ্দিন মহাসমারোহপূর্ব্বক উৎসবাদির জন্য দিনাবধারিত করিলেন।

উৎসববাসর আগত হইল। প্রভাতাবধি "রায় পিথোরার" প্রস্তরময় দুর্গের প্রাঙ্গণভূমি জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। সশস্ত্রে, শত শত সিন্ধুনদপারবাসী শ্মশ্রুল যোদ্ধৃবর্গ রঙ্গাঙ্গনের চারিপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল; তাহাদিগের করস্থিত উন্নতফলক বর্শার অগ্রভাগে প্রাতঃসূর্য্যকিরণ জ্বলিতে লাগিল। মালাসংবদ্ধ

কুসুমদামের ন্যায় তাহাদিগের বিচিত্র উষ্ণীষশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল। তৎপশ্চাতে দাস, শিল্পী প্রভৃতি অপর মুসলমানেরা বিবিধ বেশভূষা করিয়া দণ্ডায়মান হইল। যে দুই এক জন হিন্দু কৌতূহলের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া, সাহসে ভর করিয়া রঙ্গদর্শনে আসিযাছিল, তাহারা তৎপশ্চাতে স্থান পাইল, অথবা স্থান পাইল না, কেন না, যবনদিগের বেত্রাঘাত-পীড়িত এবং ভীত হইয়া অনেককে পলায়ন করিতে হইল।

রাজপ্রতিনিধি সদলে সমাগত হইয়া রঙ্গাঙ্গনের শিরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন রহস্য আরম্ভ হইল। প্রথমে মল্লদিগের যুদ্ধ, পরে খড়্গী, শূলী, ধানুকী সশস্ত্র অশ্বারোহীর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে মত্ত সেনামাতঙ্গ সকল মাহুতসহিত আনীত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে লাগিল। দর্শকেরা মধ্যে মধ্যে একতানমনে ক্রীড়া সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আপন আপন মন্তব্য সকল পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। একস্থানে কয়েকটি বর্ষীয়ান মুসলমান একত্র হইয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন।

এক জন কহিল, "সত্য সত্যই কি পারিবে?"

অপর উত্তর করিল, "না পারিবে কেন? ঈশ্বর যাহাকে সদয়, সে কি না পারে? রোস্তম পাহাড় বিদীর্ণ করিয়াছিল, তবে বখ্তিয়ার যুদ্ধে একটা হাতী মারিতে পারিবে না?"

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "যদ্যপি উহার ঐ ত বানরের ন্যায় শরীর, এ শরীর লইয়া মত্তহস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে সাহস করা পাগলের কাজ।"

প্রথম প্রস্তাবকর্তা কহিল "বোধ হয় নির্বোধ খিলিজি-পুত্র একণে তাহা বুঝিয়াছে, সেই জন্য এখনও অগ্রসর হইতেছে না।"

আর এক ব্যক্তি কহিল, "আরে, বুঝিতেছ না, বখ্তিয়ারের মৃত্যুর জন্য পাঁচ জন ষড়যন্ত্র করিয়া এই এক উপায় করিয়াছে। বেহার জয় করিয়া বখ্তিয়ারের বড় যশ হইয়াছে। আর রাজপ্রসাদ সকলই তিনি একক ভোগ করিতেছেন। এই জন্য পাঁচ জনে বলিল যে, বখ্তিয়ার অমানুষ বলবান, চাহ কি মত্ত হাতী একা মারিতে পারে। কুতব-উদ্দীন তাহা দেখিতে চাহিলেন। বখ্তিয়ার দর্পে মত্ত হইতে

পারিলেন না, সুতরাং অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন।”

এই বলিতে বলিতে রঙ্গাঙ্গনমধ্যে তুমুল কোলাহল-ধ্বনি সংঘোষিত হইল। দ্রষ্টৃবর্গ সভয়চক্ষে দেখিলেন, পর্বতাকার শ্রাবণের দিগন্তব্যাপী জলদাকার এক মত্ত মাতঙ্গ মাহুতকর্তৃক আনীত হইয়া রঙ্গাঙ্গনমধ্যে দুলিতে দুলিতে প্রবেশ করিল। তাহার মুহুর্মুহুঃ শুণ্ডাস্ফালন, মুহুর্মুহুঃ বিপুল কর্ণতাড়ন, এবং বিশাল বঙ্কিম দন্তদ্বয়ের অমলশ্বেত স্থির শোভা দেখিয়া, দর্শকেরা সভয়ে পশ্চাদ্গত হইয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাদপসারী দর্শকদিগের বস্ত্রমর্মরে, ভয়সূচক বাক্যে, এবং পদধ্বনিতে কিয়ৎক্ষণ রঙ্গাঙ্গনমধ্যে অস্ফুট কলরব হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যে সে কলরব নিবৃত্ত হইল।

কৌতূহলের আতিশয্যে সেই জনাকীর্ণ স্থল একেবারে শব্দহীন হইল। সকলে রুদ্ধনিশ্বাসে বখ্‌তিয়ার খিলিজির রঙ্গপ্রবেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন বখ্‌তিয়ার খিলিজিও রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া গজরাজের সম্মুখীন হইয়া দেখা দিলেন। যাহারা পূর্ব্বে তাঁহাকে চিনিত না, তাহারা তাঁহাকে

দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, অপিচ বিরক্ত হইল। তাঁহার শরীরে বৈর-লক্ষণ কিছুই ছিল না। তাঁহার দেহের আয়তন অতি ক্ষুদ্র, গঠন অতি কদর্য্য। শরীরের সকল স্থানই দোষবিশিষ্ট। তাঁহার বাহুযুগল বিশেষ কুরূপশালিত্বের কারণ হইয়াছিল। "আজানু-লম্বিত বাহু" সুলক্ষণ হইলে হইতে পারে, কিন্তু দেখিতে কদর্য্য সন্দেহ নাই। বখ্তিয়ারের বাহুযুগল জানুর অধোভাগ পর্য্যন্ত লম্বিত, সুতরাং অরণ্যনরের সহিত তাঁহার দৃশ্যগত সাদৃশ্য লক্ষিত হইত। তাঁহাকে দেখিয়া একজন মুসলমান আর এক জনকে কহিল, "ইনিই বেহার জয় করিয়াছেন? এই শরীরে এত বল?"

এক জন অস্ত্রধারী হিন্দু যুবা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল, "পবননন্দন হনু কলিকালে মর্কটরূপ ধারণ করিয়াছেন।"

যবন কহিল, "তুই কি বলিস্ রে কাফের?"

হিন্দু পুনরপি কহিল, "পবননন্দন কলিতে মর্কটরূপ ধারণ করিয়াছেন।"

যবন কহিল, "আমি তোর কথা বুঝিতে পারিতেছি না, তুই তীর-ধনু লইয়া আসিয়াছিস কেন?"

হিন্দু কহিল, "আমি বাল্যকালে তীর-ধনু লইয়া খেলা করিতাম। সেই অবধি অভ্যাসদোষে তীর-ধনু আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

যবন কহিল, "হিন্দুদিগের সে অভ্যাসদোষ ক্রমে ঘুচিতেছে। এ খেলায় আর এখন কাফেরের সুখ নাই। সুভান এল্লা! এ কি?"

এই বলিয়া যবন রঙ্গভূমি প্রতি অনিমেষ-লোচনে চাহিয়া রহিল। বখ্তিয়ার নিজ দীর্ঘভুজে এক শাণিত কুঠার ধারণ করিয়া বারণরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু বারণ তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া ইতস্ততঃ সমযোগ্য প্রতিযোগীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্রকায় একজন মনুষ্য যে তাহার রণাকাঙ্ক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা তাহার হস্তিবুদ্ধিতে উপজিল না। বখ্তিয়ার মাহুতকে অনুজ্ঞা করিলেন যে, হস্তীকে তাড়াইয়া আমার উপর দাও। মাহুত গজশরীরে চরণাঙ্গুলি-সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বখ্তিয়ারকে আক্রমণ করিল। বখ্তিয়ার নিমেষমধ্যে করিশুণ্ডপ্রক্ষেপ হইতে ব্যবহিত হইয়া শুণ্ডোপরি তীব্র কুঠারাঘাত করিল। যূথপতি ব্যথায় ভীষণ চীৎকার

করিয়া উঠিল, এবং ক্রোধে পতনশীল পর্ব্বতবৎ বেগে প্রহারকারীর প্রতি ধাবমান হইল। কুঠারাঘাতে সে বেগরোধের কোন সম্ভাবনা রহিল না। দ্রষ্টৃবর্গ সকলে দেখিল যে, পলকমধ্যে বখ্তিয়ার কর্দ্দম-পিণ্ডবৎ দলিত হইবেন। সকলে বাহূত্তোলন করিয়া "পলাও পলাও" শব্দ করিতে লাগিল। কিন্তু বখ্তিয়ার মগধ জয় করিয়া আসিয়া রঙ্গভূমে পলায়নতৎপর হইবেন কি প্রকারে? তিনি তদপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া হস্তিপদতলে প্রাণত্যাগ মনে মনে স্বীকার করিলেন।

করিরাজ আত্মবেগভরে তাঁহার পৃষ্ঠের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল; একেবারে বখ্তিয়ারকে দলিত করিবার মানসে নিজ বিশাল চরণ উত্তোলন করিল; কিন্তু তাহা বখ্তিয়ারের স্কন্ধে স্থাপিত হইতে না হইতেই ক্ষয়িতমূল অট্টালিকার ন্যায়, সশব্দে রক্ত উৎকীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ যূথপতি ভূতলে পড়িয়া গেল। অমনি তাহার মৃত্যু হইল।

যাহারা সবিশেষ দেখিতে না পাইল, তাহারা বিবেচনা করিল যে, বখ্তিয়ার খিলিজি কোন কৌশলে

হস্তীর বধসাধন করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ মুসলমান-মণ্ডলীমধ্যে ঘোরতর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। কিন্তু অন্যে দেখিতে পাইল যে হস্তীর গ্রীবার উপর একটী তীর বিদ্ধ রহিয়াছে। কুতবউদ্দীন বিস্মিত হইয়া সবিশেষ জানিবার জন্য মৃত গজের নিকট আসিলেন, এবং স্বীয় অস্ত্রবিদ্যার প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, এই শরবেধই হস্তীর মৃত্যুর একমাত্র কারণ; বুঝিলেন যে, শর অসাধারণ বাহুবলে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে হস্তিচর্ম্ম, তৎপরে হস্তিগ্রীবার বিপুল মাংসরাশি ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক বিদ্ধ করিয়াছে। শরনিক্ষেপকারীর আরও এক অপূর্ব্ব নৈপুণ্য লক্ষণ দেখিলেন। গ্রীবার যে স্থানে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডমধ্যস্থ মজ্জার সংযোগ হইয়াছে, সেই স্থানেই তীর প্রবিদ্ধ হইয়াছে। তথায় সূচীমাত্র প্রবিষ্ট হইলে জীবের প্রাণ বিনষ্ট হয়—পলকমাত্রও বিলম্ব হয় না। এই স্থানে শর বিদ্ধ না হইলে কখনই বখ্‌তিয়ারের রক্ষা সিদ্ধ হইত না। কুতবউদ্দীন আরও দেখিলেন, তীরের গঠন সাধারণ হইতে ভিন্ন। তাহার ফলক অতি দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, এবং একটী বিশেষ চিহ্নে অঙ্কিত। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে,

যে ব্যক্তি এই শরত্যাগ করিয়াছিল, সে অসাধারণ বাহু-বলশালী; তাহার শিক্ষা বিচিত্র, এবং হস্ত অতি লঘুগতি।

কুতব-উদ্দীন গজঘাতী প্রহরণ হস্তে গ্রহণ করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন যে, "এ তীর কে ত্যাগ করিয়াছিল?"

কেহ উত্তর দিল না। কুতব-উদ্দীন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তীর কে ত্যাগ করিয়াছিল?"

যে যবন জনৈক হিন্দু শস্ত্রধারীকে তাড়না করিয়া-ছিল, সে এইবার কহিল, "জাঁহাপনা! একজন কাফের এই স্থানেই দাঁড়াইয়া তীর মারিয়াছিল দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাকে আর দেখিতেছি না।"

কুতব-উদ্দীন ভ্রূকুটী করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিমনা হইয়া রহিলেন; পরে কহিলেন, "বখতিয়ার খিলিজি মত্ত-হস্তী যুদ্ধে বধ করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার প্রশংসা কর। কোন কাফের তাঁহার গৌরবের লাঘব জন্মাই-বার অভিলাষে অথবা তাঁহার প্রাণসংহার জন্য এই তীরক্ষেপ করিয়া থাকিবে। আমি তাহার সন্ধান করিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। তোমরা সকলে গৃহে গিয়া আজিকার দিন আনন্দে যাপন করিও।"

ইহা শুনিয়া দর্শকগণ ধন্যবাদপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে উদ্‌যুক্ত হইল। ইত্যবসরে কুতবউদ্দীন এক জন পারিষদ্‌কে হস্তস্থিত তীর প্রদান করিয়া তাহার কর্ণে কর্ণে উপদেশ দিলেন; “যাহার নিকট এইরূপ তীর দেখিবে, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। অনেক সন্ধান কর।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——:*:——

গজহন্তা।

কুতব-উদ্দীন, দেওয়ানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বখ্‌তিয়ার খিলিজি এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ লইয়া কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, এমত সময়ে কয়েক জন সৈনিক পূর্ব্বপরিচিত হিন্দুযুবাকে সশস্ত্র ধৃত করিয়া আনয়ন করিল।

রক্ষিগণ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া যুবাকে রাজপ্রতিনিধি-সমক্ষে উপস্থিত করিলে, কুতবউদ্দীন বিশেষ মনোযোগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যুবকের

অবয়বও নিরীক্ষণযোগ্য। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের ন্যূন। শরীর ঈষন্মাত্র দীর্ঘ, এবং অনতি-স্থূল ও বলব্যঞ্জক। মস্তক যেরূপ পরিমিত হইলে শরীরের উপযোগী হইত, তদপেক্ষা বৃহৎ, এবং তাহার গঠন অতি রমণীয়। ললাট প্রশস্ত বটে কিন্তু অল্পবয়ঃপ্রযুক্ত অতি বৃহৎ, তাহার মধ্যদেশে "রাজদণ্ড" নামে পরিচিত শিরা প্রকটিত। ভ্রূযুগল সূক্ষ্ম, তরললোম, তত্তলস্থ অস্থি কিছু উন্নত। চক্ষু বিশেষ আয়ত নহে, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য-গুণে আয়ত বলিয়া বোধ হইত। নাসা মুখের উপযোগী; অত্যন্ত দীর্ঘ নহে, কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, সর্ব্বদা পরস্পরে সংশ্লিষ্ট; পার্শ্বভাগে অস্পষ্ট মণ্ডলার্দ্ধ রেখায় বেষ্টিত। ওষ্ঠে ও চিবুকে কোমল নবীন রোমাবলী শোভা পাইতেছিল। অঙ্গের গঠন বলসূচক হইলেও কর্কশতাশূন্য। বর্ণ প্রায় সম্পূর্ণ গৌর। অঙ্গে কবচ, মস্তকে উষ্ণীষ, পৃষ্ঠে তূণীর লম্বিত, করে ধনুঃ, কটিবন্ধে অসি।

কুতব-উদ্দীন যুবাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া যুবা ভ্রূকুটী করিলেন, এবং কুতবকে কহিলেন, "আপনার কি আজ্ঞা?"

শুনিয়া কুতব হাসিলেন; বলিলেন, "তুমি কি শর-ত্যাগে আমার হস্তী বধ করিয়াছ?"

যুবা। করিয়াছি।

কু। কেন তুমি আমার হাতী মারিলে?

যুবা। না মারিলে হাতী আপনার সেনাপতিকে মারিত।

ইহা শুনিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বলিলেন, "হাতী আমার কি করিত?"

যুবা। চরণে দলিত করিত।

বখ্‌। আমার কুঠার কি জন্য ছিল?

যুবা। হস্তীকে পিপীলিকা-দংশনের ক্লেশানুভব করাইবার জন্য।

কুতব উদ্দীনের ওষ্ঠাধরপ্রান্তে অল্পমাত্র হাস্য প্রকটিত হইল।

সেনাপতি অপ্রতিভ হয়েন দেখিয়া কুতব-উদ্দীন তখন কহিলেন, "তুমি হিন্দু, মুসলমানের বল জান না। সেনাপতি অনায়াসে কুঠারাঘাতে হস্তী বধ করিত। তথাপি তুমি যে সেনাপতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তীরত্যাগ করিয়াছিলে—ইহাতে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম।

তোমাকে পুরস্কৃত করিব।" এই বলিয়া কুতব-উদ্দীন কোষাধ্যক্ষের প্রতি যুবাকে শতমুদ্রা দিতে অনুমতি করিলেন।

যুবা শুনিয়া কহিলেন, "যবনরাজপ্রতিনিধি! শুনিয়া লজ্জিত হইলাম। যবন সেনাপতির জীবনের মূল্য শত মুদ্রা?"

কুতব-উদ্দীন কহিলেন, "তুমি রক্ষা না করিলে যে সেনাপতির জীবন বিনষ্ট হইত, এমত নহে। তথাপি সেনাপতির মর্য্যাদানুসারে দান উচিত বটে। তোমাকে সহস্র মুদ্রা দিতে অনুমতি করিলাম।"

যুবা। যবনের বদান্যতায় অতি সন্তুষ্ট হইলাম। আমিও আপনাকে প্রতিপুরস্কৃত করিব। যমুনাতীরে আমার বাসগৃহ, সেই পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এক জন লোক দিলে, আমি আপনার পুরস্কার পাঠাইব। যদি রত্ন অপেক্ষা মুদ্রায় আপনার আদর অধিক হয়, তবে আমার প্রদত্ত রত্ন বিক্রয় করিবেন। দিল্লীর শ্রেষ্ঠীরা তদ্বিনিময়ে আপনাকে লক্ষ মুদ্রা দিবে।

কুতব-উদ্দীন কহিলেন, "হইতে পারে, তুমি ধনী। এজন্য সহস্র মুদ্রা তোমার গ্রহণযোগ্য নহে। কি

তোমার বাক্য সম্মানসূচক নহে—তুমি সদভিপ্রেত কার্য্যে উদ্যত হইয়াছিলে বলিয়া অনেক ক্ষমা করিয়াছি—অধিক ক্ষমা করিব না। আমি যে তোমার রাজার প্রতিনিধি, তাহা তুমি কি বিস্মৃত হইলে ?"

যুবা। আমার রাজার প্রতিনিধি ম্লেচ্ছ নহে।

কুতব-উদ্দীন সকোপ-কটাক্ষে কহিলেন, "তবে কে তোমার রাজা ? কোন্ দেশে তোমার বাস ?"

যুবা। মগধে আমার বাস।

কুত। মগধ এ বখ্‌তিয়ার কর্তৃক যবন-রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

যুবা। মগধ দস্যুকর্তৃক পীড়িত হইয়াছে।

কুত। দস্যু কে ?

যুবা। বখ্‌তিয়ার খিলিজি।

কুতব-উদ্দীনের চক্ষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। কহিলেন, "তোমার মৃত্যু উপস্থিত।"

যুবা হাসিয়া কহিলেন, "দস্যুহস্তে ?"

কুত। আমার আজ্ঞায় তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। আমি যবন-সম্রাটের প্রতিনিধি।

যুবা। আপনি যবন-দস্যুর ক্রীতদাস।

কুতব-উদ্দীন ক্রোধে কম্পিত হইলেন। কিন্তু নিঃসহায় যুবকের সাহস দেখিয়াও বিস্মিত হইলেন। কুতব-উদ্দীন রক্ষিবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহাকে বন্ধন করিয়া বধ কর।"

বখ্‌তিয়ার খিলিজি ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিলেন, পরে কুতবকে বিনয় করিয়া কহিলেন, "প্রভো! এই হিন্দু বাতুল, নচেৎ অনর্থক কেন মৃত্যুকামনা করিবে? ইহাকে বধ করাতে অপৌরুষ।"

যুবা বখ্‌তিয়ারের মনের ভাব বুঝিয়া হাসিলেন; বলিলেন, "খিলিজি সাহেব! বুঝিলাম, আপনি অকৃতজ্ঞ নহেন। আমি হস্তিচরণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছি বলিয়া আপনি আমার প্রাণ রক্ষার জন্য যত্ন করিতেছেন; কিন্তু নিবৃত্ত হউন। আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় হস্তিবধ করি নাই। আপনাকে এক দিন স্বহস্তে বধ করিব বলিয়া আপনাকে হস্তিচরণ হইতে রক্ষা করিয়াছি।"

রাজপ্রতিনিধি এবং সেনাপতি উভয়ে উভয়ের মুখাবলোকন করিলেন। খিলিজি কহিলেন, "তুমি নিশ্চয় বাতুল। আপনি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছ, অন্যে

রক্ষা করিতে গেলে তাহারও প্রতিবন্ধক হইতেছ। ভাল, আমাকে স্বহস্তে বধ করিবার এত সাধ কেন?"

যুব। কেন? তুমি আমার পিতৃরাজ্যাপহরণ করিয়াছ। আমি মগধরাজপুত্র। যুদ্ধকালে হেমচন্দ্র মগধে থাকিলে তাহা যবনদস্যু জয় করিতে পারিত না। অপহারী দস্যুর প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিত।

বখ্তিয়ার কহিলেন, "এখন বাঁচিলে ত?"

কুতব-উদ্দীন কহিলেন, "তোমার যে পরিচয় দিতেছ এবং তোমার যেরূপ স্পর্দ্ধা, তাহাতে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি এক্ষণে কারাগারে বাস করিবে। পশ্চাৎ তোমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবে। রক্ষিগণ, এখন ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও।"

রক্ষিগণ হেমচন্দ্রকে বেষ্টিত করিয়া চলিল। কুতব-উদ্দীন তখন বখ্তিয়ারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাহেব, এই হিন্দুকে কি ভাবিতেছেন?"

বখ্তিয়ার কহিলেন, "অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ। যদি কখন হিন্দুসেনা পুনর্ব্বার সমবেত হয়, তবে এ ব্যক্তি সকলকে অগ্নিময় করিবে।"

কুত। সুতরাং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ করা কর্ত্তব্য।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, ইত্যবসরে দুর্গমধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। ক্ষণপরে পুররক্ষিগণ আসিয়া সংবাদ দিল, "বন্দী পলাইয়াছে।"

কুতব-উদ্দীন ভ্রূভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে হইল?"

রক্ষিগণ কহিল, "দুর্গমধ্যে একজন যবন একটা অশ্ব লইয়া ফিরাইতেছিল। আমরা বিবেচনা করিলাম যে, কোন সৈনিকের অশ্ব। আমরা ঘোটকের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তাহার নিকটে আসিবামাত্র বন্দী চকিতের ন্যায় লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিল এবং অশ্বে কশাঘাত করিয়া বায়ুবেগে দুর্গদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

কুত। তোমরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে না কেন?

রক্ষী। আমরা অশ্ব আনিতে আনিতে সে দৃষ্টি-পথের অতীত হইল।

কুত। তীর মারিলে না কেন?

রক্ষী। মারিয়াছিলাম। তাহার কবচে ঠেকিয়া তীর সকল মাটীতে পড়িল।

কুত। যে যবন অশ্ব লইয়া ফিরাইতেছিল, সে কোথায়?

রক্ষী। প্রথমে আমরা বন্দীর প্রতিই মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। পশ্চাৎ অশ্বপালের সন্ধান করায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

কয়েকটী নারী-চরিত্র।

কপালকুণ্ডলা।

আমি একবার নীলগিরি পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পাহাড়ের গায় স্থানে স্থানে গভীর জঙ্গল ছিল। জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানে দেখি, একটী বিচিত্র ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এমন ফুল এ দেশে আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারিলাম না। নিকটে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে ফুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "এ ফুল প্রকৃতিদেবী নিজে গড়িয়াছেন, কোথাও একটু মলা নাই—দাগ নাই।"

"ফুলের ধর্ম্ম কি?"

"ঈশ্বরে বিশ্বাস—জীবে দয়া—আত্মত্যাগ।"

"ফুলটি গৃহে লইয়া যাইতে চাই।"

"লইয়া যাইতে পার, কিন্তু বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে কি? সেখানে যে বড় ময়লা, বড় ধূলা।"

"সাধ্যমত চেষ্টা করিব।"

"কিন্তু তোমরা সংসারী, ফুলের নিকট যাহা প্রত্যাশ করিতেছ, তাহা পাইবে না।"

শৈবলিনী।

শৈবলিনীর প্রণয় রিপু-গন্ধে কলুষিত। তাই সে গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরিতে পারে নাই—তাই তাহার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়াছিল।

কুন্দনন্দিনী।

একবার একটা পেঁপ্‌চাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমার ধর্ম্ম কি?"

সে উত্তর করিয়াছিল, "আমার আবার ধর্ম্ম কি ?—আমার ধর্ম্ম লেপ্ চা।"

কুন্দনন্দিনীরও ঠিক তাই। নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসা ছাড়া তাহার অন্য ধর্ম্ম ছিল না।

ভ্রমর।

ভ্রমর যে দিন তাহার স্বামীকে বলিয়াছে, "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী ততদিন আমারও বিশ্বাস", সেই দিন ভ্রমর আদর্শ স্ত্রীর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

ভ্রমরের স্বামী-ভক্তি Westernised, তাই সে অকালে মরিল।

কমলমণি।

কমলমণি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; কিন্তু তাহার জীবনে উদ্বেল নাই, তরঙ্গ নাই। আমরা তাহার হৃদয়ের গভীরতা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইলাম না। শ্রীশচন্দ্র যদি কুন্দকে গৃহে আনিয়া তাহাতে অনুরক্ত হইয়া কমলমণিকে বলিতেন, "তোমাতে আর আমার সুখ

নাই," তাহা হইলে কমলমণিকে দেখিবার আমরা সুযোগ পাইতাম। নিরবিচ্ছিন্ন সুখের অধিকারিণী কমলমণির ব্যবস্থা শুনিলাম, কিন্তু তাহার শক্তি দেখিতে পাইলাম না।

আয়েষা।

এক আয়েষা লইয়া "দুর্গেশনন্দিনী"। এমন ধৈর্য্যময়ী নারীচরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ মধ্যেও বিরল। যে দিন আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় পরিখার জলে নিক্ষেপ করিল, সেই দিন আয়েষার চরিত্র পূর্ণ হইল।

লবঙ্গলতা।

লবঙ্গলতার তুল্য পতিব্রতা রমণী সংসারে বিরল। কিন্তু লবঙ্গলতা যদি অমরনাথের সহিত শেষ সাক্ষাতের সময় না কাঁদিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আরও সুন্দর দেখিতাম। লবঙ্গলতা যদি না বলিতেন, "এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—," তাহা হইলে লবঙ্গলতা তুলনারহিত হইতেন। এতটা শক্তি বুঝি এ জগতে সম্ভবপর নয়।

অপ্রকাশিত রচনা।

নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ভাল, সারি, সত্য বল দেখি, তোমার বিশ্বাস কি? ভূত আছে?"

বরদা, ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যার পর, টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল—একটু রোষ্ট মটন প্লেটে করিয়া, ছুরিকাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল। সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুকরা রোষ্টে উত্তম করিয়া মাষ্টার্ড মাখাইয়া বদনমধ্যে প্রেরণপূর্ব্বক, আধখানা আলুকে তৎসহিত প্রেরণ করিয়া, একটু রুটী ভাঙ্গিয়া বাম

* এই ভূতের গল্পটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গল্পটি আর সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। শুনিতে পাই, সাহিত্য-পত্রের জন্য এ গল্পটি লিখিত হইতেছিল। মৃত্যুর পর ইহা সুরেশ বাবুর নিকট প্রেরিত হয়। পরে আমি হেমেন্দ্র বাবুর নিকট পাইয়াছি।

হস্তে রক্ষাপূর্ব্বক, অগ্রজের মুখ পানে চাহিতে চাহিতে চর্ব্বণ কার্য্য সমাপন করিল, পরে একটুকু সেরি দিয়া গলাটা ভিজাইয়া লইয়া বলিল, "ভূত ? না।"

এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ যেন পরলোকগত এবং সুসিদ্ধ মেষশাবকের অবশিষ্টাংশকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। বরদাকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, "rather laconic."

সারদাকৃষ্ণের রসনার সহিত রসাল মেষমাংসের পুনরালাপ হইতেছিল, অতএব সহসা উত্তর করিল না। যথাবিহিত সময়ে, অবসর প্রাপণান্তর তিনি বলিলেন, "Laconic ? বরং একটা কথা বেশী বলিয়াছি, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে 'ভূত আছে'—আমি বলিলেই হই "না।" আমি বলিয়াছি, "ভূত ? না।" "ভূত ? কথাটা বেশী বলিয়াছি কেবল তোমার খাতিরে।"

"অতএব তোমার ভ্রাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ, এ স্বর্গপ্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ দেওয়া গেল।" এই বলিয়া বরদা, আর কিছু মটন কাটিয়া ভ্রাতা প্লেটে ফেলিয়া দিলেন। সারদা অবিচলিতচিত্তে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিল।

তখন বরদা বলিল, "seriously সারি, ভূত আছে বিশ্বাস কর না ?"

সারি। না।

বর্ষার মানভঞ্জন।

নায়কের উক্তি।

ত্রিপদী।

বিধুমুখি করে মান, কিরূপ দেখালে প্রাণ,
হেরিতেছি অপরূপ ভাব ;
বরষার আবির্ভাবে, প্রফুল্ল সরস ভাবে
রহিয়াছে সকল স্বভাব।
বন উপবন চয় রসময় সমুদয়
রসপূর্ণ যত জীবগণ ;
কিন্তু কি আশ্চর্য্য কব, এ সবার মাঝে তব
কেন প্রিয়ে বিরস বদন।
বুঝেছি কারণ তার, দোষ দিব কি তোমার
বরষকালেতে সব করে ;

সুধাকর এই কালে, জড়িত জলদ জালে
স্বভাবে মলিন ভাব ধরে।
গগনের শশধরে, যদি এই ভাব ধরে,
শোভাহীন হয়ে সদা রয় ;
তব মুখচন্দ্র তবে কেন বল নাহি হবে
সেরূপ বিরূপ অতিশয়।
আকাশেতে জলধর, মনোহর নিশাকর
ঢাকি আছে দিবস যামিনী ;
কেন না তোমার তবে, শশীমুখ ঢাকা রবে
অম্বর অম্বরে বিনোদিনী।
মান ভাঙ্গিবার তরে ধরিলাম দুই করে
মুখ পদ্মে কর-পদ্ম দিলে ;
বুঝি এই ভাব তার, আগমনে বরষার
কমলিনী মুদিতা সলিলে।
এ কালের প্রতিকূল কাননে কোকিল কুল
কুহু কুহু কাকলি না করে।
কোকিল বাদিনী বুঝি, তাই আছে মুখ বুজি
মৌনবতী বরষার ডরে।

গগণের যত তারা বরষা কালেতে তারা
সদা কাল নহে প্রকটিত;
তাই বুঝি জ্যোতিহারা, তোমার নয়ন তারা
অভিমানে রয়েছে মুদিত।
বরষার অনুক্ষণ, বারিধারা বরিষণ
ধারে ধারে ধরাপূর্ণ তায়,
তাই বুঝি নিরন্তর, তব নেত্র-নীরধর
নীর-ধারে ফেলিছে ধরায়।

নায়িকার উক্তি।

পয়ার।

শুনিয়া শেষের শ্লেষ কুপিল কামিনী;
বিধুমুখে মৃদুরবে কহিল মানিনী।
বরষার ধর্ম্ম যদি বারি বরিষণ,
তবে কেন জলহীন তোমার নয়ন।
দুঃখিনীর দুঃখ তাপে হইয়া সদয়,
তোমার নয়নে কেন বৃষ্টি নাহি হয়।
পলকে পলকে তার নলকে দামিনী।
মানে মানে মান হরি মানিনী ভামিনী,

গরবেতে গৃহে যায় গজেন্দ্র গামিনী।
মানের নিগূঢ় ভাব শেষে গেল বোঝা,
সুখেতে বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন সোজা।*

বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য।†

বাঙ্গালায় জনসাধারণের পাঠ্য ও সেব্য সাহিত্য বলিতে হইলে খাঁটী বাঙ্গালা সাহিত্যকেই বুঝাইবে। এখনও বহুকাল বাঙ্গালীর সাহিত্য বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য হইয়া থাকিবে। যতদিন এদেশে উচ্চ-শিক্ষা ইংরেজী ভাষার সাহায্যে প্রচারিত হইবে, যতদিন

---

* এই কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের রচনা। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ইহা সাহিত্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়ের হস্তলিখিত নোটবুক হইতে কবিতাটি পাওয়া গিয়াছিল।

† ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রচিত ও পঠিত ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে অনূদিত, এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে "সাহিত্য"-পত্রে প্রকাশিত।

ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান উহাদের উচ্চ আদর্শ ও পদবী রক্ষা করিতে পারিবে, ততদিন উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি ভাষার সাহায্যে মনীষার উৎকর্ষ সাধন করিবেন; বঙ্গসাহিত্য ততদিন বঙ্গদেশের লোক সাধারণের পাঠ্য ও সেব্য সাহিত্য হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য যে, পুরাতন ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য এই নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত থাকিলেও লোকশিক্ষার কার্য্যে তেমন পর্য্যাপ্ত নহে।

অনেকের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা সাহিত্য অতি অল্প-লোকেই পড়িয়া থাকে; এ দেশের শিক্ষিত মাত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন না; তাঁহারা ইংরেজি পুস্তকই পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত রহিয়াছে; তবে উহা যে সম্পূর্ণ প্রকৃত কথা, তাহা বলিতে পারি না। হইতে পারে যে, অতি অল্প লোকই রীতিমত বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, কেন না বাঙ্গালায় অতি অল্প পুস্তকই আছে, যাহা আগাগোড়া পড়া চলে। তবে এই ধারণা ঠিক নহে যে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা পুস্তক পাঠকের সংখ্যা এতই অল্প যে, তাহাকে নগণ্য বলিলেও

চলে। দেশের শিল্পী, দোকানদার, যাহারা নিজ নিজ ব্যবসায়ের হিসাব রাখিতে পারে, এবং রাখিয়া থাকে, গ্রাম্য জমীদার ও মফস্বলের ব্যবহারাজীব, সরকারী কাছারীর নিম্নস্তরের কর্ম্মচারী, যাহাদের ইংরেজী বিদ্যা আফিসের কার্য্যের সীমায় নিবদ্ধ, এবং গ্রাম্য তালুকদার যাহারা ইংরাজীও জানে না, কাছারির কাজও বুঝে না— এবংবিধ সকল শ্রেণীর লোকেই বাঙ্গালা পুস্তকই পাঠ করে; ইহারাই বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা করে। অর্থাৎ নিরক্ষর কৃষক ও উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজীনবীশের মধ্যে যাহারা আছে, তাহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাবে ও বিস্তারে যাহারা লেখাপড়া শিখিবে, তাহারাও এই বঙ্গসাহিত্যেরই পঠন-পাঠনে রত থাকিবে। অবশ্য, এই দেশীয় শিক্ষাকে সর্ব্ববিষয়ে, দেশের ও সমাজের উপযোগী করিয়া, উহার দ্বারা জ্ঞানসাধন করিতে হইবে। এই সকল লোকের জন্যই বঙ্গসাহিত্যের প্রয়োজন। এই সাহিত্য বাঙ্গালার লোকসাধারণের সাহিত্যই হইবে; কারণ, এই সকল শ্রেণীর লোকেই জাতির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে; ইহারাই জনসাধারণ।

আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী, আমাদের অদ্ভুত বিস্মৃতির প্রভাব। আমরা ভুলিয়া যাই যে, কেবল এই বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যেই বাঙ্গালী জাতিকে আমরা কোনও একটা ভাবে বিচলিত বা উত্তেজিত করিতে পারি। অথচ আমরা ইংরেজী ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করি, ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করি, গদ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি। তখন আমাদের মনে থাকে না যে, দেশের জনসাধারণ ইংরেজী ভাষাবোধে একেবারেই বধির; তাহারা আমাদের ব্যবহৃত একটী ইংরাজী শব্দেরও অর্থ বোধ করিতে পারে না। অথচ সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্ম বিষয়ে কোন একটা নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে; নহিলে কোনও ফলোদয় হইবে না। আমার মনে হয়, একটা বড় ভাবের কথা বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীদিগকে বুঝাইতে পারিলে, সে ভাব তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে; হৃদয়ে নূতন তরঙ্গের উদ্ভব হইবে, সে তরঙ্গ জনে জনে আঘাত করিয়া দেশব্যাপী একটা বিরাট ভাবের ঢেউ তুলিতে পারিবে। এই নবভাবে জাতি উদ্বুদ্ধ হইবে, জাতির হৃদয়ে সজীবতা আনয়ন করিবে, সমাজের কল্যাণ

আপনিই সাধিত হইবে। অন্যপক্ষে,কেবল ইংরেজী ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিলে, ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে, জাতি-ব্যাপী বিরাট কার্য্যের সূচনা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এই হেতু সামাজিক হিসাবে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সে সাহিত্য জাতির সাহিত্য,—জনসাধারণের সাহিত্য হইবে।

বাঙ্গালার জন সাধারণের সেব্য এক অভিনব সাহিত্য যেন প্রমাদের পথে উদ্ভূত হইতেছে। অর্থাৎ, যে পদ্ধতি অনুসারে উহা উৎপন্ন হইতেছে, সে পদ্ধতি হয় ত প্রমাদসঙ্কুল। যাহা হউক, এই অভিনব সাহিত্য উদ্ভবের চেষ্টা আমাদের সকলের লক্ষ্যের বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য ; কেবল লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না ; স্থির ও ধীর ভাবে, বিচক্ষণতার সহিত উহাকে উদ্রিক্ত করিতে হইবে। কারণ জাতির সাহিত্য যে ভঙ্গী অবলম্বন করিবে, সেই ভঙ্গী অনুসারে জাতির বিশিষ্ঠতার উপর উহার প্রভাব বিস্তীর্ণ হইবে। জন সাধারণের সাহিত্য এবং জাতির বিশিষ্টতা, উভয়েই উভয়ের উপর আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অর্থাৎ, সাহিত্য অনুসারে জাতির বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, বিশিষ্টতা অনুসারে জাতির সাহিত্যেরও বিস্তৃতি ও পুষ্টিসাধন হয়। অন্ততঃ বঙ্গদেশে জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাল হইতে এই উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিস্ফুট রহিয়াছে। জয়দেব তাঁহার যুগের কবি, সে কালের লোকসাধারণের কবি ছিলেন।* পরবর্ত্তী কালেও জয়দেব বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি ছিলেন। সে যুগে যাহারা লেখা পড়া করিত, তাহারা সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা পড়া করিত। বিশেষতঃ, জয়দেবের কবিতা, এখনও যেমন হয়, তখনও তেমনই সভায় বা আসরে গীত হইত। সুতরাং উহার প্রচার ছিল; জনসাধারণ উহা আদরের সহিত শুনিত। কাজেই জয়দেবকে বাঙ্গালার লোকসাধারণের কবি বলা চলে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ তাৎকালিক বাঙ্গালী চরিত্রের দর্পণস্বরূপ। একটা জাতির বিশিষ্টতা-জ্ঞাপক এমন কাব্য অন্য কোনও সাহিত্যে আছে কি না, বলা যায় না। মুসলমান বিজেতার লৌহময়, অতি কঠোর পাদুকার চাপে যখন বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বের অপচয় ঘটিতে আরম্ভ করে, তখনই গীতগোবিন্দের প্রচার হয়। গীত-

গোবিন্দের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আগাগোড়া কোন খানেই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক উন্নত ভাবের বিকাশ মাত্র নাই। আছে কেবল রমণীসুলভ কোমল মধুর ভাব। কবি কোন খানেই একটা নূতন সত্যের—একটা অপূর্ব্ব কথার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ কবিই,—তা তিনি ধর্ম্মবিষয়ক কবি হউন, বা বিষয়ী-বিনোদক কবি হউন,—এমন একটা ভাবের কথা মানুষকে শিখাইয়া যান, যাহার প্রভাবে মনুষ্যজীবন ধন্য হয়, মনুষ্য জাতি উন্নত হয়। কিন্তু জয়দেব এই প্রকারের কবি নহেন; তাঁহার ধরণ স্বতন্ত্র। তিনি যে কবিগুণোপেত নহেন, এমন কথা আমি বলি না। তিনি নিশ্চয়ই একজন উচ্চাঙ্গের কবি। তাঁহার শব্দাচরণ ও শব্দযোজনার সামর্থ্য অসাধারণ; শব্দ গুলি যেন বীণার ঝঙ্কারের মতন সুরের লহর তুলিয়া শ্রবণ পথে ভাসিয়া যায়। শব্দ যোজনার প্রভাবে তিনি যে এক একটা ভাবের আলেখ্য মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেন, তাহা অতি উজ্জ্বল, অতি সুন্দর, অতি মনোহর। কিন্তু তাঁহার অনুপম ভাষা ও চমৎকার ভাব-আলেখ্য কেবল কামের [illegible] ঘটায়, মানুষকে কেবল রক্ত মাংসের উপদ্রবের

প্রতি যেন জোর করিয়া টানিয়া ধরে। দুর্ব্বল, স্থবীর, কর্ম্মহীন জাতি যেমন কামকলা বিতানে সুখবোধ করে, তেমনই সে জাতির কবিও সে সুখলিপ্সার মুখে অপূর্ব্ব ভাষায় অপূর্ব্ব কাম কাব্যের ইন্ধন যোগাইয়াছেন। এই জয়দেবই পরবর্ত্তী সকল বাঙ্গালী কবির আদর্শস্বরূপ হইয়া যাছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ জয়দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন বটে, পরন্তু অনেকেই তাঁহার পদলালিত্য, কবিজনোচিত ভাবমাধুর্য্য প্রাপ্ত হন নাই। ইঁহাদের পরে নবদ্বীপের রাজসভার কবিগণ, বৈষ্ণব কবিদের মত, কামের পন্থা অবলম্বন করিয়া, কামের কবিতাই লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এখনও বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রধান কাব্য গ্রন্থ। শেষে কবি, পাঁচালী যাত্রায় ঐ এক রীতিতে টপ্পা ও অন্যান্য প্রেমসঙ্গীতের পুষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি এইভাবে, জয়দেবের কাল হইতে ভারত-চন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘকাল কেবল কামকবিতায় বুদ্ধি ও চিত্তের তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। স্থবির, দুর্ব্বল, কর্ম্মহীন, কোমল জাতির পক্ষে এই সাহিত্যই উপযোগী; [illegible] তাহাই বাঙ্গালীর মনীষায় পুষ্টিসাধন

হইয়াছে। তাই মনুষ্যত্বের পরিপোষক উচ্চভাব, উন্নত আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীর সাহিত্যে স্থান পায় নাই।

এই কোমল কামপ্রধান কাব্য-সাহিত্যের পার্শ্বে বঙ্গদেশে আর এক অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যত্বের উন্নত সবল ভাব হারাইলেও, বাঙ্গালী মেধার তীক্ষ্ণতা হারায় নাই। তাই কুল্লুক ভট্ট ও ভবদেবের কাল হইতে জগন্নাথের কাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল বাঙ্গালী নব্য ন্যায়ের ও নব্যস্মৃতির কত গ্রন্থই রচনা করিয়াছে, তাহারা আর সংখ্যা হয় না। টীকার উপর টীকা, ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা বাহির হইয়া স্মৃতি-শাস্ত্রকে একরূপ দুর্বোধ করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্ব্বোধ ও দুরবগাহ স্মৃতিশাস্ত্রের বিধিবিশেষের তাড়নায় ব্যক্তিমাত্রকেই কতকটা অধীর হইতে হইয়াছে। এই স্মৃতিশাস্ত্র গোভিলের সময় হইতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বগামী ঋষি মুনির দ্বারায় অনেকটা কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর শূলপাণি জীমূতবাহন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ব্যাখ্যাতাদিগের বন্ধনী যেন লৌহশৃঙ্খলে বাঙ্গালীকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালীর আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ-উল্লাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিত্বের সকল বৃত্তিই স্বাভ-

শাস্ত্রের বিধি নিষেধের নিগড়ে যেন আবদ্ধ—পিণ্ডীকৃত হইয়া রহিয়াছে। জীবনের সকল ব্যাপারে—সুখে দুঃখে বাঙ্গালীর গুরুপুরোহিত বাঙ্গালীকে যেন আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

অপর পক্ষে বাঙ্গালার নব্য ন্যায় মনীষার চমৎকার বিকাশে অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় হইলেও উহা কখনই দেশের লোক সাধারণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচায়ক মনীষার অতুল্য বিকাশের দ্যোতক এই নব্য ন্যায় বাঙ্গালার জনসাধারণের পক্ষে পূর্ণ অবোধ্য হইয়া রহিয়াছে। ন্যায়ের কচ্‌কচি বলিয়া ওদিকে সাধারণ বিষয়ী লোকে কখনই দৃষ্টিপাত করেন নাই। অথচ এই নব্য ন্যায়ের কচ্‌কচির অন্তরালে যে অপূর্ব্ব বাস্তবতা (Rationalism) নিহিত, সত্য অনুসন্ধিৎসার যে প্রশস্ত পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহা জনকয়েক মেধাবী অধ্যাপকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকাতে, উহার দ্বারা জাতির চিত্তবৃত্তির পুষ্টিসাধন হয় নাই। বাঙ্গালীর এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির কোনও উপকারই হয় নাই। পরন্তু এই নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম তর্কজাল স্মৃতিশাস্ত্রের বিতণ্ডায় অপব্যবহৃত হইয়াছে। এই সামগ্রীটা যদি জাতির

বিশিষ্টতা-রক্ষার ও পুষ্টির পক্ষে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে না জানি বাঙ্গালী জাতির কি প্রভূত উপকার সাধিত হইত। এই নব্য স্থায় বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্বোধ থাকাতে উহার দ্বারা বাঙ্গালীর অনিষ্ট সাধনই হইয়াছে।

এইরূপে বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতা এবং বাঙ্গালীর মনীষাজাত আর একটী বিষয় অর্থাৎ নব্য স্থায় লইয়া, এক অপরের প্রতিঘাত করিয়া জাতির চরিত্রের উন্মেষ সাধন করিয়াছিল। কর্ম্মশূন্যতা চিত্তের ও চরিত্রের জড়তা, এবং সদ্ধর্ম্মসাধক পদ্ধতির অভাব, এই কয়টী মিলিয়া মিশিয়া বাঙ্গালীর কামকলা গন্ধ পরিব্যাপ্ত কোমল কামিনীসুলভ পদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী এই সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া স্বীয় পুরুষকারের অপচয় ঘটাইয়াছে, এবং দুর্ব্বল মনীষার তৃপ্তি সাধন করিয়াছে। পক্ষান্তরে ভাবসৃষ্টি বিষয়ে স্থবির জাড্য জড়িত, অথচ অতি তীক্ষ্ণ ধীশক্তি লইয়া বাঙ্গালী নব্য ন্যায়ের উদ্ভাবন করিয়াছে; এবং উহারই সাহায্যে স্মৃতি-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া জীবনযাত্রার পদ্ধতির বন্ধনী অতি কঠোর ও লৌহ নিগড়ের ন্যায় দুশ্ছেদ্য করিয়া

তুলিয়াছে। এই ভাবে বাঙ্গালী এতকাল সজীব ছিল--নিজের ভাবে নিজে স্থবির, স্বীয় কল্পনাজাত সাহিত্যে চর্চ্চায় নিজে দুর্ব্বল, কোমল কাম সন্ধুক্ষণে সদারত সুতরাং নিশ্চল ও নিজের দুঃখ কষ্টের অনুভূতি শূন্য হইয় সজীব ছিল। ঠিক এই সময়ে বাঙ্গালায় নবজীবনে অরুণোদয় হইল। (উহা ইংরেজ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় এব বঙ্গে ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির বিস্তার)। অবশ্য, এম স্থবির, গতিশূন্য জাতির পক্ষে নবজীবন ও নবভাবোদ সম্ভবপর কিনা, তাহা বিচার্য্য। যাহা হউক, এই নব জীবনের—নবভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা এক প্রবল অস্ত্র বাঙ্গালীর হস্তগত হইল। উহা মুদ্রাযন্ত্র এই নবভাব সঙ্ঘাতে, নবজীবনের প্রণোদনায় ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। লোকে গীতগোবিন্দ শ্রেণী সাহিত্য ছাড়িয়া, একটা নূতন ও স্বতন্ত্র সাহিত্যে আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। বাঙ্গালী জাতির মনীষা ইতিহাস কথার অধিক আবৃত্তি আমি করিব না; কে না, সে কথা সকলেই জানে এবং বুঝে। তবে যাঁহারা বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, নিম্নলিখিত গোটা কয়ে ব্যাপারের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাহি।

১। বাঙ্গালীর মধ্যে অভিনব সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। এই সাহিত্য লোক সাধারণের সাহিত্য হইবে, এবং আকাঙ্ক্ষার মুখে যোগান দিতে হইবে।

২। শীঘ্রই এবম্ভাবের সাহিত্যের টান বাঙ্গালায় অতি মাত্রায় বাড়িবে। এই টানের মুখে যোগান দিতে হইলে, পরিমাণ ও গুণ উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অর্থাৎ, গদ্যপদ্যময় পুস্তক সকলের কেবল সংখ্যা হিসাব করিলেই চলিবে না, উহাদের গুণের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৩। এখন পরিমাণ যাহাই হউক গুণের হিসাবে যে ভাল বহি বাহির হইতেছে না, তাহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে।

সরকারী দপ্তর হইতে যে পুস্তক প্রচারের একখানি ত্রৈমাসীক বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর মনীষা এখনও উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন হয় নাই। সংখ্যা ও পরিমাণের বিষয়ে শ্লাঘ্য হইলেও গুণের পক্ষে উহা অধম তাহা বলিতে হইবে। এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে এই সাহিত্য অনিষ্টজনক ও ক্ষতিকারক। দুই চারিখানি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে;

কিন্তু অবশিষ্ট সকল গুলিই হীন অনুকরণ মাত্র, অথবা সংস্কৃত সাহিত্যের গালগল্পে পূর্ণ, অথবা সাদা মাঠা বাজে কথায় পূর্ণ। এমন কেন ঘটিতেছে, তাহার দুইটী কারণ আমি নির্দ্দেশ করিতে পারি।

১। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতে অভিলাষী নহেন। চাটুকার মোসাহেব পণ্ডিত (fawning) ও অভাবজীর্ণ ব্যক্তিরা আমাদের দেশে গ্রন্থকার হইয়া থাকেন। অথবা স্কুলের ছেলেরা গ্রন্থকার হয়। কিংবা কর্ম্মহীন, ব্যবসায়হীন বাজে লেখকই গ্রন্থকার সাজিয়া বসে। কেন না এমন লেখকের পক্ষে যে আর কিছু হইবার উপায় নাই, সে যে আর কিছু হইতে পারে না। যাঁহারা দেশের লোককে নূতন ভাবে শিক্ষিত করিতে পারেন, দেশের দশজনকে নূতন কথা শুনাইতে পারেন, তাঁহারা এ কার্য্যকে তাঁহাদের পদমর্য্যাদার যোগ্য বলিয়া মনে করেন না, যে তীব্রবুদ্ধি তেজস্বী বাঙ্গালী যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারে; সে মনে করে, বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীন বৃত্তি মাত্র, তাঁহার পদের ও শিক্ষার যোগ্য নহে। যদি

কচিৎ কদাচিৎ কেহ লুকাইয়া কোনও বহি লেখেন, ত সে পুস্তকে তাঁহার নাম থাকে না ; উহা বিনামা বাহির হয়—চুপি চুপি প্রকাশিত হয়। এই হেতু যে কয়খানি ভাল বহি বাহির হইয়াছে, তাহাদের শিরোনামায় গ্রন্থকারের নাম নাই। এমন কথা বলি না যে, সবাই এই ভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন। জন কয়েক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের রচিত গ্রন্থগুলি অতি উপাদেয় হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারা কয় জন? এবং কয় খানিই বা পুস্তক রচনা করিতে পারিয়াছেন? ক্ষোভের কথাই ত এই।

(২) ভাল সমালোচনার অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুস্তকগত ভাল মন্দের কথা নির্ব্বিকার ও নিরপেক্ষ ভাবে বলিবার ক্ষমতা আমাদের অনেকের নাই বলিলেও হয়। দেশীয় সংবাদপত্র সকলে বুদ্ধিমত্তার সহিত পুস্তক সমালোচনার অত্যন্তাভাব। বাঙ্গালী চিত্তের ইহা বড়ই দোষের কথা যে, বাঙ্গালা জাঁকজমকের ডাকের সাজের সৌন্দর্য্য হইতে খাঁটী মনোহর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যটুকুকে পৃথক করিয়া

দেখিতে পারে না। বরং বাঙ্গালীর পক্ষে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি অনায়াস-সাধ্য, পরন্তু সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ যেন বাঙ্গালীর পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। চিত্তগত এই দোষের জন্য বাঙ্গালার সাহিত্যও একটু ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। যে সমালোচকের মতামতের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা আছে, তিনি প্রমাদবশতঃ মন্দ বহিকে ভাল বলিলে, এবং ভাল বহিকে মন্দ বলিলে, উন্নত সাহিত্যেরই ক্ষতি হয়। যাঁহারা বাঙ্গালী থিয়েটারের শ্রোতৃমণ্ডলীর ভঙ্গী দেখিয়াছেন, (যেমন আমি দেখিয়াছি) তাঁহারা অনেকটা বাঙ্গালীর প্রশংসার মূল্য অবধারণ করিতে পারিবেন। থিয়েটারে সেই উৎকট উদ্ভট ভাষা, সেই বিকট কট্‌কটে ভাববিন্যাস, সেই বাজে ইয়ারকী, বাজে রসিকতার স্রোত চলিতেছে, আর স্থির ধীরভাবে লোকে তাহা শুনিতেছে, এবং অম্লানবদনে প্রশংসা করিতেছে, সেই পুস্তককে ভাল নাটক বলিয়া আদর করিতেছে। এই অবিচারিত প্রশংসার প্রভাবে বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যের উন্নতি ঘটিতেছে না; এবং এই হেতু বাঙ্গালার সৎসাহিত্যের অন্য সকল শাখাই যেন শুকাইয়া যাইতেছে।

এই সঙ্গে আমি আর একটী কথা বলিতে চাহি। অনেকেই আমাদের দেশের জন সাধারণের বুদ্ধিবৃত্তিকে বড়ই ছোট—বেজায় সামান্য বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। এই ভ্রান্ত ধারণা হেতু বাঙ্গালায় সৎসাহিত্যের পুষ্টি হইতেছে না। অনেকেই মনে করিয়া বসিয়া আছেন যে, বাঙ্গালার জন সাধারণের জন্য যে পুস্তক রচিত হইবে, তাহাতে কেবল ছেলে-ভুলান গল্প থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। যদি বিজ্ঞান বা ইতিহাস ঘটিত কোনও পুস্তকের রচনা করিতে হয়, তাহা হইলে সে সব পুস্তকও বালকোপযোগী করিয়া লেখা হয়। শব্দ চাতুর্য্যের ও মাধুর্য্যের বিকাশ, উন্নত ভাবের ব্যাখ্যান, মনুষ্য চরিত্রের অথবা মানবতার উদ্বোধক সিদ্ধান্তের বিন্যাস যেন এই সকল পুস্তকে করিতে নাই। আধুনিক ইউরোপীয় পদার্থ বিজ্ঞানের অভিনব সিদ্ধান্ত সকল যেন বাঙ্গালী পাঠকের পড়িতে নাই। যদি বা এই অদ্ভুত সমাচার শুনাইতে হয়, তবে তাহাকে শুষ্ক নীরস করিয়া, কঠোর কঠিন করিয়া শুনাইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা বাঙ্গালী পাঠকগণকে বোকা সাজাইয়া পুস্তক রচনা করেন, তাঁহাদের পুস্তক সাধারণ বাঙ্গালীতে পড়ে না।

যে সকল পুস্তকে পড়িবার কিছু থাকিবে, বাঙ্গালী কেবল তেমনই পুস্তক পড়িবে। সে শুষ্ক নীরস ছেলে ভুলান পুস্তক পড়িবে না, পড়িতে চাহিবে না। এখন যাঁহাদের পুস্তক সকল বাঙ্গালী প্রায়শঃ পাঠ করে, তাঁহারা এই অপসিদ্ধান্ত মাথায় লইয়া পুস্তক রচনা করেন নাই। মনে হয়, এই হেতু Vernacular Literature Society বা বাঙ্গালা সাহিত্য-প্রচার-সমিতি সহজবোধ্য সরল পুস্তকরাশির প্রচার করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ কোনও উপকার করেন নাই। তবে এই সমিতি-প্রচারিত সাময়িক পত্রখানির দ্বারা অনেক উপকার হইতেছে. সাহিত্যের পুষ্টি সাধন হইতেছে।

এইবার সাহিত্য প্রচারের কথা একটু বলিব। ইহ সত্য বটে, যে বহি বিকাইবে, তাহা লইয়া ফেরীওয়াল গ্রামে গ্রামে ঘুরিবে। কিন্তু সে অবস্থা হইতে এখনও বিলম্ব আছে। টানের মুখে যোগান দিতে হয় বটে পরন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যোগানের মুখে টানের সৃষ্টি করিতে হইবে। ফেরীওয়ালারা বহুগ্রামে বহি বেচিতে যায়, কিন্তু তাহারা ভাল বহি বেচে না। তাহাদের পুঁথি বড়ই কদর্য্য। বিশেষতঃ তাহারা নিয়মিত ফেরী করে

না, কচিৎ কদাচিৎ গ্রামে যায়। এমন ভাবে পুস্তক প্রচার করিলে চলিবে না। আমি মফস্বলের বহুস্থান হইতে অভিযোগ শুনিয়াছি যে, লোকে ভাল পুস্তক পায় না বলিয়াই খরিদ করে না। দেশীয় সাহিত্য প্রচার সমিতির (Vernacular Literature Society) অনেক স্থানে শাখা দোকান আছে। সমিতির প্রচারিত পুস্তক সকল এই সকল দোকানে পাওয়া যায়। সমিতির এই সকল দোকানে যদি অন্য ভাল পুস্তকের বিক্রয় হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রচার বাড়ে, সৎসাহিত্যের পুষ্টিও হয়। এপক্ষে সুব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। আপাততঃ পল্লীগ্রামে পাঠাগার বা লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। গোটাকয়েক পল্লীগ্রামে এইভাবে সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে; পরন্তু প্রত্যেক গ্রামে এক একটী পাঠাগার না থাকিলে কাজ হইবে না। অন্ততঃ যে সকল গ্রামে পাঠশালা বা স্কুল আছে, সেই সকল গ্রামে স্কুল বা পাঠশালার পণ্ডিত বা মাষ্টারের উপর ভার দিয়া এক একটী পাঠাগার খোলা চলে। শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক কর্ম্মচারী সকল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান। ইঁহারা ইচ্ছা

করিলে প্রত্যেক গ্রামেই একটী করিয়া পাঠাগার খুলিতে পারেন। বিশেষতঃ, শাসন ও বিচার বিভাগের কর্ম্মচারিগণের প্রসার প্রতিপত্তি অত্যধিক; তাঁহারা অল্প চেষ্টাতেই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। পাঠাগারের সংখ্যা বাড়িলেই সৎসাহিত্যের চর্চ্চারও প্রসার বাড়িবেই; লোকের একটা রুচিরও সৃষ্টি হইবে। এ কাজটা তেমন কঠিন বলিয়া আমার বোধ হয় না।

প্রবন্ধ পাঠের পর বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন যে, তিনি বহুকাল বঙ্গ সাহিত্যের কল্যাণ কামনায় রত রহিয়াছেন। তিনি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নের পক্ষপাতী অনুবাদের পক্ষপাতী নহেন। অবশ্য স্বীকার করি যে, সাহিত্যের সকল বিভাগেই নানা পুস্তকের রচনা হইয়াছে; বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ধর্ম্মতত্ত্বে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে বটে। পরন্তু এখন বিচার্য্য এই যে, লোকে কি ইহাই চাহে? লোকের এই আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে হইলে, কলিকাতায় একটী এজেন্সী খুলিতে হইবে। এই এজেন্সীর সাহায্যে পুস্তক প্রচার করিতে হইবে। প্রচার ও কাটতির মুখে অনেকটা বুঝা যাইবে যে, লোকে কি পড়িতে চাহে। এই ভাবে পুস্তকের প্রচার না হইলে

পাঠের প্রবৃত্তি বাড়ান যাইবে না। লোকের পড়িবার প্রবৃত্তি বাড়িলে, এবং পুস্তক সকলের কাট্‌তি হইলে বুঝা যাইবে, কোন্ প্রকারের পুস্তক এখন রচনা করিতে হইবে, এবং কি ভাবেই তাহা লিখিতে হইবে। আমার মনে হয় যে, এই এজেন্সীর অভাব শীঘ্র দূর হইবে।

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী বলেন যে, পাঠ্য পুস্তক বিষয়ে আমাদের ধারণায় গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাই এত কথা উঠিতেছে। পাঠ্য পুস্তক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে; এক বিষয়বিশেষের উপর পাঠ্য পুস্তক; অর্থাৎ যাহার সাহায্যে বিষয়বিশেষের অধ্যাপনা চলিবে; আর চিত্তবিনোদক পাঠ্য পুস্তক; যথা উপন্যাস গল্প, নাটক, কাব্য গ্রন্থাদি। প্রথম শ্রেণীতে বিজ্ঞান, পদার্থ-তত্ত্ব ইতিহাস ও চিকিৎসা-ঘটিত পুস্তক সকল সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। এই সকল পুস্তক অতি সাবধানে ও আধুনিক সকল তথ্যে পূর্ণ করিয়া লিখিতে হইবে। এই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক মৌলিক গ্রন্থ সকলের রচনা হইলে ভাল হয় বটে; কিন্তু এখনও সে সময় আইসে নাই। বিষয়বিশেষের পঠন পাঠন না হইলে সে বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থ-রচনা সম্ভবপর নহে। ইউরোপীয়

বিজ্ঞান গ্রন্থ সকলের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবার সময়ে অনেক নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্দ গড়িতে হইতেছে। এই সকল বিশেষ শব্দের পারিভাষিক অর্থ এখনও সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সে অর্থ অনেকেই গ্রাহ্য করে নাই। সুতরাং এই সকল পারিভাষিক শব্দের জন্য অনুরূপ ইংরেজী শব্দ বাছিয়া উহাদের অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ, ইংরেজী বহি সকল বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতে লিখিয়া থাকেন, তাহারা যে ভাবে দেখিয়া শুনিয়া শব্দ চয়ণ করিয়া তাহাদের ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে ব্যবহৃত সকল শব্দের অর্থ-দ্যোতনার পক্ষে কোনও গোলমাল ঘটে না। এখন এই সকল ইংরেজী শব্দের অনুকূল বাঙ্গলা শব্দের রচনা করিলে অর্থসঙ্গতি বিষয়ে কোনও গোল ঘটিবে না। এই হেতু এখন ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক সকল বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিলে ভাষার পুষ্টি হইবে। সকল সভ্য দেশেই প্রথমে এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়; শেষে বিজ্ঞান-বিষয়ের সাধারণতঃ আলোচনা আরব্ধ হইলে, মৌলিক গ্রন্থ লেখা আরব্ধ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের বিষয়বিশেষের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা

আরম্ভ না হইলে, তৎ তৎ বিষয়ের গ্রন্থ সকলের আদর হয় না। চিকিৎসা-শাস্ত্রের যদি পঠন পাঠন না হয়, চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়াইবার কলেজ ও স্কুল সকল যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে দেশে চিকিৎসা-শাস্ত্রের বাঙ্গালা বহির আদর হয় না। কলিকাতা, আগ্রা, মান্দ্রাজ, হায়দরাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই প্রভৃতি নগরে চিকিৎসা শাস্ত্রের স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই সে সকল স্কুলে ছাত্র হইতেছে বলিয়াই দেশীয় ভাষায় লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্রের পুস্তক সকল অল্পবিস্তর বিকাইতেছে। বিজ্ঞানের অন্য শাখার পাঠ্য পুস্তক লিখিতে হইলে এই ভাবে কার্য্য করিতে হইবে। বিজ্ঞানের পঠন পাঠন স্কুল কলেজে না হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পাঠ্য পুস্তক সকলের প্রচলন এই সকল পাঠশালায় না হইলে, পাঠ্য পুস্তক লেখা বৃথা হইবে। এই হেতু ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মনে করেন যে, সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞান-বিষয়ের প্রচার হওয়া প্রয়োজন, তৎপরে ইংরেজী পুস্তক সকলের অনুবাদ করিয়া অভাব মোচন করা আবশ্যক। শেষে মৌলিক গ্রন্থ সকল আপনা-আপনি রচিত হইবে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য পুস্তকের অভাব পূর্ণ হইয়া যাইবে।

পরন্তু গল্প, উপন্যাস, কাব্য গ্রন্থাদির রচনা বিষয়ে এ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে চলিবে না। ইংরেজী উপন্যাস বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিলে তাহা বাঙ্গালির পক্ষে চিত্তবিনোদক হইবে না। গৃহস্থলীর কথা, সমাজের কথা, দেশের ইতিহাসের কথা লইয়া উপন্যাস লিখিতে হইবে, তবে তাহা বাঙ্গালীর চিত্তবিনোদন করিতে পারিবে। ইংরেজের উপন্যাসে ইংরেজের সমাজ, ধর্ম্ম ও ইতিহাসের কথা আছে; সে সকল উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহা বাঙ্গালীর রুচিকর হইবে না। কাব্যের পক্ষেও ঐ একই কথা খাটে। অতএব এ ক্ষেত্রে মৌলিক পুস্তক লিখিতে না পারিলে বাঙ্গালী পাঠকের তৃপ্তি হইবে না, বাঙ্গালা ভাষারও পুষ্টি হইবে না। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাস লিখিয়া এই সিদ্ধান্তটা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আলালের ঘরের দুলালের ভাষা যেমন সহজসাধ্য, উহাতে লিখিত বিষয়গুলিও তেমনি সদুপদেশপূর্ণ। এই ভাবে উপন্যাস রচিত হইলে লোকেও পড়িবে, নবীন বঙ্গ-সাহিত্যেরও আদর বাড়িবে। অনেকে বলেন যে, ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা পড়িতে চাহেন না। কথাটা

সত্য হইতে পারে, কিন্তু কয়জন ইংরেজী শিখে ও জানে? যাহারা এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, বিদ্যাসুন্দর ও পাঁচালী পড়িয়া কাল কাটায়, তাহারা ত নব্য বঙ্গসাহিত্যের পুস্তক সকল পড়িতে পারে। এই সকল গ্রন্থের পঠন পাঠন অধিক থাকিলে, লোকের অন্ধ বিশ্বাসের বৃদ্ধি পাইবে, কামবৃত্তির পোষণ করা হইবে। এই সকল পুস্তকের পরিবর্ত্তে ভাল ভাল উপন্যাস রচনা করিয়া দিলে পাঠকের মন প্রশস্ত হইবে, মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইবে, ধীরে ধীরে, দেশের ও সমাজের রুচি বদলাইবে। এখন এই ভাবে চালাইলে আগামিগণ বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবেন, পারিভাষিক শব্দের নির্দ্ধারণ করিবেন, পরে বিজ্ঞানবিষয়ক ভাল ভাল মৌলিক পুস্তকও রচনা করিতে পারিবেন। এখন ভাষার পত্তনের সময়; এখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিলে পরে সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইতে পারিবে। *

* সাহিত্য—১৩২০।

বিদ্যাশিক্ষা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র খেলাধূলার বড় একটা অনুরাগী ছিলেন না; বাল্যকাল হইতেই তিনি পাঠানুরাগী ছিলেন। প্রথম বাল্যে রামায়ণ, মহাভারত, বেহুলার উপাখ্যান, মনসার ভাসান প্রভৃতি পড়িতেন। তারপর যখন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে দুই একখানা সংস্কৃত কাব্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন কবিতা লিখিবার ঝোঁক চাপিল। ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' নিয়মমত পড়িতেন ও তাহাতে লিখিতেন। ক্রমে যত বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ও ইংরাজি শিখিতে লাগিলেন, তত ইংরাজি কাব্যের অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। সেক্ষপিয়র, কীটস, বাইরণ, শেলি, চসার, মিল্টন সকলই অধীত হইল। পঁচিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও জীবন-চরিত পাঠে মনোনিবেশ করেন। ত্রিশ বৎসরের পর মৃণালিনী লিখিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও বিজ্ঞান পাঠ আরম্ভ করেন।

এই সময় সঙ্গীত শিক্ষার ঝোঁক চাপিয়াছিল। সুযোগও বেশ হইয়াছিল। কাটালপাড়ায় একজন

বঙ্গবিশ্রুত গায়ক বাস করিতেন, তাঁহার নাম যদুভট্ট তানরাজ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন দিতেন। এই যদু ভট্টর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার তান-লয় বোধ অনন্যসাধারণ ছিল। হারমনিয়ম যন্ত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

একদিন তিনি রঙ্গমঞ্চে মৃণালিনী অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। গিরিজায়া গায়িতেছিল,—

বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে,
বহুত পিয়াসা—রে।
চন্দ্রমা-শালিনী, যা মধু যামিনী,
না মিটিল আশা—রে॥

সুর বঙ্কিমচন্দ্রের মনোমত হইল না। তিনি সাতিশয় বিরক্তিসহকারে রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিলেন। এবং পরদিন তিনি তাঁহার দৌহিত্র শ্রীমান্ দিব্যেন্দুসুন্দরকে এই গানটির সুরলয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীমতী সরলা দেবীও এই গানটির একটি সুর দিয়াছিলেন, এবং দিব্যেন্দুসুন্দরকে হারমনিয়ম সাহায্যে শিখাইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চিকিৎসা-শাস্ত্রেও সাতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আলিপুরে চাক্‌রি করিতে করিতে তিনি মেডিকেল কলেজে কিছুকাল শরীরতত্ত্ব বা Anatomy পড়িয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বল্পকাল মধ্যে শরীরতত্ত্ব শিখিয়া লওয়া বড় কঠিন ব্যাপার নয়। তিনি অস্থি বা শরীরতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন হইয়া গৃহে বসিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র অনন্যসাহায্যে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। আমি দেখিয়াছি, তাঁহার যখন কোন একটা বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য বাসনা জন্মিত, তখন তিনি সে বিষয়টা আয়ত্ত করিবার জন্য অধীর ও অস্থির হইয়া পড়িতেন। যতদিন সেটা আয়ত্ত না হয়, ততদিন তাঁহার মনে সুখ নাই, শান্তি নাই। চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিয়া, রাশীকৃত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ কিনিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার এ বিদ্যার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে বড় একটা পাই নাই—জীবনের শেষ সময়ে কিঞ্চিৎ পাইয়াছিলাম।

কলিকাতার অবস্থান কালে মধ্যবয়সে তিনি একটু

জ্যোতিষশাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন তাঁহার শিক্ষা-গুরু।

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতীষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু হস্তাঙ্ক গণনায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল বলিয়া মনে হয় না। একদা শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষীর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটী বন্ধুসহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় সে ক্ষেত্রে মুখাবয়ব দর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির গণনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন, "——(you) succeeded to an extent which surprised me."

তার কিছুদিন পরে জ্যোতিষী মহাশয় আহূত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে আসিয়াছিলেন। সে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স সাতচল্লিশ বৎসর। জ্যোতিষী মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কয়েকটী অপরিচিত ভদ্রলোক তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই অপরিচিত ভদ্রলোকদিগের পরিচয় তিনি পরে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই খ্যাতনামা পুরুষ। অগ্রজ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র, অভিন্ন-

হৃদয় বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার জমীদার বৈবাহিক বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এ ক্ষেত্রে জ্যোতিষী মহাশয় ললাট দেখিয়া গণনা করেন নাই—হস্তাঙ্ক দৃষ্টে গণনা করিয়াছিলেন। ফলাফল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন,—

"—you (Jyotishi) were correct in what you said of me in regard to certain matters which I am certain are not known to any one but myself.

" I state what happened once must not be understood as having yet proved any decided opinion on the subject of palmistry. What I am convinced of is that you are possessed of either a science, or certain powers of mind which I do not yet understand."

জ্যোতিষীর গণনায় বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন; কিন্তু তবু তাঁহার বিশ্বাস হইল না যে, হস্ত-রেখা দৃষ্টে ভাগ্য-গণনা সম্ভবপর।

আর একবারের কথা আমার মনে পড়ে। সেটা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সের * কথা। তখন তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় কলিকাতায় একজন জ্যোতিষী আসিয়াছিলেন। তিনি কোন্ দেশবাসী তাহা ঠিক জানি না, বাঙ্গালী বা বিহারী হইবেন। মাড়ওয়ারীরা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়া বড় বাজারে একটী বৃহৎ বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিল। জ্যোতিষী মহাশয় ললাট বা করাঙ্ক কিছুই দেখিতেন না। মানসিক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন। প্রশ্নটী এক টুকরা কাগজে লিখিয়া মুঠার ভিতর রাখিতে হইত। আমি জ্যোতিষী মহাশয়কে দেখিয়াছিলাম, এবং তাঁহার ক্ষমতা দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছিলাম। একদা আমার প্রশ্ন ছিল, "আপনি সাধু, না জুয়াচোর?" জ্যোতিষী একটু হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "যে যেমন আমায় ভাবে।"

সে যাহা হউক, জ্যোতিষী মহাশয়ের কলিকাতায় যথেষ্ট নাম ও যশ হইয়াছিল। লোকে তাঁহাকে পণ্ডিতজী বলিয়া ডাকিত, রাজা মহারাজরা তাঁহাকে সাতিশয়

* ১৮৯০ বা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের কথা।

সমাদর করিয়া গৃহে লইয়া যাইতেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহে সচরাচর তিনি যাতায়াত করিতেন। অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় পণ্ডিতজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী কলিকাতায় একটা হুলস্থুল বাধাইয়াছিলেন। দিবারাত্র কাতারে কাতারে ভক্তবৃন্দ আসিয়া তাঁহার গৃহ পূর্ণ করিত। দেখিয়া শুনিয়া—জানি না কেন—পুলিস তাঁহাকে কলিকাতা হইতে অপসারিত করিয়াছিল।

এত যশ ও ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী পাইয়াও পণ্ডিতজীর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত (স্যর) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদাস বাবুর সহিত তাঁহার আলাপ ঘটিয়াছিল কিনা জানি না; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ঘটিয়াছিল। দামোদর বাবু একদিন সন্ধ্যাকালে পণ্ডিতজীকে সঙ্গে লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। ভাবে বুঝিয়াছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন। বৈঠকখানায় দুই চারিজন বন্ধুও

উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতজীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইয়া তীক্ষ্ণ নয়নে ক্ষণেকের জন্য তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন। পরে জ্যোতিষ গণনার কথা এককালে উত্থাপন না করিয়া দেশ বিদেশের আচার নীতি লইয়া বাদানুবাদ আরম্ভ করিলেন। মজলিস্ ভাঙ্গিবার কিছু পূর্ব্বে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা উঠিয়াছিল। রাত্রি ৯॥০ টার সময় পণ্ডিতজী গাত্রোত্থান করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন পণ্ডিতজী একটা কি গণনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে সাবধান হইবার জন্য উপদেশ দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু পরদিন বঙ্কিমচন্দ্র আর হাসেন নাই। তিনি অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এখনই পণ্ডিতজীর নিকট যাও ; তাঁহাকে বলগে তাঁহার গণনা সত্য হয়েছে।"

গণনাটা কি, তাহা না জানিয়াই পণ্ডিতজীর আবাসাভিমুখে ধাবিত হইলাম। এবং তাঁহাকে যথাযথ সংবাদ দিয়া ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলে তাঁহাকে আর কোনও কথা

জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইত না, সুধু আমার নয়—অনেকেরই এরূপ হইত। তিনি গম্ভীর হইলে মনে হইত, তাঁহার মুখ যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে—নয়ন যেন আরও উজ্জ্বল হইয়াছে—ললাটে যেন গর্ব্ব তেজ বিচ্ছুরিত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না পাইয়া পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। পণ্ডিতজী কি বলিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে ঠিক স্মরণ নাই। তবে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র পড়িয়া গিয়া একটা আঘাত পাইবেন, এই রকম কি একটা বলিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহ যথেষ্ট ছিল। শেষ বয়সেও তাঁহার এ আগ্রহ দেখিয়াছিলাম। একদা তিনি কিছু শিখিবার জন্য আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন; সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব বাবু ছিলেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যের নাম অনেকেই সম্ভবতঃ শুনিয়া থাকিবেন। এ দেশের লোক তাঁহাকে যতটা না চিনিত, বিদ্যার লীলাক্ষেত্র ইউরোপ তাঁহাকে তদধিক চিনিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বে আলাপ ছিল না; পরে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হয়। সেই সূত্রে আলাপ

পরিচয়ের সূচনা হয়। যে দিনের ঘটনা বলিতেছি, সে দিনের পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বা ভূদেব বাবু কেহই আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে আসেন নাই। বাড়ীটি ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ—কলিকাতার একটি গলির মধ্যে অবস্থিত। দুইজনে দ্বারে দাঁড়াইয়া দ্বিতলের সিঁড়ি পানে চাহিয়া দেখিয়া আচার্য্য মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। সিঁড়িটি কাঠের—একটা মই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্মানিত অতিথিদ্বয় দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন শুনিয়া পূজনীয় আচার্য্য মহাশয় সিঁড়ির মাথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং উভয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহাত্মাদ্বয় বিষণ্ণ বদনে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আচার্য্য তখন নামিয়া আসিয়া উভয়কে উপরে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব বাবুর পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভয় সংক্রামক,—ভূদেব বাবুর যে টুকু সাহস ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইল। তিনি সকাতরে বলিলেন, "আচার্য্য মহাশয় এ টোঙ্গায় ত উঠিতে পারিব না।" পূজ্যপাদ আচার্য্য মহাশয় সিঁড়িতে কিরূপে উঠিতে নামিতে হয়, তাহার একটু মহলা দিলেন; কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না।

আর একদিন বঙ্কিমচন্দ্র, মহারথী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আচার্য্য-দর্শনে আসিয়াছিলেন। সে দিন বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়সঙ্কল্প—তাঁহার বদনে সাহসও অতুল। বুকের ভিতর কি হইতেছিল জানি না, কিন্তু গাড়ী ছাড়িয়া গলির ভিতর আসিতে না আসিতে তিনি রমেশ বাবুর হাত জড়াইয়া ধরিলেন; বুঝিলাম, সাহস টুকু লোপ পাইয়াছে। অতঃপর সিড়ির নীচে যখন উভয়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বদনে ভয়ের চিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি কেঁচো, কেন্নো, আর্শুলা প্রভৃতিকে সবিশেষ ভয় করিতেন জানিতাম; কিন্তু যিনি উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে দস্যু সম্মুখে নির্ভীক-চিত্ত, তিনি যে একটা সিঁড়িতে উঠিতে এতটা ভীত হইবেন, তাহা কখনও ভাবি নাই। অবশেষে নির্ভীক-হৃদয় বলবান্ রমেশ বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার তখনকার মুখের কাতর ভাব কয়েকদিন পর্য্যন্ত আমার মনে ছিল। রমেশ বাবু কোন গতিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে টানিয়া উপরে তুলিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আরও কয়েকবার সামশ্রমী মহাশয়ের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; তখন তিনি "ধর্ম্মতত্ত্ব" লিখিতেছিলেন। শেষ আসিয়াছিলেন, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। সেবার শিক্ষার জন্য নয়—আচার্য্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠী পরিদর্শন জন্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, তিনি একদিন স্বীয় প্রতিভাবলে জগতে নাম কিনিয়া যাইবেন। তাই—"তিনি তাঁহার সহপাঠী নব-বিধান প্রবর্ত্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে বলিয়াছিলেন, I wish to know how far you have outgone me. তখন কেশবচন্দ্র অসাধারণ বক্তৃতা শক্তি প্রভাবে দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' তখন আলোকের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করে নাই।" *

সাহিত্য—নানা কথা।

বঙ্কিমচন্দ্রকে সময় অপব্যয় করিতে বড় দেখি নাই। প্রত্যেক মুহূর্ত্তের মূল্য আছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন। বুঝিতেন বলিয়াই নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও

* প্রদীপ, দ্বিতীয় ভাগ।

পন্যাসাদি লিখিবার অবসরাভাব অনুভব করিতেন
।। কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিও তাহা বুঝিয়াছিলেন।
।কদা মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট
; ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের নানাবিধ কুৎসা করিতে থাকে।
দ্যাসাগর মহাশয় ঈষদ্ধাস্যের সহিত তাহার কথা শেষ
্যন্ত শুনিলেন। শুনিয়া অবশেষে বলিলেন, "তোমার
থা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া
ল। লোকটা সমস্ত দিন গভর্মেণ্টের কাজে ব্যস্ত
:ক, আবার রাত্রিও যদি এই রকমে কাটায়, তবে
: লিখ্‌তে সময় পায় কখন? তার কেতাবে যে আমার
লমারির একটা সেল্‌ফ ভরে গেল।"

তবে সাহিত্যিকদের সহিত আলাপাদি করা সময়
পব্যয় বলিয়া তিনি বিবেচনা করিতেন না। তাঁহার
লকিভাঙ্গার বাড়ীতে সাহিত্যিকদের একটা মস্ত অড্ডা
।। চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ
াপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার,
বিহারী সেন, মুরলীধর সেন, নীলকণ্ঠ মজুমদার ও
াদর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই আসিয়া বঙ্কিম-
র বৈঠকখানা অলঙ্কৃত করিতেন। ইঁহারা সকলে

প্রত্যহ আসিতেন না; অবসর মত রবিবারে আসিয়া আড্ডা দিতেন। সময় সময় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গোবিন্দদাস প্রভৃতি মহাশয়েরাও আসিতেন। এ অড্ডায় সাহিত্য চর্চ্চাই বেশীর ভাগ হইত। এখন আর সেরূপ কোন আড্ডা দেখিতে পাই না। তবে আমরা এখন 'পূর্ণিমা-মিলন' পাইয়াছি, বৎসরান্তে 'সাহিত্য-সম্মিলন'ও লাভ করিয়াছি। তাহাতে লাভ কতটুকু হইয়াছে, তা' বলিতে পারি না। "

স্থানান্তরে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে'র স্থান-বিশেষ অনুবাদ করিয়া লেডি ইলিয়টকে উপহার দিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইল অনুবাদ করিবার জন্য যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট অনুমতি-প্রার্থী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিরাশ হইতে হয় নাই। দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি আরও কয়েক খানি পুস্তক ইংরাজী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সকল পুস্তক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইতে দেওয়া উচিত, এরূপ তিনি বিবেচনা করিতেন না। দেবী-চৌধুরাণী সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। কেন

ছিল, তাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। কথাটা গোড়া হইতে বলাই ভাল।

ইংলণ্ডে একটি ক্লব ছিল—সম্ভবতঃ এখনও আছে। সেই ক্লবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে যাঁহারা সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষার্থী, তাঁহারাই সুধু যোগদান করিতেন। সেই সভায় ভিন্নজাতীয় সভ্যেরা আপন আপন দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য বা সাহিত্য, ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া অপরাপর সভ্যদের শুনাইতেন। মিষ্টার জে, এন, গুপ্ত যখন শিক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি এই ক্লবের অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থনিচয় মুখে মুখে অনুবাদ করিয়া অন্যান্য শ্রোতাদের শুনাইতেন। এক দিন দেবীচৌধুরাণীর অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়া শুনাইতেছিলেন। তচ্ছ্রবণে য়ুরোপীয় শ্রোতারা সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া দেবীচৌধুরাণীর অনুবাদ প্রকাশের জন্য মিষ্টার জে, এন, গুপ্তকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য গুপ্ত সাহেবকে চেষ্টান্বিত হইতে হইয়াছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমতি-প্রাপ্তির আশায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে বিলাত হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সুরেশবাবুর বক্তব্য আদ্যন্ত শুনিয়া তাঁহাকে একখানি বাঁধান পুস্তক দেখাইয়াছিলেন। পুস্তকখানি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকৃত "দেবীচৌধুরাণী"র ইংরাজি অনুবাদ। কিন্তু ছাপান হয় নাই। পুস্তকখানি দেখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আমি এ অনুবাদ নিজে করিয়াছি, কিন্তু ছাপাই নাই; কেন, তা' জান? আমার মনে হয়, ইংরেজেরা বহুবিবাহ পছন্দ করিবে না— তাহারা হয় ত এ দৃষ্টান্ত দেখিয়া বাঙ্গালীকে ঘৃণা করিবে।" বলা বহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণীর অনুবাদ প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই; তিনি নিজেও কোন অনুবাদ ছাপান নাই।

সাহিত্যিক মাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় ছিল। তাঁহাদের উপদেশ দিতে বা বিপদে সাহায্য করিতে কখন তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। একবার ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার একখানি সাপ্তাহিক পত্র ছিল। পত্রখানির নাম—"প্রকৃতি"। অনুকূল বাবু ইহার সম্পাদক ও সত্বাধিকারী ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ৺গোবিন্দচন্দ্র

দাস উক্ত পত্রে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি ভাওয়ালের রাজা ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। কবিতা পড়িয়াই ত কালীপ্রসন্ন বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া দিলেন। স্থানীয় যাবতীয় উকীল মোক্তার ঘোষ মহাশয়ের পক্ষে নিযুক্ত হইল। খরচ সম্ভবতঃ রাজার। দরিদ্র, সাহিত্যসেবী অনুকূল বাবু মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি ভীত হইয়া ডেপুটী মেজেষ্ট্রেট রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের শরণাগত হইলেন। সেন মহাশয় মোকর্দ্দমা মিটাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অবশেষে অনুকূল বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিলেন। উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বে কোনও পরিচয় ছিল না। পরিচয়ের প্রয়োজনও দেখি না। যে সাহিত্যিক, সাহিত্যচর্চ্চায় যাহার আনন্দ, সে বঙ্কিমচন্দ্রের পরমাত্মীয়। বিশেষতঃ যে যুবক ক্ষীণ যষ্টি-সাহায্যে সাহিত্য-সৌধের সোপানাবলী অতিক্রম করিবার প্রয়াস পাইতেছে, সে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় হইতেও প্রিয়। অনুকূল বাবুর বিপদের কথা

শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কালীপ্রসন্ন বাবুকে পত্র লিখিলেন। লিখিলেন, "অনুকূল সাহিত্য-সেবা করিতে গিয়া আজ বিপদ্‌গ্রস্ত। তাহার বিরুদ্ধে যে মোকর্দ্দমা স্থাপন করিয়াছ, তাহা উঠাইয়া লইবে। যদি লও, তাহা হইলে এ অনুগ্রহ আমার প্রতিই করা হইল, জানিবে।"

কালীপ্রসন্ন বাবু, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধ ঠেলিতে পারিলেন না,—অবিলম্বে মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইলেন। অনুকূল বাবু স্বীয় পত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মানুষ জনসমাজে পরিচিত হইবার জন্য কতই না চেষ্টা করে। মিথ্যা কথা, অলীক গল্প রচনা করিতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর অনেকেই চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, কিরূপে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের পাণ্ডুলিপি দেখাইয়া মতামত গ্রহণ করিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে কত পরামর্শ গোপনে তাঁহাদের সঙ্গে আঁটিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে আজি

পর্য্যন্ত এ চীৎকারের বিরাম নাই। যে সকল ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রকে দূর হইতে বই নিকটে কখন দেখেন নাই, সেই সকল ব্যক্তির চীৎকারই কিছু বেশী। তা' হউক, এ সকল ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে পারা যায়, কেন না, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সুনাম যশঃ অপহরণ করিবার বাসনা করেন নাই।

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি জনসমাজে প্রচার করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থবিশেষের অংশবিশেষ তাঁহারা রচনা করিয়াছেন, সে সকল ব্যক্তি কোনমতেই মার্জ্জনীয় নহেন। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষণে জীবিত নাই; তাঁহার প্রিয়বন্ধু চন্দ্রনাথ বাবু, রাজকৃষ্ণ বাবু, দীনবন্ধু বাবু প্রভৃতি কেহই সাক্ষ্য দিতে বা প্রতিবাদ করিতে ইহসংসারে নাই। এ অবস্থায় যদি কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের রত্ন অপহরণ করিয়া নিজে সেই রত্নে মণ্ডিত হইবার বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সে প্রবৃত্তিকে ধিক্কার দিয়া আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিব, বঙ্কিমচন্দ্র বা তাঁহার বন্ধুবর্গেরা জীবিত থাকিতে এ সকল কথা বলিতে সাহস পাও নাই, আজ তাঁহাদের অবর্ত্তমানে বঙ্কিমচন্দ্রের যশঃ অপহরণ করিয়া নিজে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার প্রয়াস

পাইতেছ। যাহার ক্ষমতা নাই, যাহার ধন নাই, সেই পরের রত্ন নিজের বলিয়া পরিচয় দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকরাজির মধ্যে "কমলাকান্ত দপ্তরের" দুইটী প্রবন্ধ মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত নয়। সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক-বিশেষের অংশবিশেষ যদি কেহ লিখিতেন, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে সে কথা বলিতেন—পুস্তকশিরে সানন্দে সন্নিবিষ্ট করিয়া যাইতেন। যখন তিনি তাহা করেন নাই, তখন আজ বিশ বৎসর পরে কোন ব্যক্তি অংশ-বিশেষ দাবী করিলে জনসমাজ তাঁহার দাবী অশ্রদ্ধেয় বলিয়া উড়াইয়া দিবে।

আকবর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একবার দুই চারি কথা বলেন। কোথায় বলেন এবং কি বলেন তাহা ঠিক জানিয়া উঠিতে পারি নাই। অবশেষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে বোলপুরে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"বহুকাল হইল জেনেরাল এসেম্ব্রির হল ঘরে 'ভারত-বাসী ও ইংরাজ' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সেই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। প্রবন্ধে আকবরের কিছু প্রশংসা ছিল, তদুত্তরে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন—'আকবরের মত কোনো মোগল বাদসাই হিন্দুর অনিষ্ট করে নাই। তিনি বন্ধুত্বর ছলেই হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শত্রুতা সাধন করিয়াছিলেন।' তাঁহার এই উক্তি কোনো ছাপার কাগজে বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই।"

ইনষ্টিটিয়ুট-মন্দিরে ১৮৯৩ সালের ১০ই অক্টোবর অপরাহ্নে society for the higher training of young menর একটি অধিবেশন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেই সভায় জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহার পর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র আর একবার উক্ত সোসাইটীর একটি সভায়

যোগদান করেন। সে সভায় তদানীন্তন ছোটলাট ইলিয়ট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনও প্রকাশ্য সভায় যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। তবে ইনষ্টিটিয়ুট-মন্দিরে ইহার পরেও দুইবার আসিয়াছিলেন। প্রথম বার, ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবারে—দ্বিতীয়বার, মৃত্যু-শয্যা গ্রহণ করিবার সপ্তাহ খানেক পূর্ব্বে। সে দুইবার বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় একটি বাটী ক্রয় করিয়া তথায় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর বাস করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এই বাটীতে উঠিয়া আসেন। বাটীটি পটলডাঙ্গায় মেডিকেল কালেজের সম্মুখে অবস্থিত। ইহা এক্ষণে 'বঙ্কিম-আশ্রম' নামে সাধারণ্যে পরিচিত। বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালে গভর্মেণ্ট হইতে একটি প্রস্তর-ফলক বঙ্কিম-আশ্রমের প্রাচীরে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে,—এই স্থানে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন। জন্ম-সন ১৮৩৬, মৃত্যু-সন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ।

ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায়কে বঙ্কিমচন্দ্র একটু স্নেহ করিতেন। উভয়ে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। দামোদর বাবুর "শান্তি"-উপন্যাস প্রকাশিত হইলে তিনি একখানি পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রকে উপহার দিয়াছিলেন। উপহার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—

"প্রিয়তমেষু—

* * *

শান্তি প্রাপ্ত হইলাম। ইহলোকে পাইলাম—পরলোকেও ভরসা করি দামোদর তাহাতে আমায় বঞ্চিত করিবেন না। ইতি তাং ২২ আশ্বিন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে কবিতাও লিখিতে হইত। সেটা ইচ্ছাপূর্ব্বক নয়—দায়ে পড়িয়া। একবার কালেজ Re-union মিলন-সভার পাঠোপযোগী একটি কবিতা লিখিতে বঙ্কিমচন্দ্র অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। অনুরোধ করিয়াছিলেন, জগদীশ বাবু। সে আজ প্রায় চল্লিশ

বৎসরের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র তখন মালদহে। কিন্তু তিনি কবিতা লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই জানাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; আমি তাঁহার পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উদ্ধৃত করিবার আরও একটু কারণ আছে; বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে লিখিতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র তদ্‌সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পত্রখানি শেষ করিয়াছেন। উপদেশটুকু মূল্যবান্। পত্রখানি ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছিল। আমি অনুবাদ না করিয়া যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম।

MALDA.

The 30th December.

My dear Jagadish.

You write that you would be glad if I sent something for the Re-union. As I would do anything to make you glad, I immediately got down to write a poem for you. I received your note on the evening of the 28th, the post having been accidentally delayed for a few hours. I finished

a few stanzas this evening, but sleep came on and I put it off to next mor ning.

* * *

If I send it by tomorrow post you won't get it in time. So I think I must give up the dea of contributing to your pleasure.

But it strikes me that it may be some compensation to you for this and contretemps of khani * had an opportunity of reading his unfinished novel before the assembled friends at the Re-union. And I therefore post back his manuscript today. Khani must, in my opinion, chasten down his style and curb his redundant flow of words and imagery, which at present obscures the neaning and wearies the reader. He should ry to avoid too much rhetoric and ornament.

---

* Babu Khagendranath Raya, son of the late Babu Jagadishnath Raya.

Explain to him that clearness and simplicity are the best of all ornaments, and that I have arrived at this conviction after much painful experience. He should re-write his book with reference to these remarks.

* * *

Yours affly
Bankim Chandra Chattarji.

শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র বড় একটা ইংরাজীতে পত্র লিখিতেন না। আমরা কখনও তাঁহার ইংরাজী পত্র পাই নাই। তিনি বলিতেন, "বাঙ্গালা ভাষায় যখন আমরা সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারি, তখন আমরা নিজের ভাষা ছাড়িয়া কেন অপরের ভাষায় পত্র লিখিব? তা' ছাড়া ইংরাজী ভাষাটা insincere বলিয়া মনে হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে

পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত।

শ্রীমতী মিরিয়ম নাইট, "বিষবৃক্ষ" ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বিষবৃক্ষ ইংরাজিতে হইল, "Poison Tree"—মহাপণ্ডিত Edwin Arnold, Poison treeর একটা ভূমিকা লিখিয়া বলিয়াছিলেন,—"I soon found that what was begun as a literary task became a real and singular pleasure, by reason of the author's vivid narrative, his skill in delineating character, and, beyond all, the striking and faithful pictures of Indian life with which his tale is filled. * * Five years ago, Sir William Herschel, of the Bengal Civil Service, had the intention of translating this Bisha Briksha ; but surrendered the task, with the author's full consent, to Mrs. Knight.

"The author of the "Poison Tree" is Babu Bankim Chandra Chatterjee of superior intellectual acquisitions, who ranks unquestionably as the first living writer of fiction in his Presidency. * * It will be confessed, I think, that the reputation of Bankim Babu is well deserved, and that Bengal has here produced a writer of true genius, whose vivacious invention, dramatic force, and purity of aim, promise well for the new age of Indian vernacular literature.

"Among Bengali authors no one held a higher place in his own line than the late Bankim Chandra Chatterji. He rendered good service in a number of districts; while in charge of the Khulna Sub-division he helped very largely in suppressing river dacoities and establishing peace and order in the eastern canals." *

* Buckland's Bengal under the Lieutenant governors. Page 1078.

"Like Madhusudan Dutt, Bankim Chandra Chatterji was ridiculed for his new departure from the high ways of prose-writing in Bengal. Critics are readymade, and not a few of them condemned in bitter language his style, his composition, the plot of his story, and the audacity of his conceptions. But Bankim Chandra outlived all cynical criticism, and succeeded in inaugarating a new era of prose literature in Bengal—" *

"Bankim Chandra was beyond question the greatest novelist of India during the 19 th century, whether judged by the amount and quality of his writings, or by the influence which they have continued to exercise. His education had brought him into touch with the works of the great

* Pillai—Representative Indians—Page 70.

European romance writers, notably Sir Walter Scott, and he created in India a school of fiction on the European model. * * * And the *Kapalkundla* and *Mrinalini* which followed it, established his fame as a writer whose creative imagination and power of delineation had never been surpassed in India.—" *

"His Durgeshnandini was the first, and is unquestionably the best, novel in Bengal. The Kapalkundala, though equally good, i not so well spoken of by native readers. The style is essentially Babu Bankim's own and we meet with the same witticisms, the sly hits, and the same displeasing combination of the grave with the ludicrous. The characters are all what we should expect

* **Encyclopœdia Britannica.**

to see in real life; and the vivid descriptions of scenery, natural and artificial, always our author's *forte*, are so telling that scarcely any Bengali novelist of the present day except, perhaps, the writer of *Bangadhip-parajaya* can hope to match him in the line—" Calcutta Review, Vol. LVII.

"We have now before us an historical prose romance (Durgeshanandini) by a Bengali author, which rejecting all the mythological times, has fixed its scene in the days of the great Emperor Akbar, and, without a single marvel of magic or metampsychosis, seeks its sole interest in human passion and life's daily struggles with adverse circumstances. The book has already reached its fourth edition, and we may therefore fairly consider it as the successful inaugurator of a new kind of literature in

Bengal. He (Bankim Chandra) has since written several novels in Bengali ; but the one which we have taken as our subject is the most successful with his countrymen ; and we think it is well worthy of some notice in England, as the first attempt to transplant into India our own historical novel,"—Professor Cowell—Mackmillan's Magazine, Vol XXV. Page 455.

ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্র Punch বিষবৃক্ষের অনুবাদ পাঠ করিয়া ১৮৮৫ সালের ৩রা জানুয়ারির কাগজে লিখিয়াছেন :—

"THE POISON TREE"

You ought to read the Poison Tree
'Tis Fisher Unwin's copyright—
By Bankim Chandra Chatterjee !

'Tis taken from the Bengali,
Translated well by Mrs. Knight—
You ought to read the Poison Tree.

'Tis published in one vol.—not three—
A story quaint and apposite ;
By Bankim Chandra Chatterjee.

As Mr. Edwin Arnold he—
A learned preface doth indite ;
You ought to read the Poison Tree.

Though bored by novels you may be—
Don't miss this tale, by oversight,
By Bankim Chandra Chatterjee.

'Twill whet, this novel—noveltee,
The novel reader's appetite.
You ought to read the Poison Tree
By Bankim Chandra Chatterjee.

শ্রীমতী মিরিয়ম নাইট, রজকান্তের উইলেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। Oxford University মহাযশস্বী Blumhardt সাহেব, সেই অনুবাদের একটা ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। ভূমিকাটুকু সুন্দর। কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"Bankim Chandra Chatterjee was unquestionably the greatest novelist that India has ever produced. No other writer has done so much to improve the style, and to raise the tone of Bengali literature. His severe criticisms on the worthless and ephemeral productions of so many of his fellow countrymen, his fearless exposure of the faults and shortcomings of Hindu social life, and of the evils arising from a corrupt and superstitious form of Hindu religion, have brought about a complete revolution in the history of Bengali literature.

"He was himself a vigorous author. His

works display a wonderful power of description and delineation of human life and character, which render them so deeply interesting and instructive.

"Towards the close of his life Bankim Chandra appeared as an advocate of a reformed system of Hindu religion, and a teacher of the sublime philosophy of the Bhagavadgita.

"Bankim Chandra was also an able exponent of intellectual and scientific research. He was himself a perfect master of the English language, as well as of Sanskrit"

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার মূল্যবান পুস্তকে (Literature of Bengal) লিখিয়াছেন :—

"Bankim Chandra Chatterjee is in prose what Madhu Sudan Dutt is in verse,—

the founder of a new style—the exponent of a new idea. In creative imaginations, in gorgeous description, in power to conceive, and in skill to desciibe, Madhu Sudan and Bankim Chandra stand apart from the other writers of the century; they are the first, the second is nowhere. And if the pcet's conceptions are more lofty and more sublime, the novelist's conceptions are more varied, have more of human interest, and appeal more touchingly to our softer emotions. The palm must be given to the poet who has bodied forth beings of heaven and earth and the lower regions in gorgeous verse which sprang into existence like an echo to his ideas; but the reader, after he has traversed the universe on the wings of the mighty poet, will descend with a sense of pleasure to the homely scenes of the novelist, peopled with

figures and faces so true and life-like, so sparkling and animated, so rich in their variety and beauty, that they seem to be a world by themselves, created by the will of the great enchanter !"

R. W. Fraser, L. L. B. তাঁহার Literary history of India পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"Bankim Chandra Chatterjee is the first great creative genius modern India has produced. For the Western reader his novels are a revelation of the inward spirit of Indian life and thought.

"As a creative artist he soars to heights unattained by Tulsi Das, the first true dramatic genius India saw. To claim him solely as a product of Western influence would be to neglect the heritage he held ready to his hand from the poetry of his own country.

"The English reader must not be sur-

prised if, in the novels of the greatest novelist India has seen, there is much of Eastern form, much of poetic fancy and spiritual mysticism alien to a Western craving for objective realism. Bankim Chandra Chatterji, with all the insight of Eastern poetic genius, with all the artistic delicacy of touch so easily attained by the subtle deftness of a high caste native of India, or a Pierre Loti, weaves a fine-spun drama of life, fashioning his characters and painting their surroundings with the same gentle touch, as though his fingers worked amid the frail petals of some flower, or moved along the lines of fine silk, to frame therewith a texture as unsubstantial as the dreamy fancies with which all life is woven, as warp and woof.

* * *

"The novel (Kapalkundala) throughout moves steadily to its purpose. There is no over-elaboration, no undue working after effect ; everywhere there are signs of the work of an artist whose hand falters not as he chisels out his lines with classic grace The force that moves the whole with emotion, and gives to it its subtle spell, is the mystic form of Eastern thought that clearly shows the new forms that lie ready for inspiring a new school of fiction with fresh life. Outside the "Mar-age de Loti" there is nothing comparable to the "Kapalkundala" in the history of Western fiction, although the novelist himself, and many of his native admirers, see grounds for comparing the works of Bankim Babu with those of Sir Walter Scott, probably because they are outwardly historical.

"In Nagendra's love for Kunda the novelist declares that he wished to depict the fleeting love of passion, as sung by Kalidasa, Byron, and Jaya Deva, and in his love for Surjyamukhi, the deep love which sacrifices one's own happiness for the love of another, as sung by Shakespeare, Valmiki, and Madame de Stael.

"He leaves us in doubt whether he is depicting life as it throbbed around him, or whether he has hemmed in his characters with a surrounding of Eastern mysticism and romantic reserve born of Western conventionality."

উক্ত পুস্তকের আর এক স্থানে Fraser সাহেব বলিয়া গিয়াছেন :—

"Men such as Rammohan Roy, Keshab Chandra Sen, Madhusudan Dutt, Bankim Chandra Chatterji, Kasi Nath .Trimbak

Telang are no bastard bantlings of a western civilisation; they were creative geniuses worthy to be reckoned in the history of India with such men of old as Kalidas, Chaitanya, Jayadeva, Tulsi Das and Sankaracharjya and destined in the future to shine clear as the first glowing sparks sent out in the fiery furnace where new and old were fusing."

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হইলে পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী Calcutta University Magazine পত্রে [Dated May 1, 1894] লিখিয়াছিলেন :—

'One of his (Bankim's) ancestors received the title of high nobility in the court of Ballal Sen His title was confirmed by Ballal's distinguished son, king Lakshman Sen. One of Bankim's ancestors performed the difficult and now unknown sacrifice of *Aswatha*, hence the family was distinguished above all other brahman families in Bengal as *Aswatha*. This family is one of those which never migrated to Vikrampur after the fall of Hindu

monarchy in western Bengal. By the middle of the sixteenth century, when a great Chapter of Rarhyah bramhan nobility was held under the presidency of Devivara, the great re-organiser, Bankim's ancestors were found so distinguished for their learning, piety and strict adherence to Hindu laws that they were placed in the highest of the thirty-six exogamus groups or *Mels* into which Devivara divided the *Kulin* brahmans of his time.

"Ishvara Gupta was so much charmed with his (Bankim's) poetical & prose compositions that he often paid him a visit at Kantalpara. In after life, Bankim Chandra used to relate to his friends the story of these visits with pride

"At College Bankim Chandra was a voracious reader of history, and he always longed to be a distinguished historian. It is often observed that literary men are averse to mathematics, but this was not the case with our hero. He took to mathematics with as much zest as he took to literature. His English style was terse and vigorous, and was often characterised by his superior officers as pungent.

*　　*　　*

He was not always social, some people thought he was positively rude, but he was all love, all admiration in the company of his literary friends whatever their age & position in life."

ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বহু পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন,—"যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে! যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবুর প্রদর্শিত সংস্কৃত বহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা-রচনার উৎকৃষ্ট রীতি।"

বঙ্কিম-জীবনী।

পঞ্চম খণ্ড।

সংসার ও সমাজ।

বঙ্কিমচন্দ্র—হৃদয়।

স্নেহময় হৃদয় লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সংসারে আসিয়াছিলেন। মাতাপিতার চরণপ্রান্তে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নবীন বয়সে যে প্রেমশিক্ষা করিয়াছিলেন, সে প্রেম তাঁহাকে আজীবন উন্মত্ত রাখিয়াছিল। সে প্রেম-কণা তাঁহার উপন্যাসে, সে প্রেম-কণা তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে'। মাতাপিতা, স্ত্রীকন্যাকে সকলেই ভালবাসে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত কয়জন ভালবাসিতে পারিয়াছেন? বঙ্কিমচন্দ্র পিতাকে মানুষ মনে করিতেন না—জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা মনে করিতেন। স্ত্রীকে সুধু ভার্য্যা মনে করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না—সহধর্ম্মিণী-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। আত্মজাকে লালন পালন করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ হইল, এরূপ মনে করিতেন না; তিনি তাহাকে নিজের উপযুক্ত শিষ্যা করিবার উদ্দেশে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেন। এইরূপে দেখিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহ বা প্রেম কেমন একটু স্বর্গীয়ভাবে, কেমন একটু বিশেষত্বে বিজড়িত। সে ভাব সংসারে সচরাচর দৃষ্ট হয় না; সে ভাব সকল স্থলে শিক্ষা পাওয়া যায় না। যাদবচন্দ্র

যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পুষ্পফলে ক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। এমনটা হইবে যাদবচন্দ্র বুঝি জ্ঞানবলে পূর্ব্বাহ্নে জানিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাই বঙ্কিমচন্দ্র যখন অনাচারী ও ঘোরতর নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন যাদবচন্দ্র একদিনের জন্যও সদুপদেশ দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করেন নাই, বা সুপথে আনিবার চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে কয়েকটী গল্পের অবতারণা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র—পুত্ররূপে।

একবার পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্রের শরীর একটু অসুস্থ হইয়াছিল। তিনি খট্টাঙ্গোপরি শয্যায় শয়ান ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পিতার নাড়ী পরীক্ষা করিবার বাসনা করিলেন। যাদবচন্দ্রের একপার্শ্বে গৃহ-প্রাচীর, অপর পার্শ্ব উন্মুক্ত। যাদবচন্দ্র প্রাচীরের নিকট শয়ান ছিলেন। শয্যার উপর না উঠিলে যাদবচন্দ্রকে স্পর্শ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র বিপদে পড়িলেন; শয্যার উপর উঠিতে পারেন না, পিতাকেও সরিয়া আসিতে বলিতে পারেন না। অবশেষে তিনি এক পাশের বিছানা

উঠাইয়া খাটের উপর পা রাখিয়া পিতার হস্তস্পর্শ করিলেন। পিতার শয্যা, পিতার বসন, পিতার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পবিত্র জ্ঞান করিতেন। পিতার কক্ষে কখন চর্ম্মপাদুকা ধারণ করিয়া আসিতেন না—পিতার ব্যবহৃত বস্ত্র কখন ব্যবহার করিতেন না।

আর এক দিনের কথা বলিব। একদা বঙ্কিমচন্দ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাদবচন্দ্র তখন নিম্নতুণ্ডে বঙ্গদর্শনের হিসাব লিখিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি কাণে কম শুনিতেন। পদশব্দ শুনিতে পাওয়া দূরে থাক, নিকটে দাঁড়াইয়া সহজকণ্ঠে কেহ কথা কহিলেও তিনি শুনিতে পাইতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের পদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশলাভ করিল না। পিতৃভক্ত সন্তান পিতার কার্য্যে বাধা দিতে পারেন না—শিক্ষিত ভদ্রসন্তান পিতাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে পারেন না। পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া চলিয়া যাওয়াটা তিনি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না; তাহাতে পিতার প্রতি একটু যেন অবজ্ঞা দেখান হয়—যেন একটু

অধৈর্য্য, একটু বিরক্তি প্রদর্শন করা হয়। জানি না কি ভাবিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে, নিঃশব্দে পিতার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। অবশেষে যাদবচন্দ্রের একজন বৃদ্ধা দাসী * তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল সে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঈদৃশ বিপদাপন্ন দেখিয়া হাসিয়া উঠিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "কর্ত্তামশায়, ও কর্ত্তামশায়, সেজবাবু এসে দাঁড়িয়ে আছেন যে।"

কর্ত্তামহাশয় তখন মাথা তুলিয়া দেখিলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া বসিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম কর্ম্মস্থল যশোহর অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন তিনি জননীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদোদক একটা শিশিতে ভরিয়া লইয়াছিলেন। যে জলটা জননীর পদস্পৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা গঙ্গোদক; জননী বলিলেন, "করলি কি! গঙ্গাজল আমার পায়ে ঠেকালি?"

* দাসীর নাম লক্ষ্মী; চল্লিশ বৎসর যাদবচন্দ্রের সেবা করি সম্প্রতি অশীতি বৎসর বয়সে মারা গিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ছল্ ছল্ নয়নে বলিলেন, "মা, তোমার চেয়ে কি গঙ্গা বড় ?"

মাতৃভক্ত সন্তান চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতার কক্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কক্ষ বাহিরে পাদুকা খুলিয়া, লোকে যেরূপে দেবালয়ে প্রবেশ করে, বঙ্কিম-চন্দ্র সেইরূপে ভক্তিপ্লুত চিত্তে পিতার ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে প্রণাম করিলেন, পিতার চরণধূলি মাথায় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না,—তিনি পিতার চরণ সমীপে বসিয়া রহিলেন। ইচ্ছা, পাদোদক গ্রহণ করেন। কিন্তু বলিতে সাহসে কুলাইল না। একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিলেন; দেখিলেন, অদূরে আমার জননী ও পিতামহী নীরবে ম্লানমুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের পিছু পিছু আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কাতর দৃষ্টিতে জননীর পানে চাহিলেন। তিনি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন; এবং ঝটিতি একটা জলপূর্ণ ক্ষুদ্রপাত্র আনিয়া যাদবচন্দ্রের চরণসমীপে রক্ষা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অবনতবদনে নীরব রহিলেন। যাদবচন্দ্র পা বাড়াইয়া দিলেন। ভক্ত পুত্র তাহা সযতনে ধৌত

করিয়া লইলেন, এবং অন্তরালে গিয়া সেই পাদোদক একটা শিশিতে পূর্ণ করিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বঙ্কিমচন্দ্র পাদোদকপূর্ণ সেই শিশি দুইটি সম্বল করিয়া বিদেশে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র—ভ্রাতৃরূপে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার তিন সহোদর ভ্রাতা ডিপুটী কলেক্টর ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র (Departmental) পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় স্পেশল সবরেজিষ্ট্রার পদে অবনীত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র সবরেজিষ্ট্রারের পদ হইতে—বঙ্কিমচন্দ্রের সাহায্যে—ডিপুটী কলেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ আট টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়া অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে দুই বৎসরের মধ্যে ডিপুটী কলেক্টার হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি চারি ভ্রাতার মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। তবে মধ্য বয়সে সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত ও শেষ বয়সে শ্যামাচরণের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের একটু মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র—পিতৃরূপে।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিন কন্যা। পুত্র হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় কনিষ্ঠা কন্যা উৎপলকুমারীর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় কন্যা নীলাব্জকুমারীর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা শরৎকুমারী এক্ষণে বর্ত্তমান। এই জ্যেষ্ঠা কন্যা বঙ্কিমচন্দ্রের অতিশয় প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্র যতটা স্নেহ করিতেন, এ সংসারে বুঝি তিনি কাহাকেও এতটা স্নেহ করিতেন না। দুইটি দিনের কথা তুলিয়া তাঁহার অপরিসীম স্নেহ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুই জন পাচক ছিল; কিন্তু তাহারা প্রভুর আহার্য্য থালীতে সাজাইয়া আনিয়া দিত না। সে ভার কন্যা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃসেবায় তৃপ্তি, পিতার সে সেবা-গ্রহণে তৃপ্তি। এক দিন রাত্রিতে কন্যা আহার্য্য আনিয়া যথাস্থানে রক্ষা করিয়া পিতাকে ডাকিলেন, "বাবা, খাবার দিয়েছি—এস।" পিতা উত্তর দিলেন না। তিনি ঘরের ভিতর মুদ্রিতনয়নে চেয়ারে উপবিষ্ট, কন্যা বারাণ্ডায় থালার

কাছে দণ্ডায়মান। পিতার উত্তর না পাইয়া কন্যা আবার ডাকিলেন, "বাবা, এস!" পিতা নিরুত্তর। কন্যা পুনরায় ডাকিলেন। অবশেষে খুড়ী-মা উঠিয়া চেয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমুলে নাকি?" বঙ্কিমচন্দ্র মৃদুকণ্ঠে তখন উত্তর করিলেন, "চুপ্ কর, শরৎ ডাক্‌ছে—আমায় শুন্‌তে দাও।" একখানি উপন্যাস লিখিয়া যাহা বুঝান যায় না, একটি ক্ষুদ্র কথায় বঙ্কিমচন্দ্র তাহা ব্যক্ত করিলেন।

আর একদিন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র নিশাকালে শয়ন করিতে গিয়া দেখেন, তাঁহার শয়ন-কক্ষে কেন্নো বিচরণ করিতেছে। কেন্নো ও কেঁচোকে বঙ্কিমচন্দ্র অতিশয় ভয় করিতেন। কেন্নো দেখিয়া তিনি কিছুতেই আর সে ঘরে শয়ন করিতে চাহিলেন না। বলিলেন, "আমি নীচে বৈঠকখানায় গিয়া শুইব।" খুড়ীমা কত বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি ঘরে আর প্রবেশ করিলেন না—বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে পূজনীয়া ভগিনী শরৎকুমারী আসিয়া বলিলেন, "বাবা, ঘরে আর কেন্নো নেই; তুমি এস।" বঙ্কিমচন্দ্র তখন আর কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া নিঃসঙ্কোচে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র—বন্ধুরূপে।

আত্মপরিবার ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের ভালবাসিবার স্থল ছিল। তাঁহার চারিটী অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। একটীর নাম ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য। তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ক্ষেত্রবাবু যখন হুগলীতে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সে সাক্ষাৎ হৃদয়স্পর্শী। উভয়ে কাঁদিয়া শয্যা ভাসাইয়াছিলেন। ভূদেব বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা।

তাঁহার দ্বিতীয় বন্ধুরও নাম বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন। তিনি ভবানীপুর-নিবাসী জনৈক এটর্ণি—নাম, রাধামাধব বসু। ইঁহার সদ্‌গুণে বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় মুগ্ধ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের একাংশ এই রাধা-মাধব বাবুর সহিত এমনিভাবে বিজড়িত যে, তাহার উল্লেখ করিলে কেহ কেহ মনঃপীড়া পাইতে পারেন। রাধামাধব বাবুর সঙ্গে যখন কোন রায়বাহাদুরের বিবাদ বাধে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র রাধামাধব বাবুর পক্ষাবলম্বন করিয়া একটী প্রবল শত্রুর সৃষ্টি করেন। এই শত্রু

আজীবন বঙ্কিমচন্দ্রকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাধামাধব বাবু নিষ্কৃতি পাইলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে কাঁদাইয়া অকালে স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার শোক বঙ্কিমচন্দ্র কোন কালে ভুলিতে পারেন নাই।

তার পর আরও দুইটী বন্ধুর পরিচয় দিব। একটি দীনবন্ধু মিত্র, অপরটি জগদীশ নাথ রায়। উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। বড় হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সহোদর-তুল্য স্নেহ করিতেন। আজ কাল যে রকম বন্ধু দেখা যায়, সে রকম বন্ধু তাঁহারা ছিলেন না। আমরা স্বার্থ, আত্মাভিমান লইয়া ব্যস্ত। এই দুটীকে পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা বন্ধুকে ভালবাসিতে পারি না। মুখে শতবার বলিব, তোমায় আমি প্রাণতুল্য ভালবাসি; কিন্তু কাল যদি তোমার চাকরী যায়, তাহা হইলে আমি গম্ভীর বদনে তোমায় কত উপদেশ দিব, তিরস্কার করিব। পরশ্ব যদি খাইতে না পাও, তোমার নিকট হইতে আমি সরিয়া দাঁড়াইব। অথবা, তুমি যদি আমার আত্মাভিমানে আঘাত করিয়া আমায় ভালরূপ অভ্যর্থনা না কর, কিংবা আমায় মিথ্যাবাদী বা অন্য কোন দুর্ব্বাক্য

বল, আমি তখনই তোমার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিব, ও তোমার নামে Defamation Case চলিতে পারে কিনা জানিবার জন্য উকীল-বাড়ী ছুটিব। আমি মনে মনে জানি, আমি একজন ঘোরতর মিথ্যাবাদী। কিন্তু আমার বন্ধু কেন সে কথা আমায় বলিবে? তা'র right কি আছে? আমরা এইরূপেই আজ কাল বন্ধুত্ব করি। আমরা জানি না, আমরা বুঝি না—ভালবাসিয়া সংসারে কত সুখ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাহা জানিতেন। যাহাকে ভালবাসিতেন, তাহাকে সর্ব্বস্ব দিতেন—আপনার বলিয়া কিছু রাখিতেন না। আমি একটী গল্প বাল্যকালে জনৈক পুরাতন ভৃত্যের নিকট শুনিয়াছিলাম। সত্য কি মিথ্যা তা' জানি না। কিন্তু ভৃত্যেরা মিথ্যারচনায় দক্ষ নয় বলিয়া আমার বিশ্বাস।

একদা দীনবন্ধু বাবু আমাদের কাঁটালপাড়ার বাটিতে বেড়াইতে অথবা নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই আসিতেন। তবে একদিনের ঘটনা আমি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। সে দিন তিনি সন্ধ্যার পর একটু রাত্রি হইলে আসিয়াছিলেন। আসিয়া

দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় তাঁহার কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। সে সময় জগদীশ বাবু, ঈশ্বর বাবু, প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই দীনবন্ধু বাবুর বন্ধু। 'সধবার-একাদশী' লেখককে দেখিয়া সকলে আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু, দীনবন্ধু বাবুর প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না—বাক্যে বা ইঙ্গিতে তাঁহাকে অভ্যর্থনাও করিলেন না। দীনবন্ধু বাবু সেটা লক্ষ্য করিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার একটু অপরাধ হইয়াছে। তিনি কেন বিলম্বে আসিলেন? বঙ্কিম যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র! এরূপ অভ্যর্থনায় অপরাধ লওয়া দূরে থাকুক, মহাপ্রাণ দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্রে আরও অনুরক্ত হইলেন। কিন্তু সেটা—সে ভাবটা বাহিরে প্রকাশ করিলেন না।

অনন্তর দীনবন্ধু বাবু তথা হইতে উঠিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন; এবং কিছু আহার্য্য চাহিয়া লইয়া জলযোগ করিলেন। তৎপরে আবার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। সেখানে বসিয়া দীনবন্ধু বাবু এমনি হাস্যরসের অবতারণা করিলেন যে, গৃহপ্রাচীর ফাটিয়া

যাইবার উপক্রম হইল। দীনবন্ধু বাবুর স্বরূপ সকলে অবগত নহেন; বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত মহাত্মার জীবনী লিখিবার সময় কিছু পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তি যখন সভাস্থলে বসিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিলেন, তখন কে না হাসিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হাসিলেন না—অনেক কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া রহিলেন। দীনবন্ধু বাবু যখন দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উদর ও পঞ্জর হাস্য-তরঙ্গে নাচিয়া উঠিতেছে, কিন্তু ওষ্ঠে হাস্যরেখা নাই, তখন তিনি উঠিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং কতকগুলা পাতা লতা ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া বৈঠকখানা-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এইটি বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিবার ঘর। এই ঘরে বসিয়া তিনি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন; এবং পাতা লতার রাশি কাটিয়া একটা বড় কাগজে আটা দিয়া বসাইতে লাগিলেন। ক্রমে একটী মনুষ্যাবয়ব সৃষ্ট হইল। মূর্ত্তির উদরটা কিছু বড় রকমের, এবং ঠোঁট দু'খানা কিছু কুঞ্চিত।

দীনবন্ধু বাবু, কাগজখানি ও আটার শিশি লইয়া বৈঠকখানা ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন, ও প্রাচীর গাত্রে সেই বিচিত্র চিত্রখানা আঁটিয়া দিলেন। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি;—দীনবন্ধু বাবু ছবির নীচে দুই ছত্র কি লিখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কবিতা। ছবি দেখিয়া সভাস্থ সকলে হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হাসিলেন না; তিনি বুঝিলেন, এখানি তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি। তিনি অপাঙ্গ দৃষ্টিতে একবার কবিতা দুই ছত্র পড়িয়া লইলেন। পরে চুপি চুপি উঠিয়া পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন; এবং ক্ষিপ্রহস্তে একখণ্ড কাগজে দুই ছত্র কি লিখিলেন। তখন সকলে দীনবন্ধু বাবুর দুই ছত্র কবিতা পাঠে নিবিষ্টচিত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সেই অবসরে তাঁহার লিখিত কাগজখানি আটা সাহায্যে দীনবন্ধু বাবুর পৃষ্ঠদেশে আটিয়া দিলেন। তখন সকলে ছবির নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া দীনবন্ধু বাবুর পৃষ্ঠদেশে সমবেত হইলেন, এবং হাস্য-রোলের মধ্যে কাগজখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু বাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া পিছন ফিরিয়া সকলকে কাগজখানি পড়াইতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "আমার

বলে দাও না গা, আমার পিঠে কি আছে। হাতীর কপাল মন্দ, তাই তা'র পিঠের কোথায় মশাটা মাছিটা বসছে সে দেখ্‌তে পায় না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্‌তে পায় না বলিয়াই ত আমরা তাকে হস্তিমূর্খ বলি।"

দীনবন্ধু বাবু তখন আসরে বসিলেন; এবং বাক্য-বাণ বর্ষণ করিয়া বিপক্ষকে বিদগ্ধ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষও বড় সামান্য ব্যক্তি নহেন। উভয়ের মধ্যে সে রজনীতে যে শেল শূল ভল্ল বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা কেহ লিখিয়া রাখিতে পারিলে আজ এক অমূল্য রত্ন পাইতাম। কিন্তু ভৃত্য আর কিছু বলিতে পারিল না। হায়, সে কেন পণ্ডিত হইল না!—সে কেন সেই অমূল্য দুই চারি ছত্র কবিতা লিখিয়া রাখিল না!

আমি দীনবন্ধু বাবুকে কখন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না। আমার শৈশবে তিনি লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু জগদীশ বাবুকে দেখিয়াছি, তবে তাঁহার মুখাবয়ব আমি এক্ষণে কিছুমাত্র স্মরণ করিয়া উঠিতে পারি না। জগদীশ বাবুর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আলাপ হয় তমলুকে। সে কথা গোড়া হইতে বলিতেছি।

অনেক দিন আগেকার কথা বলিতেছি। তখন সিপাহী-বিদ্রোহ সবে শেষ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় নাগোয়ার মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট। এখন আর নাগোয়ায় মহকুমা নাই—কাঁথিতে উঠিয়া আসিয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন নাগোয়ার হাকিম, তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তখন তমলুকের হাকিম। উভয় স্থানের মধ্যে বিশ ক্রোশ ব্যবধান। পাল্কীতে বা পদব্রজে এ পথ এক দিবসেই সচরাচর লোকে অতিক্রম করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে একদা অতি প্রত্যূষে শিবিকারোহণে তমলুক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তমলুকে আসিতে হইলে একটা নদী পার হইতে হয়। নদীর নাম হল্‌দি। ইহা সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি; ইহাকে ক্ষুদ্র নদী বলিতে সাহস হয় না,—বিশেষ আজিকার এই প্লাবনের দিনে। তবে ইহা নির্ভয়ে বলিতে পারি, কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গার চেয়ে হল্‌দি অনেক ছোট। যে ঘাটে খেয়া নৌকায় হল্‌দি পার হইতে হয়, সে ঘাটের নাম নরঘাট, অথবা নরের ঘাট। গ্রামের নামও তাই। কেন

এমন নাম হইল, তাহার কোনও ইতিহাস দেখিতে পাই না।

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র যখন নরঘাটে আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। তীরে খেয়া নৌকা খানি বাঁধা আছে, কিন্তু মাঝি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ত রাগিয়া অস্থির। মাঝির অনুসন্ধানে চাপরাসী ছুটিল। ঘাটের উপরে একখানি কুঁড়ে ঘর ছিল, তাহাতেই মাঝি ঝড় বৃষ্টি বা রৌদ্রের সময় আশ্রয় লইত। সে ঘরে মাঝি নাই। তখন মাঝির বাড়ী কোথায়, তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। পাল্কী দেখিয়া গ্রামের দুই চারি জন নিষ্কর্ম্মা লোক আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন অনেক পীড়াপীড়ির পর মাঝির বাড়ী দেখাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল। চাপরাশী মহাবেগে তাহার সহিত ধাবিত হইল। কিন্তু তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না; মধ্যপথেই মাঝির সহিত সাক্ষাৎ। মাঝির পরিচয় পাইয়াই চাপরাশী তাহাকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং যাহাতে শিক্ষাটা সহজে অঙ্গ হইতে মুছিয়া না যায়, তাহারও ব্যবস্থা করিল। মাঝি কাঁপিতে কাঁপিতে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত। হাকিম দুই চারি ধমক

দেওয়াতে মাঝি কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হুজুর! আমার ছোট মেয়েটির ওলাউঠা হয়েছে; বদ্যিতে জবাব দিয়েছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্তম্ভিত। তাঁহার ক্রোধ মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল। তিনি মাঝিকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কুটীরের দিকে ধাবিত হইলেন, এবং তাহার কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিদিগকে ডাকাইলেন। গ্রামে যে দুই একজন চিকিৎসক ছিল, তাহারাও আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছোট মেয়েটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাঝির হাতে দুই একটা টাকা দিলেন। চিকিৎসক প্রভৃতিকে তিনি বলিয়া গেলেন, "আমি ফিরিবার সময় সংবাদ লইব, তোমরা রোগীর কিরূপ যত্ন লইয়াছ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সহসা এতটা দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল কেন, ঠিক বলিতে পারি না। ইংরাজিতে যাহাকে revulsion of feelings বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের সেটা প্রায়ই হইত। তবে ক্রোধের মাত্রা যদি ধৈবত নিখাদে উঠিত, সেটা সহসা নামিয়া সহজ সুর বা রেখাবে মুহূর্ত্ত-কালমধ্যে নামিত না! এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ অনুতাপ

হইয়া থাকিবে। অনুতাপের বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। তবে এক এক জন এমন কোমল হৃদয় আছেন যে, তাঁহারা অপরাধ না করিয়াও আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাহিরে একটা গর্ব্ব, একটা ক্রোধের আবরণ ছিল; কিন্তু ভিতরটা বড় প্রেম-ময়। যে তাঁহাকে ভাল করিয়া না বুঝিয়াছে, সে তাঁহাকে ক্রোধী, গর্ব্বিত মনে করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে পঁহুছিলেন, তখন অপরাহ্ণ। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট আরও দুই চারি জন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট অপরিচিত। তন্মধ্যে একজনকে দেখাইয়া পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্কিম, বলিতে পার, এই ভদ্রলোকটি কে?"

বঙ্কিমচন্দ্র ভদ্রলোকটির পানে একবার একটু তীক্ষ্ণ নয়নে চাহিলেন, ক্ষণকাল কি ভাবিলেন; তারপর উত্তর করিলেন, "বাবু জগদীশ নাথ রায়।"

সত্যই ইনি বাবু জগদীশ নাথ রায়। ইনি তখন তমলুকে সল্ট বা পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-রূপে অবস্থান

করিতেছিলেন। জগদীশ বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরে একটু চমৎকৃত হইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিলেন; এবং আজীবন তাহা হস্তমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র—কর্ম্মচারীরূপে।

বঙ্কিমচন্দ্র গভর্মেণ্টের চাকরিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে অসাধারণ তেজস্বিতা, স্বাধীনচিত্ততা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে অনেক দেওয়া হইয়াছে। এই তেজ গর্ব্ব থাকা সত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কখন উপরিতন কর্ম্মচারীর অবাধ্য হয়েন নাই। সরকার বাহাদুর যেখানে যখন তাঁহাকে বদলী করিয়াছেন, সেখানে তখন তিনি অম্লানবদনে গিয়াছেন; কখন অনুযোগ করেন নাই—তোষামোদ করিয়া বদলী রহিত করিতেও কখন চেষ্টা পান নাই। উপরিতন সাহেব যখন যে আদেশ করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সহস্র অসুবিধা সত্বেও তখনই সে আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান সাতিশয় প্রবল ছিল। পৃথিবীর সাম্রাজ্য ধরিয়া দিলেও বোধ হয় তাঁহাকে কেহ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিত না। দুইবার

বিপুল প্রলোভন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তকের জন্যও টলেন নাই। একবার যখন তিনি খুলনায়, দ্বিতীয়বার যখন তিনি আলিপুরে। সে সব কথা তুলিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। একটী ছোট গল্প বলিয়া তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম রাখালচন্দ্র। রাখাল কাকা জিরেট বলাগড়ে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তথায় একব্যক্তি তাঁহার কুটুম্ব ছিলেন। কুটুম্বের নাম—দ্বারিকাদাস চক্রবর্ত্তী। তিনি প্রায়ই কাঁটালপাড়ায় আসিতেন। সেই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীতে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তিনি নৌকা করিয়া হুগলীতে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। দ্বারিকাদাস একদা আসিয়া বলিলেন, "বঙ্কিমবাবু, আজ আপনার নৌকায় আমি হুগলী যাইব।" বঙ্কিমচন্দ্র সাহ্লাদে বলিলেন, "বেশ।" উভয়ে নৌকায় উঠিলেন। তাঁহারা দুই জন ছাড়া নৌকায় আর কোনও ভদ্র আরোহী নাই। নৌকা যখন মধ্যপথে, তখন দ্বারিকাদাস

একটি মোকর্দ্দমার গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। মোকর্দ্দমাটি—ফৌজদারী; ঘটনাস্থল—জিরেট; তাঁহার কোনও বন্ধু বা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি মোকর্দ্দমায় লিপ্ত। গল্পটি শেষ করিয়া দ্বারিকাদাস বলিলেন, "বঙ্কিমবাবু, আপনার হাতে মোকর্দ্দমা—আসামীকে কিছু শাস্তি দিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া মাঝিদের আদেশ করিলেন, "নৌকা ভিড়াও!" নিকটে চর ছিল, মাঝিরা অবিলম্বে নৌকা লাগাইল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন চীৎকার করিয়া আদেশ করিলেন, "লোকটাকে নৌকা হতে ফেলে দে।" দ্বারিকাদাস নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। কিরূপে তিনি গৃহে ফিরিয়াছিলেন, তাহা অবগত নহি। কাঁটালপাড়ায় তিনি আর দর্শন দেন নাই বলিয়া শুনিয়াছি।

আর একবারের একটী গল্প শুনিয়াছি। সেটা বঙ্কিম-চন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র তখন আলি-পুরে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার কোর্টে একটা মোকর্দ্দমা চলিতেছে। একটা সাক্ষীর জাতি সম্বন্ধে বিপক্ষ পক্ষ তর্ক তুলিয়াছেন। সাক্ষী বলিতেছে, সে ব্রাহ্মণ। এখন ব্রাহ্মণ না বলিলে মোকর্দ্দমা টিকে না। বিপক্ষ পক্ষ

বলিতেছেন, সাক্ষী কোন মতেই ব্রাহ্মণ নয়। কিন্তু কিছুই মীমাংসা হইতেছে না। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পৈতা মাজিতে জান?"

সাক্ষী। জানি।

হাকিম। কেমন ক'রে মাজিতে হয় দেখাও দেখি।

সাক্ষী জোর গায়িত্রীটা পর্য্যন্ত শিখিয়া আসিয়াছিল, পৈতা মাজিতে কিরূপে হয়, তাহা কেহ শিখাইয়া দেয় নাই। সুতরাং তাহার জাতিনির্ণয় সহজেই হইয়া গেল।

ক্রীড়ক বঙ্কিমচন্দ্র।

আমার বাল্যকালে আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রমারা খেলায় নিরত থাকিতে দেখিয়াছি। চারি ভাই একত্র বসিয়া খেলিতেন। বাহিরের লোক বড় একটা সে খেলায় যোগ দিত না। বিশেষ যে দিন টাকা পয়সা লইয়া খেলিতেন, সে দিন মাথা কুটিলেও বাহিরের লোক খেলিবার কাত্ পাইত না। হারিলে টাকা ভাইয়ের থাকিবে। সুতরাং হারিলে বিশেষ কোন দুঃখ নাই। তাঁহারা বাহিরের লোককে টাকা লুঠিয়া

লইয়া যাইতে দিতেন না—বাহিরের লোকের টাকা লুঠিতেও ইচ্ছাও করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের খেলার একটু বিশেষত্ব দেখিয়াছিলাম। তিনি প্রমারায় গিয়া তাস না সরিলে লম্বা ডাক ছাড়িতেন, আবার তেরেশ কাতুর বড় বড় দান হাতে করিয়া নীরব থাকিতেন। বুড়া বয়সে তাঁহাকে পাশা খেলিতে দেখিয়াছি; কিন্তু 'চৌষট' নয়—'রং'। একদিনের কথা উল্লেখ করিব। জামাতা শ্রীযুক্ত কপালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত একদিন তিনি 'রং' খেলিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের একটা ঘুঁটি মরিয়া গিয়াছে, পোয়া না পড়িলে সে ঘুঁটি আর বসিবে না, অন্যান্য ঘুঁটির চালও বন্ধ থাকিবে। এ পোয়া কিছুতেই পড়িতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে অধীর হইয়া উঠিলেন। এ সংসারে সে জিনিষটার জন্য আমরা যত ব্যগ্র হই, অধীর হই, যে জিনিষটা তত দূরে সরিয়া যায়। ক্রমে অধীরতার মাত্রা অতিক্রান্ত হইল। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র পাশা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া খেলা ভঙ্গ করিলেন। এ অধীরতা তাঁহার যৌবনে প্রমারা খেলিবার সময় দেখি নাই।

ক্রোধী বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় ক্রোধী ছিলেন। একবার তিনি বায়ুপরিবর্ত্তন-উদ্দেশে কিছুদিনের জন্য চন্দননগরে বাস করেন। বাড়ীটি অতি সুন্দর—দ্বিতল—গঙ্গার উপর। তিনি কিছুদিন তথায় একাকী থাকিয়া আমায় পত্র লিখেন, "তোমার খুড়ীকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে।" আমি খুড়িমা ও দিবেন্দু ও পূরেন্দুকে লইয়া এক দিন প্রাতঃকালে চন্দননগরে আসিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র প্রীত হইলেন; তাঁহার মন প্রফুল্ল—নয়ন স্নেহোৎফুল্ল, ওষ্ঠ হাস্যবিকম্পিত। আমায় বলিলেন, "তোমার খুড়িকে বাগান দেখাইয়া লইয়া এস—আমি স্নান করিয়া লই।"

স্নানাগার দ্বিতলে।

আমি খুড়িমাকে লইয়া বাগানে বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম। বিস্তৃত উদ্যান। আমরা যখন ফিরিয়া বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, তখন সহসা এক চীৎকারশব্দ আমরা শুনিতে পাইলাম। চীৎকারের উপর চীৎকার; আমি ভীত, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। খুড়িমাও দাঁড়াইলেন।

আমরা উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর চিনিলাম; উভয়েই বুঝিলাম, তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছে। আমি বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলাম। কাঁপিবার কোন হেতু ছিল না। তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থাতেও মানুষ বা কোন জীবকে প্রহার করিতেন না—নিরপরাধকে ভর্ৎসনা করিতেন না। তবু আমি তাঁহাকে অত্যধিক ভয় করিতাম। সুধু আমি নই, বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় স্বজনেরা সকলেই তাঁহাকে ভয় করিতেন। সেই পুরুসিংহের সম্মুখে দাঁড়াইতে সকলেরই পা কাঁপিত। আমায় কখনও তিনি রূঢ়বাক্য বলেন নাই, অথচ আমি তাঁহাকে যতটা ভয় করিতাম, পৃথিবীর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ততটা ভয় করিতাম না। তাঁহার ললাটে যখন মেঘ দেখা দিত, তখন তাঁহার বন্ধুরাও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কিন্তু শারদীয় মেঘ, দুই চারিবার গর্জ্জন করিয়াই শান্ত থাকিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছে জানিয়া আমরা আর উপরে গেলাম না। খুড়িমা সিঁড়িতে গিয়া দাঁড়াইলেন ও ক্রমে উপরে উঠিলেন। স্বআমহলে ঢুপি

চুপি কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাগের কারণ কেহ আমাকে বলিতে পারিল না। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় ভৃত্য উপর হইতে নামিয়া আসিল। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, ঝড়ের বেগটা তা'র উপর দিয়া গিয়াছে। তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

ক্ষণপরে একজন দাসী আসিয়া উপরে অন্নাদি লইয়া যাইবার আদেশ জ্ঞাপন করিল। অন্নাদি উপরে গেল—পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিও গেলাম। দেখিলাম, ঝড় বৃষ্টি কাটিয়া গিয়াছে—দিগ্‌দিগন্ত প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে। খুড়িমার মুখে হাসি—কাকার মুখে হাসি; আমি তখন পায়ে বল করিয়া দাঁড়াইলাম।

আহারান্তে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রোধের কারণ অবগত হইলাম। ভৃত্য স্নান করাইতেছিল; জলের কলসী কেমন গোলমাল হইয়া গিয়াছিল। যে কলসীতে অত্যধিক উষ্ণ জল ছিল, সেই কলসীর জলটা ভৃত্য অনবধান প্রযুক্ত প্রভুর মাথায় ঢালিয়াছিল। উষ্ণ জল শিরোদেশে পড়িবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এবং পরিধানের বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঘটী কলসী আছড়াইয়া ফেলিলেন। ভৃত্য প্রহৃত হয়

নাই বটে, কিন্তু প্রস্তুত হইলে সে বোধ হয় অধিকতর দুঃখিত হইত না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এ ক্রোধ ক্ষণেকের জন্য। ক্ষণেকের জন্য মহাগর্জ্জন সহকারে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া, বিজলীবৎ স্থাবর জঙ্গম ঝলসিয়া দিয়া তখনই আবার নিবিয়া যাইত। কিন্তু প্রথম মুহূর্ত্ত ভয়ানক; তখন তাঁহার শিক্ষা, আত্মসংযম সব ভাসিয়া যাইত,—তিনি জ্ঞানশূন্য হইতেন।

শুনিয়াছি, প্রথম জীবনে নাকি ক্রোধটা এত প্রবল ছিল না। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি মালদহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কোন এক অনৈসর্গিক কারণে তাঁহার মাথা গরম হইয়া যায়। সেই অবধি ক্রোধটা নাকি বড় প্রবল হইয়া উঠে।

সামাজিক বঙ্কিমচন্দ্র।

কাঁটালপাড়ার সন্নিকটবর্ত্তী গরিফা-নিবাসী কোন ভদ্র-সন্তান বিদ্যাভ্যাস করিতে সমুদ্রপারে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে

দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। তৎকালে আমার পিতা ও খুল্লতাত সঞ্জীবচন্দ্র সমাজের নেতা। ভদ্রসন্তান আমার পিতার আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। পিতা আশ্রয় দিতে পরাঙ্মুখ হইয়া বলিলেন, "আমি স্বেচ্ছা সমাজের উপর অত্যাচার করিতে পারি না; তুমি তোমার জাতির কাছে যাও। যদি তোমার স্বজাতি তোমায় গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।"

অবশেষে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু জাতি বা সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাগত হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দয়া হইল। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা উপায় স্থির করিলেন। ভদ্রসন্তানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি একটা রবিবারে আমায় নিমন্ত্রণ কর, আমি তোমার বাড়ীতে গিয়া খাইয়া আসিব।"

ভদ্রসন্তান কৃতার্থ হইলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ-মত কার্য্য করিতে তৎপর হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবিবার দিবস বেলা নয়টার সময় শিয়ালদহে ট্রেনে উঠিলেন এবং দশটা সাড়ে দশটার সময় নৈহাটীতে নামিয়া

ঘোড়ার গাড়ী করিয়া নিমন্ত্রণকারীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কাঁটালপাড়ার কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, অথবা তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিল না।

কথিত ভদ্রলোকের গৃহে অন্নাহার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অপরাহ্নে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র দুই একটা কথার পর সহাস্যে বলিলেন, "দাদা, একটা কাজ করেছি।"

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করেছ?"

বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যের সুর আরও চড়াইয়া বলিলেন, "রায়েদের বাড়ী খেয়ে এসেছি।"

পিতা স্তম্ভিত হইলেন। রায় মহাশয় অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। সময় বুঝিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। তখন পিতা আর কি বলিবেন? ভদ্রসন্তান অচিরে সমাজে স্থান পাইলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল কিছু না লইয়া ছাড়েন নাই। কবেই বা ছাড়েন? অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধে—আগমন বা নির্গমনে তাঁহাদের সমান আনন্দ। তবে শ্রাদ্ধে কিছু বেশী, কেননা তখন বিদায় দিয়া 'বিদায়' গ্রহণ করেন।

ভদ্রসন্তান সমাজে স্থান পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট
িরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন। এবং বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে
ংসারে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজি
াপ্তাহিক, তাঁহার তারকেশ্বর রেলপথ আজও তাঁহার
বদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

বিবিধ।

কর্ত্তব্যজ্ঞান।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন, তখন কোন
ত্রিকা-সম্পাদক ভিক্ষার্থে কলিকাতা হইতে তথায়
পস্থিত হইয়াছিলেন। চাঁদা কি জন্য, তাহা আমি
ানি না। সম্পাদক মহাশয় চাঁদা সংগ্রহে বড় একটা
চকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রকে
রলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রাণী স্বর্ণময়ীকে অনুরোধ করি-
ন। রাণী তদ্দণ্ডে চারি শত টাকা প্রদান করিলেন।
াাদক মহাশয় চারি শত টাকা লইয়া গৃহে প্রস্থান
রলেন।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ধারণা জন্মিল যে, এই টাকা উচিত কার্য্যে ব্যয়িত হয় নাই। তিনি বড় ক্ষুব্ধ হইলেন; কেন না, তাঁহারই চেষ্টায় এ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি এই চারি শত টাকা দাতাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। সম্পাদক উদ্গীরণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে কড়া কড়া কথা চলিতে লাগিল। অবশেষে উভয়ের মধ্যে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।

সম্পাদক মহাশয় তখন বেশ এক হাত লইলেন। তাঁহার হাতে কাগজ ছিল। তিনি সেই পত্রিকা-স্তম্ভে খুব জোর কলমে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিলেন। কাগজখানি সে সময় বাঙ্গালায় লিখিত হইত। বাঙ্গালা ভাষায়, বাঙ্গালীর গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র অনেক গালি খাইলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সুধু 'রজনী'তে হীরালালকে আনিয়া সম্পাদক চরিত্র অঙ্কিত করিলেন।

বক্তৃতা-শক্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র সুবক্তা ছিলেন না। সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা তাঁহার এককালে ছিল না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার এ অভাব—এ শক্তিহীনতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তাই বড় একটা সভা সমিতিতে যোগ· দান করিতেন না। তিনি সময়ে সময়ে আমাদের সহিত অসংলগ্ন ভাবে বাক্যালাপ করিতেন। আমাদের মনে হইত, তিনি যেন একটা কথা কহিতেছেন, আর একটা কথা ভাবিতেছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমার ভাবার্থ সকলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অনেকেরই সম্ভবতঃ স্মরণ আছে যে, বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে গভর্মেণ্ট একবার মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। শুনিয়াছিলাম, বঙ্গবাসী যাহা লিখিয়াছিল, তাহা ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার ভার বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অর্পিত হয়। জানি না কি কারণে, গভর্মেণ্ট পক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাক্ষী মান্য করা হয়। সাক্ষ্য দিতে হবে শুনিয়া তিনি সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন, এবং টিটাগড়ে গিয়া জজ নরিস্‌কে ধরিলেন।

নরিস্ সাহেব দুর্দান্ত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। বুঝি এতটা তিনি অন্য কোন বাঙ্গালীকে করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য শুনিয়া নরিস্ সাহেব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাক্ষ্য দিতে তুমি ভয় পাইতেছ কেন?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমি হাইকোর্টে কখন সাক্ষ্য দিই নাই—জেরা আমার সহ্য হয় না—আমার ক্রোধ সহজে উদ্দীপ্ত হয়—আমায় নিষ্কৃতি দান করুন।"

নরিস সাহেব বলিলেন, "বঙ্কিম বাবু, তুমি স্থির জানিবে, আমি তোমায় নিষ্কৃতি দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

সাহেব নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সে সংবাদ তখনও অবগত ছিলেন না। সংবাদটা আনিবার জন্য আমায় সবিশেষ উপদেশ দেন। উপদেশ দিবার সময় তিনি কিরূপ অসংলগ্ন ভাবে আমার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। একবার বলিলেন, "যোগিন বোসকে বল, নরিস সাহেবকে ডেকে দিতে।" পরক্ষণে হয়ত বুঝিলেন,

কথাটা আমায় গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই। সংশোধন করিয়া বলিলেন, "নরিস সাহেবকে বলগে যোগীন বোসকে ছেড়ে দিতে।" তিনবার এইরূপ অসংলগ্ন ভাবে বলিবার পর তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি আমায় কথাটা গুছাইয়া বলিলেন। এইরূপ অনেক বার তাঁহাকে অসম্বদ্ধ ভাবে কথা কহিতে দেখিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়া কখন তাঁহার প্রতিভার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি যখন তর্কের আসরে অবতীর্ণ হইতেন, তখন তাঁহার বিভিন্ন রূপ। তাঁহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় আরও উজ্জ্বল হইত—হস্ত পদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সময় সময় ঈষৎ কম্পিত হইত—একটা প্রতিভার ছটা সমস্ত মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইত। তখন আর নয়নের চাঞ্চল্য নাই—বাক্যাবলীর অসম্বদ্ধতা নাই—মনের অস্থিরতা নাই। তখন মনে হইত, একটি পঞ্চমবর্ষীয় শিশু সহসা প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। স্বর্গীয় দামোদর বাবুর সহিত এরূপ তর্ক-যুদ্ধে রত হইতে তিন চারি দিন দেখিয়াছি। একদিনকার কথা আমার বেশ স্মরণ হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্র সান্‌কিভাঙ্গার বাটীতে। রাত্রি নয়টার

সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সমাপ্ত হইতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইয়া যায়। সমাপ্ত হইয়াছিল কি না জানি না; আমি তখন তাঁহাদের পদতলে নিদ্রিত। য়ুরোপের সাহিত্যরাশি মন্থন করিয়া সে দিন যে তর্ক-যুদ্ধ উঠিয়াছিল, তাহাতে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিদ্রাকর্ষণ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? হুগো, ব্যালজ্যাক্, গেতে, দস্তে, চসার প্রভৃতির নাম হইলে আজও আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও থিয়েটার।

থিয়েটারের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের চিরদিন অনুরাগ ছিল। তাঁহার প্রথম বয়সে কলিকাতায় ও নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে থিয়েটার ছিল না। ইংরাজদের একটা থিয়েটার ছিল, তাহার নাম sans-soci—সে আজ প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের কথা। বড় বড় ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট, অধ্যাপক, সম্পাদক প্রভৃতি সেই থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাপ্তেন রিচার্ডসন একজন বিচক্ষণ অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার দেখাদেখি ছাত্র

সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নাটকাভিনয়ের বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সুধু ছাত্রদের হৃদয়ে কেন, বাঙ্গালার তাবৎ শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের হৃদয়ে নাটক অভিনয় করিবার বাসনা জাগিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালার এমনই দুর্ভাগ্য যে, সে সময় অভিনয়োপযোগী একখানি নাটকও বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান ছিল না। কলিকাতা বাগ্‌বাজারের বাবু নবীনচন্দ্র বসু বিপুল অর্থ ব্যয়ে তাঁহার গৃহে একবার নাটকাভিনয় করাইলেন। কিন্তু নাটকখানি বিদ্যাসুন্দর; অতএব তাহার আর পুনরভিনয় হইল না। অবশেষে নাটকের অভাবে বাঙ্গালীদের ইংরাজি নাটক অভিনয় করিতে হইল। এতই আমাদের দুর্ভাগ্য যে, উইলসন সাহেব উত্তররামচরিত ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া দিলেন, তবে আমরা তাহা অভিনয় করিলাম। ভেজাল টিকিল না,—শিক্ষিত সমাজ দেশীয় নাটকের অভিনয়-আশা বিসর্জ্জন দিয়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে এক ইংরাজি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেক্ষপিয়রের নাটকাদি তথায় অভিনীত হইতে লাগিল। যাঁহারা দেশের জন্য চিরকাল কাঁদিয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে একতম মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর "কুলীন-

কুল-সর্ব্বস্ব” নাটকখানি উক্ত থিয়েটার মঞ্চে অভিনয় করাইলেন। কিন্তু সে উদ্যম সফল হয় নাই। এক-দিকে সেক্ষপিয়রের মার্চেণ্ট অফ ভিনিস্, অপর দিকে রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব। সুতরাং বঙ্গ সমাজ দেশীয় নাটক ছাড়িয়া ইংরাজি নাটকের দিকে ঝুঁকিলেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহে জুলিয়স্ সিজর, হ্যামলেট অভিনীত হইতে লাগিল। কিন্তু বিদেশী জিনিষ বেশী দিন বাঙ্গালীর ভাল লাগিল না। আশুতোষ দেবের বাটীতে ‘শকুন্তলা’ অভিনীত হইল। কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে ‘বেণীসংহার’ ও ‘বিক্রমোর্ব্বশী’ অভিনীত হইল। কিন্তু তাহাতে কাহারও তৃপ্তি হইল না; কেন না, সেগুলি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ মাত্র। অবশেষে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ উদ্‌যোগী হইয়া একখানি নাটক প্রণয়ন করাইলেন। প্রণয়ন করিলেন, রামনারায়ণ তর্করত্ন। শ্রীহর্ষ দেবের ‘রত্নাবলী’ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। বিপুল অর্থব্যয়ে বেলগাছিয়ার উদ্যান বাটীতে নাটকখানি অভিনীত হইল। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরে

যত্নে ইংরাজী রীতির অনুকরণে একতান বাদন সম্প্রদায় গঠিত হইল। লাট, বেলাট, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজা, মহারাজ প্রভৃতি গণ্যমান্য অনেকেই থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। এরূপ অনুষ্ঠান, এরূপ বিপুল আয়োজন নাটকাভিনয়ের জন্য, বাঙ্গালা দেশে আর কখন হয় নাই।

এই অভিনয়ানুরাগ সুধু কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ার মণ্ডল-বাবুদের গৃহে একবার অভিনয় হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে যোগদান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যোগদান করেন নাই, সুধু দর্শক ছিলেন। তারপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বেলগাছিয়ার উদ্যান-বাটীতে যখন অভিনয় হয়, তখনও বঙ্কিমচন্দ্র দর্শক মাত্র ছিলেন। অভিনয় হয় জুলাই মাসে, বঙ্কিমচন্দ্র কর্ম্মে নিযুক্ত হ'ন আগষ্ট মাসে।

নাটকাভিনয়ে যোগদান না করিলেও অভিনয়ানুরাগ বঙ্কিমচন্দ্রের চিরদিন ছিল। চুঁচুড়ায় একবার "লীলাবতী" অভিনীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় বহরমপুরে। ইচ্ছা সত্বেও অভিনয়ের দিন চুঁচুড়ায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুদূর বহরমপুরে বসিয়া তিনি ও

অক্ষয় বাবু নাটকখানি কাটিয়া ছাঁটিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন।

বেঙ্গল থিয়েটার সম্প্রদায় কয়েকবার কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে অভিনয় করিয়াছিলেন। থিয়েটার-কর্ত্তৃপক্ষ চিরদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্মান করিতেন, কখন অর্থের দাবী করিতেন না, বঙ্কিমচন্দ্র অর্থ প্রদান করিলেও গ্রহণ করিতেন না।

বেঙ্গল থিয়েটার সম্প্রদায়ের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের এতাদৃশ আধিপত্য দেখিয়া একবার তাঁহার একটী প্রিয় বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রকে একটী অন্যায় অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই বন্ধুটী আজও জীবিত আছেন, এবং নাম, যশঃ ও উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বাসনা যে, থিয়েটার সম্প্রদায় পয়সা না লইয়া তাঁহার গৃহে কোন ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে অভিনয় করেন। বঙ্কিমচন্দ্র অনুরোধ করিলে সম্প্রদায় অর্থ গ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরেন, কিন্তু তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু হইয়াও বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনিতে পারেন নাই; প্রস্তাবটি শুনিবা-মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। বঙ্কিম-

চন্দ্র শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আর বাক্যালাপ করেন নাই।

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র একবার একটী অপেরা সম্প্রদায় সংগঠন করেন। তাহাতে আত্মীয় স্বজন ছাড়া বড় একটা অপর কাহাকে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সম্প্রদায় গঠিত হইতে না হইতেই জলবুদ্বুদের ন্যায় অকালে অনন্তগর্ভে মিলাইয়া গিয়াছিল।

প্রৌঢ় ও শেষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে 'বেঙ্গল' প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে যাইতেন। কিন্তু অভিনয়ের সামান্য ত্রুটি হইলেই তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। একবার 'মৃণালিনী' অভিনয় কালে একটা গানের সুর তাঁহার মনোমত হয় নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিয়াছিলেন। একদা আনন্দমঠের অভিনয় হইতেছিল, শান্তির অভিনয় তাঁহার ভাল লাগে নাই, তিনি বিরক্তিসহকারে রঙ্গ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর একবার 'দেবী চৌধুরাণী'র অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার পুস্তকখানা মাটী করিয়াছে।" ইদানীং থিয়েটারের উপর তিনি বড়ই চটিয়াছিলেন। একদা শ্রীশ চন্দ্র মজুমদারের নিকট থিয়েটারের নানারূপ

অখ্যাতি করিয়া বলিয়াছিলেন, থিয়েটারগুলা অধঃপাতে গিয়াছে।

যাত্রা দেখিতে তিনি ভালবাসিতেন না; কিন্তু যাত্রার গান শুনিতে তাঁহার বড় আগ্রহ ছিল। শিশুপালকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে আসরের মধ্যে বসিয়া কলিকা টানিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অথবা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হইতেছে, এমন সময় দ্রৌপদী যে বেহালার সঙ্গে সুর মিলাইয়া তড়াক্ তড়াক্ করিয়া নাচিতে থাকিবে, ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি আসরে বড় একটা বসিতেন না—দূরে বৈঠকখানায় বসিয়া গান শুনিতেন। একবার রথযাত্রার সময় তাঁহার একটী পশ্চিমপ্রদেশ-বাসী বন্ধু আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন। সে দিন গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হয়। আসর সাজান হইতেছে দেখিয়া বন্ধুটী বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা দেশে আর কি গান শুনিব? এদেশের লোক গাহিতে জানে না।" বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কীর্ত্তন শুনিয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন, "না, তবে ভজন শুনিয়াছি।" বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "তবে একটু অপেক্ষা করুন।"

তারপর যখন গোবিন্দ অধিকারী প্রেমার্দ্র কণ্ঠে গদগদ লোচনে শ্রীরাধার মান-ভঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গান ধরিলেন, 'প্রিয়ে চারুশীলে ! মুঞ্চময়ি মানমনিদানং' তখন বন্ধুবর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "এমন সঙ্গীত আমি কখন শুনি নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। এ অনুরাগ তাঁহার পিতারও ছিল। রথযাত্রা উপলক্ষে আট দিন যাত্রা হইত। আট দিনের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা চারি দিন, মতিরায়ের দুই দিন ও অপরাপরের জন্য বাকী দুই দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

তামাক ও চা।

বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইটী জিনিষেরই সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। চা অত্যধিক উষ্ণ না হইলে পান করিতেন না। আবার চায়ের পরিমাণও বড় কম ছিল না,—প্রত্যেক বারে বড় বড় দুই বাটী। তামাকের ত কথাই নাই— মুহুর্ম্মুহু তাওয়া চলিত। তবে কাছারীতে যে কয় ঘণ্টা থাকিতেন, সে কয় ঘণ্টা এক কালে তামাক খাইতেন

না। লিখিতে বসিলে—তা' প্রাতে হউক বা রাত্রে হউক,—তামাক অবিরাম চলিত।

বিষয়টি ক্ষুদ্র,আলোচনার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র চা বা তামাক খাইতেন কি না, তাহা জানিবার জন্য, লোকে ব্যাকুল নহে—জানিয়াও লোকের কোন উপকার নাই। উপকার না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা বুঝিয়া দেখিবার বিষয়, কেন প্রতিভাসম্পন্ন লেখকেরা একটা না একটা নেশায় আসক্ত হইয়া পড়েন। বাঙ্গালা কবিদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া কয়েকজন বিদেশী কবিদিগের কথা বলিব।

মহাযশস্বী ফরাসী ঔপন্যাসিক Balzac সাতিশয় কফি-প্রিয় ছিলেন। কফি না খাইয়া তিনি লিখিতে পারিতেন না। নাট্যকার Donizatti বড় বেশী মাত্রায় কফি পান করিতেন। De Quincey আফিম ও চায়ের অনুরাগী ছিলেন; তিনি দিবারাত্র ঘন ঘন চা পান করিতেন। Maeterlink তামাকের ও De Maupasant ইথরের অনুরাগী ছিলেন। Carlyle ও Tennyson তামাক ও মদ উভয়ই খাইতেন, তবে মদের চেয়ে তামাকটা বেশী। Shakespeare ও Burns

উভয়েই মদ খাইতেন। Coleridge আফিম-ভক্ত ছিলেন। Earnest Dowson মদ ছাড়া অন্যান্য অনেক নেসা করিতেন। Byron ঘোরতর মদ্যপ ছিলেন। Hall Baine, Mark Twain তামাকের বেশী উঠেন নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, Ruskin কোনরূপ নেসা করিতেন না; আরও কয়েক জন রস্কিনের মত থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বড় কম। বাঙ্গালা দেশে কার্লাইল টেনিসনের সংখ্যাই বেশী—রাস্কিনের সংখ্যা কম। বুঝিতে পারা যায় না, কেন মহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মাদক দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেহকে অনর্থক নিপীড়িত করেন। মাদক দ্রব্য কি লেখনীর সাহায্য-করী? কয়েকজন যশস্বী বাঙ্গালী লেখকের নাম অনায়াসে বলিতে পারা যায় যাঁহারা লেখনী ধারণ করিবার পূর্ব্বে মাদক দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এমনও দুই এক জন ছিলেন, যাঁহারা মাদকদ্রব্য সেবন না করিয়া লিখিতে পারিতেন না। কেন পারিতেন না, তাহা জানি না। বোধ হয় মাদক দ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত সুপ্ত শক্তি জাগরিত হয় না—একাগ্রতা তন্ময়ত্ব আসে না। যাহা হউক, এটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

আমার ভ্রাতা পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্রের নিকট নিম্নলিখিত দুইটী গল্প শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে একদিন তাঁহার কোন প্রিয় বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে পটলডাঙ্গার বাটীতে আসিয়াছিলেন। সাক্ষাৎটা বোধ হয় দীর্ঘকাল পরে ঘটিয়াছিল। বন্ধুবর আসিয়া "Good morning" করিলেন এবং Shakehand করিবার অভিপ্রায়ে হাত বাড়াইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে উদ্যত হস্ত গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, "ভাই, সে দিন আর নাই।" মিত্র মহাশয় বলিলেন, "No! it seems times have changed"—বঙ্কিমচন্দ্র ঈষদ্ধাস্যের সহিত কহিলেন, "তুমি কায়স্থ, আমি ব্রাহ্মণ; তুমি প্রণাম করিবে, আমি আশীর্ব্বাদ করিব—আর shakehand কেন?"

—•—

দ্বিতীয় গল্পটী যৌবনের। সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা। জ্যোতিশ বাবু তখন পাঠদ্দশায়। এক দিন শিক্ষক তাঁহাকে জ্যামিতি পড়াইতে ছিলেন। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিক্ষকের গোল বাধিয়া গেল। সে

পড়াইবে কি, নিজেই আত্মবিস্মৃত হইল। তখন বঙ্কিম-চন্দ্র চটিজুতা খুলিয়া শয্যার উপর বসিলেন, এবং পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্য শেষ করিয়া অচিরে উঠিলেন। জুতা পরিতে গিয়া দেখেন, নিকটে একটা বোল্‌তা মাটির উপর বসিয়া রহিয়াছে। তিনি দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া ক্ষুদ্র বোল্‌তাটীকে পদতলে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। একবার আঘাত করেন, পর মুহূর্ত্তে পা উঠাইয়া দেখেন। যখন দেখিলেন, তাহার প্রাণত দূরের কথা—মেদমজ্জার চিহ্ন মাত্রও বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি তাহার মুখের বর্ণের উল্লেখ করিয়া কত কি বলিতে থাকেন। সে সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিতে আমার ইচ্ছা নাই।

সমুদ্র-যাত্রা।

সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কয়েকটি প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি তদুত্তরে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"অশেষ গুণ-সম্পন্ন শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব

আশীর্ব্বাদ ভাজনেষু।

"আপনি আমাকে যে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম। আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী নহি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার আসন গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। তবে সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আমার আপত্তি নাই।

প্রথমতঃ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম, এবং এখনও পর্য্যন্ত সে মত পরিবর্ত্তন করার কোন কারণ আমি দেখি নাই। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম এই যে, বাঙ্গালি-সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে—দেশাচার বা লোকাচার বশীভূত সত্য। সত্য বটে যে, লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী; কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেইখানে লোকাচারই প্রবল।

"উপরি-উক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সর্ব্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কি না সন্দেহ। আপনারা সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া সমাজকে তদনুসারে চলিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতে-ছেন, কিন্তু সকল বিষয়ই কি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানু-সারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্ম্মশাস্ত্রের একটা বিধি এই, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। বাঙ্গালার শূদ্রেরা কি সেই, ধর্ম্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে সাহসী হয়েন কি? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবস্থা চালান যায় কি? হাইকোর্টের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের গৌরবার্থ লুচি-ভাজা ব্রাহ্মণের পদসেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালি-সমাজ প্রয়োজন মতে ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ মানে; প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেক কাল বিসর্জ্জন দিয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে অবশিষ্টাংশ বিসর্জ্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল? আমার

নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious and moral Regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্ত্তন করা যায় না।

আমার প্রণীত কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে ইহা আমি সবিস্তারে বুঝাইয়াছি। আমি উপরে বলিয়াছি যে, সমাজ দেশাচারের অধীন ; শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্তন জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি, ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, সমুদ্র-যাত্রায় সমাজের কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না ; কাহারও আপত্তি থাকিলেও সে আপত্তির কোন বল থাকিবে না। কিন্তু যত দিন না সেই উন্নতির উপযুক্ত মাত্রা পরিপূর্ণ হয়, ততদিন কেহই সমুদ্র যাত্রা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিতে পারিবেন না। তবে ইহাই বক্তব্য যে, সমুদ্রযাত্রার পক্ষে বাঙ্গালি-সমাজ বর্ত্তমান সময়ে কতদূর বিরোধী, তাহা এখনও আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই। দেখিতে পাই

যে, যাঁহার অর্থ ও অবস্থা সমুদ্রযাত্রার অনুকূল, তিনিই ইচ্ছা করিলে ইউরোপে যাইতেছেন। সমুদ্র-যাত্রা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ যে যান নাই, ইহা আমার দৃষ্টি-গোচরে কখনও আসে নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, যাঁহারা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক প্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কি আমাদের সমাজের দোষে তাহা ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এ দেশে আসিয়া সাহেব সাজিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঙ্গালি-সমাজের বাহিরে অবস্থিতি করেন। বিদেশীয় ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগকে পৃথক রাখেন। যাঁহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া সেরূপ আচরণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্দুসমাজে পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দু সমাজ সম্মত ব্যবহার করিলে তাঁহারা পরিত্যক্ত হইবেন, এ কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

"পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্র-যাত্রা হিন্দু-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার করিবার

আগে দেখিতে হয় যে, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত কি না। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য্য ? অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত তাহাই ধর্ম্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম, এ কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এইরূপ আছে ;—

ধারণাধর্ম্ম নিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মোধারয়তি প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

"ধর্ম্মলোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) করেন, এই জন্য ধর্ম্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম্ম নিশ্চিত জানিবে।

"যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর তাহা ধর্ম্ম। এই সমুদ্র-যাত্রা পদ্ধতি লোকহিতকর কি না যদি লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও কেন পরিত্যাগ করিব ?

"আমি এইরূপ বুঝি, ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম নহে;—হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির হাতে—ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্ঠা নহেন, হিন্দুধর্ম্ম সনাতন—তাঁহাদিগের পূর্ব্ব হইতেই আছে, অতএব সনাতন ধর্ম্মে এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্র-যাত্রা লোক-হিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্র যাত্রা হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত।

কলিকাতা,
২১ জুলাই, ১৮৯২

আপনার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

সম্প্রতি কালীঘাটে ব্রাহ্মণ সমাজের এক মহা বৈঠক বসিয়াছিল। এই সভায় সমুদ্র-যাত্রা লইয়া অনেক

বাক্ বিতণ্ডা হইয়াছিল। সভার মত, সমুদ্র যাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে। সভা ইচ্ছামত মতামত প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু কয়জন তাহা মানিয়া চলিবে? শিক্ষিত সমাজ সমুদ্র যাত্রার পক্ষপাতী। ব্রাহ্মণ-সমাজ এই স্রোতের বিরুদ্ধে বুক দিয়া দাঁড়াইলে নিজেই ভাসিয়া যাইবেন, স্রোতের গতি ফিরাইতে পারিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি উপরি-উক্ত মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ-সমাজের অভিপ্রায়াদি লইয়া চারিদিকে এত আন্দোলন চলিয়াছে যে,এতদ্বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

অবরোধ-প্রথা।

অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য প্রবন্ধে কিছু বলিয়া গিয়াছেন। আমি তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম :—

“স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখা অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য, অধর্ম্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গ মর্ত্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু

ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে। কেন? হুকুম পুরুষের।

"এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ অমর্য্যাদার ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চর্ম্মচক্ষে দেখিবে! কি অপমান! কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? কিছু লজ্জা নাই? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া আমি লজ্জায় মরি।

"জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার কি অধিকার? তাহারা কি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তোমারই তৈজসপত্রাদি মধ্যে গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল? তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছু নহে?" * * *

যে জাতির পুরুষেরা আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, সে জাতি সত্যই কি স্ত্রীকন্যার হাত ধরিয়া গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে যাইতে পারে? বাঙ্গালা যখন স্বাধীন ছিল, তখন বাঙ্গালায় অবরোধ-প্রথা ছিল না। যে দিন মুসলমান বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল, সে দিন বাধ্য হইয়া হিন্দুললনারা গৃহমধ্যে লুকাইল। সাত শত বর্ষ পূর্ব্বে যে কারণ বর্ত্তমান ছিল, আজ কি সে কারণ অন্তর্হিত হইয়াছে?

সাম্য।

—০—

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনে 'সাম্য' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি তা'র পর এক-বারমাত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া যে অবশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছি[ল] তাহা আমার মনে হয় না। প্রবন্ধের ভাষা, ভা[ব] লিপিচাতুর্য্য অতি সুন্দর। আমার বিশ্বাস, বঙ্কিমচ[ন্দ্র] পরিণত বয়সে বুঝিয়াছিলেন যে, এরূপ প্রব[ন্ধ]

সমাজের ক্ষতি হইতে পারে। আমি কোনও কোনও স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সংসার বৈষম্যে পরিপূর্ণ। রাম এ দেশে না জন্মিয়া ও দেশে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল; রাম পাঁচির গর্ভে না জন্মিয়া জাদীর গর্ভে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল। তোমার অপেক্ষা আমি কথায় পটু, বা আমার শক্তি অধিক, বা আমি বঞ্চনায় দক্ষ,—এ সকলই সামাজিক বৈষম্যের কারণ।

"রাম বড় লোক, যদু ছোটলোক কিসে? যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া, ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্য বঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন; ধনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড় লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—

সুতরাং সে ছোট লোক। অথবা রাম কোন বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্প বৃষ্টি কর।

"বৈষম্য সাংসারিক নিয়ম। জগতে সকল পদার্থেই বৈষম্য। ব্রাহ্মণ শূদ্রে অপ্রাকৃত বৈষম্য। ব্রাহ্মণ-বধে গুরু পাপ, শূদ্র-বধে লঘু পাপ, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুকৃত নহে। ব্রাহ্মণ অবধ্য, শূদ্র বধ্য কেন? শূদ্রই দাতা, ব্রাহ্মণই কেবল গৃহীতা কেন? তৎপরিবর্তে যাহার দিবার শক্তি আছে সেই দাতা, যাহার প্রয়োজন সেই গৃহীতা, এ বিধি হয় নাই কেন?

"সর্ব্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই এক জন লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পায়েন না—কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে বিকট রোগগ্রস্ত হইতেছে।

"আমেরিকার চিরদাসত্বের উচ্ছেদ জন্য সে দিন ঘোরতর আভ্যন্তরিক সমর হইয়া গেল—অস্ত্রাঘাতে ক্ষতচিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের দ্বারা সামাজিক ইষ্ট সাধন করিতে হইল, এই চিকিৎসার বড় ডাক্তার দাঁতো এবং রোবস্পীয়র। বৈষম্যের পরিবর্তে

সাম্যসংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস্ বিপ্লবের উদ্দেশ্য।

"কিন্তু সর্ব্বত্র এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই উপদেষ্টার উপদেশেই সাম্য আদৃত এবং সংস্থাপিত হইয়াছে। অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর—সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপধায়িনী। খৃষ্ট ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম, বাক্যে প্রচারিত হয়—ইস্লামের ধর্ম্ম, শস্ত্র-সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে মুসলমান অল্পসংখ্যক—বৌদ্ধ ও খৃষ্টিয়ানই অধিক।

"পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকালান্তর তিন দেশে তিন জন মহাশুদ্ধাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম্ম, মনুষ্য সকলেই সমান। এই স্বর্গীয় মহাপবিত্র বাক্য ভূমণ্ডলে প্রচার করিয়া তাঁহারা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্যজাতি দুর্দ্দশাপন্ন, অবনতির পথারূঢ় হইয়াছে, তখনই এক মহাত্মা মহাশব্দে কহিয়াছেন, 'তোমরা সকলেই সমান—

পরস্পর সমান ব্যবহার কর।' তখনই দুর্দ্দশা ঘুচিয়া সুদশা হইয়াছে, অবনতি ঘুচিয়া উন্নতি হইয়াছে।

"প্রথম, শাক্য সিংহ বুদ্ধদেব। যখন বৈদিক ধর্ম্ম সঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, তখন ইনি জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণ-বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থানুসারে, বধ্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। ব্রাহ্মণে তোমার সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট করুক। তুমি ব্রাহ্মণের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর—কিন্তু শূদ্র অস্পৃশ্য, শূদ্রস্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য। জীবনের জীবন যে বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। * *

"এই গুরুতর বর্ণ-বৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। পশ্বাদিবৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভিন্ন পৃথিবীর এমন কোন একটি সুখ তুমি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারিবে না, যাহার মূল

জ্ঞানোন্নতি নহে। বর্ণ-বৈষম্যে জ্ঞানোন্নতির পথ রোধ হইল। শূদ্র জ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে, একমাত্র ব্রাহ্মণ তাহার অধিকারী। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতর বর্ণ। অতএব অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল।* *

"লোক বিষণ্ণ, ব্যস্ত, শঙ্কিত হইল। ব্রাহ্মণেরা লেখেন সকল কাজেই পাপ—সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কঠিন। তবে কি বিপ্রেতর বর্ণের পাপ হইতে মুক্তি নাই—পারত্রিক সুখ কি এতই দুর্লভ? লোক কোথায় যাইবে? কি করিবে? এ ধর্ম্মশাস্ত্র পীড়া হইতে কে উদ্ধার করিবে? সর্ব্বসুখ নিরোধকারী ব্রাহ্মণের হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? ভারতবাসীকে কে জীবন দান করিবে?

"তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকাল স্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া, দিগন্ত প্রধাবিত রবে বলিলেন, 'আমি এ উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগের উদ্ধারের বীজ মন্ত্র বলিয়া দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবেই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার

সদাচরণে। বর্ণ-বৈষম্য মিথ্যা, যাগ যজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা। কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্য ধর্ম্ম পালন কর।' * *

"দ্বিতীয় সাম্যাবতার যীশুখৃষ্ট। * * তিনি বলিয়াছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। সকল মনুষ্যই ঈশ্বর সমক্ষে তুল্য। বরং যে পীড়িত, দুঃখী, কাতর, সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়।" * *

তার পর যে স্বার্থত্যাগী নিষ্কাম মহাবীরের গুরুতর আঘাতে ফরাসী রাজ্য ও রাজ্যশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই মহাপুরুষ রুসোকে তৃতীয় সাম্যাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রুসোর সাম্যনীতির আমি আর কোনও উল্লেখ করিলাম না। যাঁহার Le contract Social গ্রন্থ পড়িয়া ফরাসীগণ ক্ষিপ্ত হইয়া রাজাকে মারিতে খড়্গ উঠাইয়াছিল, তাঁহার বা তাঁহার গ্রন্থোল্লিখিত সাম্য-নীতির কোনও পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি না।

বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, সকল বিষয়ে কি সাম্যনীতি অবলম্বিত হইতে পারে?

ঈশ্বরেরও কি তাহাই অভিপ্রেত? আমার বিবেচনায় নয়। বিপর্য্যয় না ঘটিলে অবতার হইতে পারে না—প্রজা না থাকিলে রাজা হইতে পারে না—দুঃখ না থাকিলে সুখ থাকিতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্রও বোধ হয় শেষ জীবনে তাঁহার ভ্রম বুঝিয়া থাকিবেন। তাই তিনি শ্রীশ বাবুকে বলিয়াছিলেন, "সাম্যটা সব ভুল; খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।" *

বহুবিবাহ।

—:*:—

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয়। তারানাথ তর্ক বাচস্পতি প্রমুখ কয়েক জন পণ্ডিত বলিলেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর

* বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা।

মহাশয়ের পুস্তিকা সমালোচনা-কালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—*

"বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, 'বহুবিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।' * * *

"এই বাঙ্গালায় এক কোটী আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠারশত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে এক জনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও দিন দিন কমিতেছে, স্বতই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা

* সাধনা—১৩০১।

করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে।

"কিন্তু এই বহুবিবাহরূপ রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু হইলেও বধ্য। আমরা দেখিয়াছি, এক এক জন বীরপুরুষ, মৃতসর্প বা মৃত কুক্কুর দেখিলেই তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যান, কি জানি যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইঁহারা বড় সাবধান ও পরোপকারী। যিনি এই মুমূর্ষু রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

"যে কয়েকটি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

২। বহুবিবাহ এদেশে স্বতই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তথাপি ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ, আইনের আবশ্যকতা আছে ইহা স্থির হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।"

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা গুলি বলিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা দেখিতেছি, বহুবিবাহ স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিয়াছে, কচিৎ কখন শুনিতে পাই, কোনও কুলীন ব্রাহ্মণ পাঁচ সাতটি বিবাহ করিয়াছেন। তবে কেহ কেহ সখ্ করিয়া পুত্রার্থে অথবা রিপু-চরিতার্থে দুইটা বিবাহ করেন। কিন্তু সে দৃষ্টান্ত বিরল। আইন সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইল না—অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইল না, বহুবিবাহরূপ রাক্ষস বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত হইল। কিন্তু বহু দূর যায় নাই—যাইতে যাইতেও এক একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিতেছে।

স্ত্রী-শিক্ষা।

—:*:—

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়া গিয়াছেন *, নিম্নে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটীকে কথামালা সমাপ্ত করাইয়া চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম, এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেকমাত্রও মনে স্থান দেন না।

"বাস্তবিক বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখাপড়া শিখাইবার উপায় নাই। বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত।

* বঙ্গদর্শন—চতুর্থ খণ্ড।

"সেই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়—দ্বিতীয় পুরুষ-বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা।

"দ্বিতীয়টির নাম মাত্রে বঙ্গবাসিগণ জ্বলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহে মনে বিবেচনা করিবেন যে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাঙ্গনাবৎ আচরণ করিবে। মেয়েগুলাত অধঃপাতে যাইবেই; বেশীর ভাগ ছেলেগুলাও যথেচ্ছাচারী হইবে।

* * * *

"স্ত্রী-শিক্ষা বিধেয় কি না? বোধ হয় সকলেই বলিবেন—'বিধেয় বটে।'

"তার পর জিজ্ঞাসা কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে, চাকরীর জন্য। বোধ হয় এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন, যে স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা জ্ঞানোপার্জ্জন এবং বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখান উচিত।"

আমি যদি এক্ষণে স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে যাই, তাহা হইলে অনেকেই আমার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে দেশের

মেয়ের বিবাহকাল আট হইতে বার বৎসর, সে দেশের মেয়ে কখন্ বিদ্যাশিক্ষা করিবে? সে কি স্বামীর সঙ্গে বই বগলে করিয়া বিদ্যালয়ে যাইবে?—না, ছেলে কোলে করিয়া, অথবা বৃদ্ধা শাশুড়ীর ঘাড়ে, ছেলে ও সংসার ফেলিয়া কালেজে যাইবে?

আর এক কথা; আমাদের দেশের বালিকার এগার বৎসর বয়সে যে সব স্ত্রীলক্ষণ প্রকাশ পায়, শীতপ্রধান দেশের মেয়েদের আঠার বৎসর বয়সেও তা' প্রকাশ পায় না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মেয়েরা আঠার বৎসর পর্য্যন্ত, অথবা বিবাহকাল পর্য্যন্ত কালেজে যাইতে পারেন; কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা তা' পারে না। আগে আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হউক—বাল্য-বিবাহ রহিত হউক—শীতপ্রধান দেশের মেয়েদের ন্যায় স্ত্রীলক্ষণ অধিক বয়সে প্রকটিত হউক; তার পর আমরা মেয়েদের কালেজে পাঠাইব। যত দিন না তা' হয়, ততদিন আমাদের মেয়েরা যেমন শাশুড়ী ও স্বামীর নিকট রামায়ণ মহাভারত, অথবা নাটক নভেল পড়িয়া আসিতেছে, তেমনই পড়িতে থাকুক—এম, এ পাশে কাজ নাই।

বিধবা-বিবাহ।

—:*—

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায় :—

"বিধবা-বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভাল বাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোন বিধবা হিন্দুই হউন, অথবা যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃ পরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর

* বঙ্গদর্শন—চতুর্থখণ্ড—৩০৬ পৃষ্ঠা।

অবশ্য, ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, 'যদি' পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী; কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রী-বিয়োগান্তে দ্বিতীয়বার বিবাহ উচিত? উচিত, অনুচিত স্বতন্ত্র কথা, ইহাতে ঔচিত্যানৈচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নী-বিযুক্ত পতি এবং পতি-বিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃ পরিণয়ে উভয়ই অধিকারী বটে।

"অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে, কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন না। যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়। তবেই

এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্মক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণ বুঝা যায়, বিধানের কর্ত্তা পুরুষ জাতি সে সকলের প্রচলনে আপনাদিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াসসাধ্য নহে, কাহারও অনিষ্টকর নহে, এবং অনেকের সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়।

"আর একটি কথা আছে। অনেকে মনে করেন, যে চিরবৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দু স্ত্রীমাত্রেই জানেন যে, তাঁহার এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী, এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্যসুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চির-

পত্নীহীনতা বিধান করা না হয় কেন? তুমি মরিলে তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না। যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হও। এবং দাম্পত্য সুখ গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?

"তুমি বিধানকর্ত্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বৈষম্য।"

বৈষম্য ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনও যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। সমাজের ভয়ের কথা ইঙ্গিতে একটু বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও বলি, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও, সমাজ যতদিন না তাহার অনুমোদন করে ততদিন বিধবা-বিবাহ বাঙ্গালায় হিন্দুসমাজে চলিবে না।

বঙ্কিম-জীবনী।

ষষ্ঠ খণ্ড।

ধৰ্ম্ম।

ধর্ম্ম শিক্ষা।

—:*:—

শুনিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র শৈশবে 'রূপকথা' শুনিতে বড় ভাল বসিতেন। বৃদ্ধাদের নিকটে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একাগ্রমনে তাঁহাদের 'বিহঙ্গম বিহঙ্গমী'র গল্প শুনিতেন। বোধহয় 'দেবী চৌধুরাণী' লিখিবার কালে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে বাল্য-স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি ব্রহ্মঠাকুরাণীকে সৃষ্টি করিয়া তাহার মুখে আবার সেই পুরাতন গল্প শুনিলেন। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যখন লিখিতে পড়িতে শিখিলেন, তখন রূপকথা ছাড়িয়া রামায়ণ মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তবে সে সাধ কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাস বিরচিত গ্রন্থ হইতে মিটাইতে হইত। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতি পড়িয়া পুরমহিলাদিগকে শুনাইতেন এবং দুরূহ অংশ সাধ্যমত বুঝাইয়া দিতেন।

মেদিনীপুর ছাড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন ডিরোজিয়োর * শিক্ষাপ্রভাব

---

* হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলি-

দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছে। ডিরোজিয়ো একজন প্রতিভা-সম্পন্ন ও মহা শক্তিশালী শিক্ষক ছিলেন। তিনি যে সকল ছাত্র এবং শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালায় অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। রামতনু লাহিড়ী, রাম-গোপাল ঘোষ,কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার ছাত্র। কেহ শিক্ষকতায় Arnold of the East, কেহ বাগ্মীতায় Edmund Burke, কেহ ভাষাজ্ঞানে Friedrick Weber. ডিরোজিয়ো তাঁহার ছাত্রদিগের মনোবৃত্তি বিকশিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সেই শিক্ষার ফলে তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই মৌলিকতা ও স্বাধীন চিন্তা-শক্তি প্রভাবে দেশে নাম ও যশঃ কিনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু:ডিরোজিয়ো দেশের সর্ব্বনাশও করিয়া গিয়াছেন।

কাতায় জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ বৎসর বয়সে বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। মোক্ষমূলর ইঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "Derozio though branded by the clergy as an infidel and a devil of the Thomas Paine school, was worshipped by his pupils as the incarnation of goodness and kindness."

তাঁহার শিক্ষা প্রভাবে হিন্দুছাত্রেরা আত্মসংযম বিস্মৃত হইল—হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইল। তাঁহার শিক্ষায় হিন্দু-যুবকেরা অনাচারী ও নাস্তিক হইল। কেহ যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিলেন *, কেহবা, ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইলেন †। ডিরোজিয়ো হিন্দুকলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়া 'পার্থিনন' নামক একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিলেন; তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক প্রবন্ধ [illegible]খিত হইল। এই মহাশক্তিশালী ফিরিঙ্গি যুবক [illegible]চারকরূপে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহার [illegible]কাডেমির অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, [illegible]বাদপত্রের সাহায্যে দেশময় নাস্তিকতার কৃষ্ণাবরণ [illegible]স্তার করিতে লাগিলেন। হিন্দুযুবকেরা দূরদেশ হইতে [illegible]াগত হইয়া ডিরোজিয়োর একাডেমিতে যোগদান [illegible]রিল, অভিভাবকদের আদেশ উপেক্ষা করিয়া [illegible]রোজিয়োর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। [illegible]রোজিয়োর সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় বক্তৃতা

---

* রামতনু লাহিড়ি।

† কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুনিতে মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর ন্যায় দলে দলে যুবকেরা ছুটিল। দেশে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইল। অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষেরা একমত হইয়া ডিরোজিয়োর কাগজ বন্ধ করিয়া দিলেন। ডিরোজিয়োও তার কিছুকাল পরে দেহত্যাগ করিলেন।

ডিরোজিয়ো লোকান্তরিত হইলেও তাঁহার শিক্ষা-প্রভাব দেশ হইতে বিলুপ্ত হইল না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কালেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত, তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে অনাচার ও নাস্তিকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে এই অনাচার ও নাস্তিকতার বীজ উপ্ত হইল। কিন্তু তিনি প্রকাশ্য-ভাবে কিছুই করিতে পারিলেন না। গৃহে দেবোপম পিতা, দেবীপ্রতিমা মাতা, জাগ্রত দেবতা রাধাবল্লভ। ভট্টপল্লীর দেশ-প্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা নিয়ত আসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন; প্রসিদ্ধ কথকেরা মধ্যে মধ্যে ভাগবত পাঠ করিতেন। পূজার দালানে হোম, চণ্ডী-পাঠ শান্তি স্বস্ত্যয়ন; উঠানে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা; দুর্গোৎসব, রথ, রাস প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ; ক্ষুদ্র পল্লীর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, মন্দিরে মন্দিরে স্তোত্রপাঠ। বঙ্কিমচন্দ্র এতদ্‌সমূহের মধ্যে পড়িয়া হিন্দুধর্ম

ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ত্যাগ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তিনি অন্তরে অন্তরে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে ও যৌবনে মাতা-পিতাকেই উপাস্য দেবতা বলিয়া জানিতেন। তদ্ভিন্ন তিনি অন্য দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। বাল্যে মহাভারত রামায়ণ পাঠ করিতেন, যৌবনে তদ্‌সমূহ স্পর্শ করিতেন না। বাল্যের মনসার ভাসান, বেহুলার উপাখ্যান, যৌবনকালে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণযাত্রায়, যৌবন সমাগমে আর শ্রদ্ধা ছিল না, তখন থিয়েটার ভাল লাগিত। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে যৌবনের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি তখন ঘোরতর নাস্তিক ছিলাম।' কিন্তু যতদিন তিনি কালেজে পড়িতেন, ততদিন তিনি অনাচারী ছিলেন না। কালেজ ত্যাগ করিয়া যখন মাতাপিতার সান্নিধ্য হইতে দূরে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন, তখন তিনি ইচ্ছামত আহার বিহার আরম্ভ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তেইশ বৎসর বয়সে অনাচারী; ত্রিশ বৎসর বয়সে যখন কপালকুণ্ডলা লেখেন, তখন নাস্তিক। কিন্তু যখন গৃহে মাতাপিতার নিকট আসিতেন, তখন

তাঁহার চরিত্রে বা আচার ব্যবহারে কিছুই দুষণীয় লক্ষিত হইত না।

তারপর চল্লিশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের সূচনা হয়। সূচনার দুই তিন বৎসর পরে সহসা কোনও অনৈসর্গিক ঘটনা দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত হয়। সে কথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। এই প্রবাহের প্রথম তরঙ্গ, 'আনন্দ-মঠ'; দ্বিতীয় 'দেবী চৌধুরাণী'। বঙ্কিমচন্দ্র চোয়াল্লিশ বৎসর বয়স হইতে যে সকল উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আর নশ্বর প্রেমের ছড়াছড়ি নাই—ভগবৎ-প্রেম তখন লক্ষ্য। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র যখন ভগবৎ-প্রেমে আত্মহারা, তখন তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' লিখিলেন। উপন্যাস না লিখিয়া থাকিতে পারিলেন না, তাই 'জয়ন্তীর' সৃষ্টি করিলেন। 'জয়ন্তী'কে বুঝাইবার জন্য 'গীতা রাধে'র প্রয়োজন হইয়াছিল। যে শিক্ষা জয়ন্তী দিয়াছিল, সে শিক্ষা বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রহণ করিয়া তিনি কৌষিক বস্ত্র পরিধান করিতেন, নামাবলী গায়ে দিতেন, হবিষ্যান্ন ও ফল মূল ছাড়া অন্য কিছু আহার করিতেন না। কয়েকমাস এই ভাবে কাটাইয়া

যখন দেখিলেন, হবিষ্যান্ন কোন মতেই তাঁহার শরীরে সহ্য হইল না, তখন তিনি আবার পূর্ব্ববৎ আহার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মন তখন শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সমর্পিত, হৃদয় ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণ। গীতা পাঠ তখন তাঁহার নিত্যব্রত আর গীতার অমূল্য উপদেশ স্মরণপূর্ব্বক ভগবৎ-চরণে সমস্ত হৃদয়টুকু লুটাইয়া নিয়ত বলিতেন,—

'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।'

ধর্ম্মমত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মমত সাতিশয় উদার ছিল। খাদ্য-বিশেষে বা বিলাত-গমনে যে ধর্ম্ম যায়, তাহা স্বীকার করিতেন না। সে জন্য তাঁহাকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কখন পশ্চাৎপদ হন নাই। যাহা সত্য বলিয়া তাঁহার প্রতীত, তাহা প্রচার করিতে কখনও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন নির্ভীক হৃদয়ে লিখিলেন, যে ব্রাহ্মণ অধার্ম্মিক,

তাহাকে ছাড়িয়া বরং কেশবচন্দ্রের ন্যায় মহাত্মাকে ভক্তি করিবে, তখন সমগ্র হিন্দুসমাজ বিচলিত হইল। আবার যখন 'প্রচারে' লিখিলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা মাত্র এবং শশধর তর্কচূড়ামণি যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, আমাদের মতে তাহা কখনই টিকিবে না"— তখন হিন্দু সমাজ স্তম্ভিত হইল। তাঁহার সাহস অনন্ত, শক্তিও অনন্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই যে, "সমুদ্রযাত্রা ধর্ম্মানুমোদিত।" ধর্ম্ম লইয়া তাঁহাকে অনেকের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু কোনস্থলেও তিনি পরাস্ত হয়েন নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী যথার্থই লিখিয়াছেন, "বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের সহিতই হউক, বাবু রবীন্দ্রনাথের সহিতই হউক, বা মিঃ হেষ্টি সাহেবের সহিতই হউক, তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) প্রতিভার নিকটে তর্কে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তিনি অজেয়, তিনি অমর।"

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন; শুধু হিন্দু নন, তিনি হিন্দুধর্ম্মের নেতা ছিলেন। যখন তাঁহার ক্ষুদ্র তর্জ্জনী হেলনে বাঙ্গালার একপ্রান্ত হইতে

অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ে পরিচালিত হইত, তখনও তিনি হিন্দু সমাজের বক্ষে দাঁড়াইয়া নির্ভীক হৃদয়ে বলিয়া গিয়াছেন,—হিন্দুধর্ম্মে খাদ্যাদির নিষেধ নাই—হিন্দুধর্ম্মের মত সঙ্কীর্ণ নহে, অতি উদার। তবে তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, শারীরিক ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া প্রবৃত্তি অনুসারে আহার বিহার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত কেহ কেহ যে বিদ্রূপ করিতেন না, এমত নহে, তবে অধিকাংশ বাঙ্গালী তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন। দেবী বাবু লিখিয়াছেন, "যে দেশে কতশত রাম শ্যাম, জটা রাখিয়া গৈরিক পরিধান করিয়া, ভস্ম লেপিয়া অবতার বলিয়া আজকাল প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ কেহ বা সফলকামও হইতেছেন, সে দেশে, মহাপ্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করিলে একজন মহা-অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন। শিষ্য জুটাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য সংগ্রহ হইত। কিন্তু তিনি মহা শক্তিশালী হইয়াও আপন স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দল বাঁধেন নাই, অথচ তাঁহার অনুগত দল বঙ্গভূমিকে গ্রাস

করিয়াছে; তিনি নেতৃত্ব করেন নাই, অথচ সমগ্র সমাজ অলক্ষিত ভাবে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেছে। মহা মহা পাণ্ডিতেরা আজ তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিতেছে। কালে যখন এ প্রভাব আরো বদ্ধমূল এবং বিস্তৃত হইবে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্য প্রভায় এ দেশ আলোকিত হইবে, তাঁহার জন্মভূমি মহাতীর্থে পরিণত হইবে। তখন দলে দলে লোক গগন কাঁপাইয়া "বন্দে-মাতরং" মহাসঙ্গীত গাইবে, এবং মাতৃপূজার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের অমর ও অক্ষয় প্রতিভার পূজা প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্বদেশপ্রেম, নিষ্কামধর্ম্ম যখন বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করিবে, তখন ঘোরান্ধকারের মধ্যে 'প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র' উজ্জ্বল প্রভায় ফুটিয়া উঠিবেন। কতদিন পরে, কেহ তাহা জানে না। কিন্তু সে দিন নিশ্চয় আসিবে।" *

অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে দেবী বাবু যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু দেবী বাবুর ন্যায় সকলে বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার গ্রামের লোক তাঁহাকে চিনিতে

* নব্যভারত, ১৩০১, বৈশাখ।

পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর যখন বাঙ্গালাব্যাপী ক্রন্দনরোল উঠিল, তখন কাঁটালপাড়া-নিবাসী অনেকেই বলিয়াছিলেন, "আমরা এতকাল জানিতাম না, বঙ্কিম বাবু এত বড়লোক।" তা' না জানিবারই কথা,—দীপের নীচে চিরদিনই অন্ধকার। তা' ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে কাঁটালপাড়ায় বড় একটা আসিতেন না। যখন তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত, যখন তাঁহার হৃদয়ে অটুট কৃষ্ণ-ভক্তি, তখনও তিনি কাঁটালপাড়ায় বড় একটা আসিতেন না। দেড়শত বৎসর ধরিয়া যে বিগ্রহ কাঁটালপাড়ায় চট্টোপাধ্যায় বংশের উপাস্য দেবতা, যে বিগ্রহকে স্বপ্নে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনাচার ও নাস্তিকতা বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সে বিগ্রহ—সে রাধাবল্লভ-মূর্ত্তিকে দেখিতেও বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় আসিতেন না। রথের সময়ে দুই চারি দিনের জন্য আসিতেন; দুর্গোৎসবের সময়ও তাই। অন্য উৎসবের সময় আসিতেন না। রাধাবল্লভকে সম্মুখে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিস্তব্ধ, নীরব হইয়া দাঁড়াইতেন—সকল সময়ে প্রণাম করিতেন না। শুধু অনিমিষ নয়নে বিগ্রহ-পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিতেন। বিগ্রহ দেখিবার আকাঙ্ক্ষী

তিনি ছিলেন না,—কেন না, তাঁহার মানসপটে নিয়ত সে মূর্ত্তি জাগরিত। বিগ্রহ-চরণে প্রণাম করিবার জন্ম তিনি ব্যাকুল হইতেন না,—কেন না, যাঁহার চরণে নিরন্তর তাঁহার মনঃ প্রাণ লুটাইতেছে, তাঁহাকে আবার লোক দেখাইয়া প্রণাম করিবার প্রয়োজন কি ? আমি একবার বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম ; তথায় দামোদর বাবু উপস্থিত ছিলেন। উভয়কে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে উভয়ের মধ্যে একজন বলিলেন, 'যাঁহাকে অন্তরে অন্তরে নিয়ত প্রণাম করিতেছ, লোক দেখাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবার প্রয়োজন কি ?" অপর ব্যক্তি উত্তর করিয়াছিলেন, "প্রণামটা সামাজিক—অভ্যাস রাখাও প্রয়োজন।" কে কোন্ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণ নাই।

দুর্গোৎসবের সময় দেবি-প্রতীমার পদতলে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু সে প্রণামে বৈচিত্র্য বা বিশেষ ভক্তি দেখি নাই। সাধারণ লোকে যেমন মাথা ঠুকিত, তিনিও সেইরূপ ঠুকিতেন। একবার সন্ধি-পূজার সময় তাঁহার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, সে রূপ মূর্ত্তি আর কখন দেখি নাই। দালানের এক কোণে—প্রতিমা

হইতে দূরে, প্রাচীর অবলম্বন করিয়া একা নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ-নহে, দৃষ্টিও ঠিক প্রতিমা পানে নহে। দৃষ্টি যে কোন্ দিকে, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। তাঁহাকে তদবস্থায় যে দেখিয়াছিল, সেই বুঝিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তখন সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি অন্তরে—বাহিরে প্রকাশ পাইত না। লোকে যেমন উঠিতে বসিতে হাই তুলিতে 'হরি বল' 'হরি বল' করে, তিনি কখন সেরূপ করিতেন না। হরিনাম তিনি হৃদয়াভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতেন; তবে উচ্চকণ্ঠে গীতা পাঠ করিতেন। ভিক্ষুক করতালি বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে আসিলে বঙ্কিমচন্দ্র উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। কখন ললাট কুঞ্চিত হইত, কখন বা চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত হইয়া আসিত।

বঙ্কিমচন্দ্র কখনও অসত্য বলিতেন না—পরের অনিষ্টও করিতেন না। ইহাই তাঁহার মূল ধর্ম্মনীতি ছিল। তা' ছাড়া, তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান সাতিশয় প্রবল ছিল। পরের উপকার করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল না হইলেও তিনি যেখানে বুঝিতেন, উপকার

করা কর্ত্তব্য, সেখানে তিনি মুক্তহস্তে অগ্রসর হইতেন। এরূপে তিনি আত্মীয়স্বজন ও দুস্থ প্রতিবাসীদিগের অনেককেই সাহায্য করিয়াছেন। গৃহে ভিক্ষুক আসিলে ফিরাইতেন না বটে, কিন্তু একমুষ্টি তণ্ডুল দিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য সমাধা হইল, এরূপ বিবেচনা করিতেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা দিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। একটী ছোট কথায় তাহা বুঝাইব। আমাদের বংশের কেহ বাহিরের লোকের কাছে মন্ত্রগ্রহণ করেন না; বংশের মধ্যে কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন। এ প্রথা বহুকাল হইতে আমাদের বংশে চলিয়া আসিতেছে। তদনুসারে আমার কোনও খুল্লতাত ভ্রাতা, বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্র প্রদান করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নবদীক্ষিত শিষ্যকে একটী মাত্র উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি নিয়ত স্মরণ রাখিবে, তুমি ব্রাহ্মণ।"

কথাটি বড় ছোট নয়। এত অল্প কথায় এত বড় উপদেশ হইতে পারে, আমি পূর্ব্বে তা' জানিতাম না।

শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মভাব কতদূর উন্নত

হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে একটা ঘটনার অবতারণা করিব। মৃত্যুর তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একবার কঠিন পীড়া হয়। এই রোগের বৈচিত্র্য এই যে, জ্বর বা অন্য কোন উপসর্গ বর্ত্তমান ছিল না—দাঁত দিয়া শুধু রক্ত ছুটিত। একটু আধটু নয়, তিন ছটাক রক্তও কোন কোন দিন প ।
খুড়িমা মহা চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কোঙার আসিয়া ব্যবস্থা করিলেন। বিশেষ কোন ফল হইল না। খুড়িমা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন,— ডাক্তার চন্দ্রকে ডাকিয়া আনিতে আমাকে বলিলেন। কাকাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যাইতে সাহস হইল না। তাঁহার আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়াইলাম। তিনি খুড়িমার বিরস বদন প্রভৃতি নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন; পরে আমায় বলিলেন, "ডাকিয়া আন।" আমি ছুটিয়া মেডিকেল কলেজে গেলাম। তখন বেলা ৮।৯ টা হইবে। সাহেব পড়াইতেছিলেন। একটু অপেক্ষা করিলাম। হার সাক্ষাৎ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের নাম শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আসিলেন। উভয়ের মধ্যে একটু সখ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও শয্যা গ্রহণ করেন নাই; তিনি চেয়ারে

উপবিষ্ট ছিলেন, চন্দ্রা সাহেবকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খুড়িমা পাশের ঘরে অবস্থান করিতে-ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লইয়া রোগের পরিচয় দিতেছিলাম। চন্দ্রা সাহেব শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যহ দীর্ঘকাল ধরিয়া গীতা পাঠ করেন। সকল কথা শুনিয়া ডাক্তার সাহেব আদেশ করিলেন, "গীতা পাঠ বন্ধ রাখিতে হইবে—কথাবার্ত্তাও কমাইতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একটু হাসিলেন। তেমন হাসি তাঁহার ওষ্ঠে আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। এ প্রতিভার হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, অহঙ্কারের হাসি নয়,—এ নির্ম্মল আনন্দের হাসি—স্থির বিশ্বাসের বিদ্যুৎস্ফুরণ।

এ দিকে চন্দ্রা সাহেব ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। দ্বারবান যথাসময়ে ঔষধ লইয়া আসিল, ঔষধের শিশি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে সংরক্ষিত হইল। তিনি শিশির ছিপি খুলিয়া সমস্ত ঔষধটুকু পিক্‌দানিতে ঢালিয়া ফেলিলেন, এবং সহাস্য মুখে উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ আরম্ভ করিলেন। খুড়িমার ধীর স্থির গম্ভীর হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি তখন কোন প্রতি-

বাদ না করিয়া নীরব রহিলেন। পরে অনেক প্রতি-বাদ হইয়াছিল—অনেকে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তিনি এক দিনের জন্যও গীতা-পাঠ বন্ধ করেন নাই। অবশেষে তিনি শয্যাগত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সাতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। দন্তমূল হইতে রক্ত অবিরাম নির্গত হইতে লাগিল। একদিন স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অনেক বুঝাইয়াছিলেন। বঙ্কিম চন্দ্র তর্ক না করিয়া শুধু হাসিয়াছিলেন। অধরে আবার সেই হাসি। সুহৃদ্‌বর ছাড়িলেন না; বলিলেন, "তুমি আত্মহত্যা করিতেছ?"

বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে?"

ডাক্তার সরকার। যে ঔষধ না খায়, সে আত্মঘাতক।

বঙ্কিম। কে বলিল আমি ঔষধ খাই না?

ডাক্তার। খাও? কই তোমার ঔষধ?

বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গুলি হেলাইয়া গীতা দেখাইয়া দিলেন।

ডাক্তার সরকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা।"

বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রোগ ক্রমে বাড়িয়া উঠিল—জীবনের আশাও কম হইয়া আসিল। অবশেষে শয্যায় শুইয়া গীতা পাঠ করিবার শক্তিও লোপ পাইল। একদিন নিশীথে—আমার বেশ স্মরণ আছে—মহাপুরুষের জীবন লইয়া যখন টানাটানি, শয্যায় এক পার্শ্বে খুড়িমা, অপর পার্শ্বে আমি উপবিষ্ট থাকিয়া রোগীর মুখ প্রতি ব্যাকুল নয়নে চাহিয়া আছি, তখন সহসা শুনিলাম, ভক্তিময় পুরুষ ঘুমঘোরে গীতা আবৃত্তি করিতেছেন। গীতার একটু আধটু অংশ নয় - প্রায় একটা সর্গ অতি ক্ষীণ কণ্ঠে থামিয়া থামিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন। তারপর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরদিন হইতে তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন, এবং অচিরে আরোগ্য লাভ করিলেন।

মসী-যুদ্ধ।

যে কয়েকবার বঙ্কিমচন্দ্র মসী-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রায় সে কয়েক বারেই তিনি হিন্দুধর্ম্মের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। আগে লোকে ধর্ম্মের

জন্য তরবারি ধরিত—ক্রুসেড ঘোষণা করিত, এখন আর সে দিন নাই—লেখনী ধরিয়াই ক্ষান্ত হয়। ধর্ম্মের উপর আঘাত মানুষ কোন কালেই সহ্য করিতে পারে না। পণ্ডিতপ্রবর হেষ্টি সাহেব যখন হিন্দু ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া অযথা গালিগালাজ করিতে লাগিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র যেন একটু অধৈর্য্যহৃদয়ে রুদ্রমূর্ত্তিতে আসরে অবতীর্ণ হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার্থ লেখনী ধারণ করিলেন। তাহার দুই বৎসর পরে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের মহারথীগণ যখন আবার হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি তির্য্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মহাশক্তিশালী লেখনী উঠাইয়া লইয়া প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সকল বাদ প্রতিবাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে,—সংক্ষেপে পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

'নবজীবন' ও 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু-ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়মক্রমে ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছিলেন। নবজীবন কাগজ খানির একটু পরিচয় না দিলে সে যুগের পরিচয় অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। নবজীবন ও প্রচার পনর দিনের আড়াআড়িতে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম খানির

অন্নদাতা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার—দ্বিতীয় খানির, বঙ্কিমচন্দ্র। নবজীবনের সূচনায় অক্ষয় বাবু বঙ্গদর্শন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রশংসা করিলেন। তবে প্রশংসাটা বঙ্গদর্শনেরই কিছু বেশী হইল। এতদ্‌-উপলক্ষে এক বিরোধের সৃষ্টি হইল। আমি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাহার পরিচয় দিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, “তার পর সঞ্জীবনীতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন-সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানে যে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রধান লেখক, ঐ পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, এবং শুনিয়াছি, তিনি নিজে ঐ পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি কেহ এই সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

“নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয় বাবু, এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর একজন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করি-

লেন না। আমার প্রিয় বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন; এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া 'ইতর' শব্দটা লইয়া একটু নাড়া চাড়া করিয়াছিলেন।

"তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামি পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল,—'র'। লোকে কাজেই বলিল, পত্রখানি রবীন্দ্র বাবুর লেখা। রবীন্দ্র বাবু 'ইতর' শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পাল্‌টাইয়া বলিলেন।"*

রবীন্দ্র বাবু এ পত্রের দায়িত্ব অস্বীকার না করিয়া বলিতেছেন, "নবজীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নবযুগ প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল, সঞ্জীবনীতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তাহার পরে চন্দ্রনাথ বাবুতে আর আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথা কাটা-কাটি হইয়াছিল, সে তাঁহাতে আমাতে বোঝাপড়া। বঙ্কিম বাবু এই ব্যাপারটি অকারণে কেন নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" †

বঙ্কিম বাবু যে এ ব্যাপারটি অকারণ নিজের স্কন্ধে

* প্রচার, ১২৯১ সাল, ১১০ পৃষ্ঠা।

† ভারতী, ১২৯১ সাল, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

তুলিয়া লইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান হয় না। নবজীবন প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইতে না হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইলেন। দুইজন যশস্বী লেখক সঞ্জীবনীর সাহায্যে ও একজন মীমাংসা-প্রার্থী নব্যভারতে 'হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থান' প্রবন্ধদ্বারা আক্রমণ করিলেন; আর দুইজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত তত্ত্ববোধিনীতে লিখিলেন। এই পাঁচ জন লেখকই আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত। শুধু সমাজ-ভুক্ত বলিলেই চলিবে না, তাঁহারা উক্ত সমাজের মাথা। এক্ষণে আদি ব্রাহ্মসমাজের মস্তকস্বরূপ এই লেখকপঞ্চক সহসা একই সময়ে নবজীবনকে আক্রমণ করিলেন কেন? হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত কোন পণ্ডিত কিছু বলিলেন না কেন? কারণ অন্বেষণ করিতে দূরে যাইতে হইবে না। নব-জীবনের উদ্দেশ্য, নবযুগ-প্রতিষ্ঠা; এ নবযুগ হিন্দুধর্ম্মের। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, এই "ধর্ম্ম আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অভিমত নহে।" তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতির আক্রমণ অক্ষয় বাবু বা চন্দ্রনাথ বাবুর উপর নহে—এ আক্রমণ হিন্দুধর্ম্মের উপর। বঙ্কিমচন্দ্র তাই আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি

আক্রমণ নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। চন্দ্রনাথ বাবু বা হিন্দুসমাজ-ভুক্ত অপর কেহ যদি ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বা তত্ত্ব-বোধিনীর কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আক্রমণ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে সেই সমাজ-ভুক্ত যে কোন ব্যক্তি তদুত্তর দিবার সম্পূর্ণ অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ স্বীয় ধর্ম্মের জন্য, বা সেই ধর্ম্মভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের জন্য দুই চারি কথা বলিতে সম্পূর্ণ অধিকারী। নবজীবন-সম্পাদক এই সকল বাদানুবাদের মধ্যে স্থির থাকিয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলি-লেন। তিনি কোনও আক্রমণের উত্তর দেন নাই বা কোনও আক্রমণ বিশেষভাবে আহ্বান করেন নাই। তিনি যে এককালে আক্রমণ আহ্বান করেন নাই, এ কথা বলিতে পারি না; তিনি পত্র-সূচনায় তত্ত্ববোধিনীর প্রতি তীব্র তির্য্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন, "এক্ষণে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার কার্য্য ফুরাইয়াছে। তত্ত্ববোধিনীতে যে সকল প্রাণীতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই সাধারণে পাঠ করেন।" অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধনিচয় যাহা তত্ত্ববোধিনীতে

প্রকাশিত হয় তাহা পাঠের অযোগ্য। এইরূপে অক্ষয় বাবু নবজীবনের সূচনায় ঝড়ের সূচনা করিলেন। অবশেষে চারিদিকের ঝড় থামিয়া গেল। কিন্তু থামিল চারি পাঁচ মাস পরে। থামাইলেন বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, 'নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম্ম—যে হিন্দুধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়ম ক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম্ম আদি ব্রাহ্ম সমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজ-ভুক্ত লেখকগণ দ্বারা চারিবার আক্রান্ত হইয়াছি।" *

বঙ্কিমচন্দ্র সকল সমালোচনাকেই আক্রমণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এবং নির্দ্দেশ করিবার হেতুও দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রথম সমালোচনাটি আক্রমণ বলিয়া অনুমিত হয় না। যাহা হউক, যথাযথ নিয়ে সন্নিবিষ্ট হইল।

* প্রচার, ১২৯১ সাল, ১৭১ পৃষ্ঠা।

(১)

[বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ।]

প্রথম আক্রমণ, 'তত্ত্ববোধিনী'তে। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' * শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 'নবজীবনে' লিখিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' নাম দিয়া উক্ত পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' সমালোচিত হয়। প্রারম্ভে দ্বিজেন্দ্র বাবু লিখিলেন,—"নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় এক প্রকার নূতন হিন্দুধর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে—এবং তাহা প্রশ্নোত্তর আকারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার লেখক—সুতরাং তাহা উপেক্ষনীয় নহে,--আবার তাহা ধর্ম্মের মর্ম্মে আঘাত করিতে উদ্যত—সুতরাং আমাদের নীরব থাকা অকর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক এবং তিনি স্বয়ং আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র; তবে যে আমরা

* এই প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম না।

তাঁহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি—সে কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে।

"বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, শারীরিক, মানসিক ও আন্তরিক (?) বৃত্তি-সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ—এবং সেই সুখের যে উপায় তাহারই নাম ধর্ম্ম—এবং তিনি ইহাও বলিতে ছাড়েন নাই যে, সেই 'সুখই ধর্ম্ম।' ওরূপ সুখ প্রথমতঃ পূর্ণ যৌবন-কালের ধর্ম্ম—কেন না প্রাচীন বয়সে বৃত্তি-সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি একেবারেই অসম্ভব; দ্বিতীয়তঃ উহা খুব একজন সাবধানী প্রবীণ লোকের ধর্ম্ম।

"বঙ্কিম বাবু বলেন, 'যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্য-লোকে প্রচারিত করিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাকার।' এ কথা আমরা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করি-তেছি। কিন্তু ভগবদ্গীতার আদিতে পরকালের অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে—পরকালকে আত্মাকে এবং পরমাত্মাকে ছাড়িয়া দিয়াও যে, ধর্ম্মসাধন হইতে পারে, এ কথা ভগবদ্গীতার কথা নহে।

* * * * *

"বঙ্কিম বাবু বলেন যে, ঈশ্বর এবং পরকালের সহিত ধর্ম্মের কোন অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ নাই, সুতরাং আত্ম-প্রসাদ—যাহা আত্মা এবং পরমাত্মার পরস্পর-সম্বন্ধ-সাপেক্ষ—তাহা বঙ্কিমবাবুর সুখ-রাজ্যের সীমাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না।" *

বঙ্কিমচন্দ্র এই সমালোচনা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি (দ্বিজেন্দ্র বাবু) সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন, তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না।" †

(২)

[বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসু।]

দ্বিতীয় আক্রমণও 'তত্ত্ববোধিনী'তে। আক্রমক প্রবন্ধের নাম—'নূতন ধর্ম্মমত'। 'প্রচার' ও নবজীবনে'র

* তত্ত্ববোধিনী, ১৮০৬ শক, ভাদ্র।
† প্রচার, ১২৯১ সাল, ১১১ পৃষ্ঠা।

প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধদ্বয়ের নাম, 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ও 'হিন্দুধর্ম্ম।' এই প্রবন্ধ দুইটিতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তীব্র সমালোচনা 'নূতন ধর্ম্মমত'-লেখকের উদ্দেশ্য। লেখক কে, তাহা প্রকাশ নাই, তবে লোকে বলে, শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু উক্ত প্রবন্ধের লেখক। রাজনারায়ণ বাবু আরম্ভে বলিয়াছেন,—"কোন মহাকবি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরকে জানা বিদ্যার উদ্দেশ্য। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে আমাদিগের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা কোথায় ঈশ্বরনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবেন, তাহা না হইয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিকতা, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, জড়বাদ, অথবা কোমত্‌বাদ অবলম্বন করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি একটি নূতন ধর্ম্মমত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সে মত এই যে, কোমতের মতই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। 'নবজীবন' নামক অভিনব সাময়িক পত্রিকায় এই মত সমর্থিত হইতে দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। নবজীবনের 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' শিরস্ক প্রস্তাবের লেখক এই

মত সমর্থন করিয়াছেন যে, চির-চমৎকৃতি এবং সুখই ধর্ম্ম' এবং হিন্দুশাস্ত্র সকল এই মত প্রতিপাদন করিতেছে। এই মত একটি অদ্ভুত মত বলিতে হইবে। * * *

"নবজীবন-সম্পাদক বলিয়াছেন, 'নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন যে ধর্ম্মে উপেক্ষা করিলে আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতি হইবে না। ঘৃণিত কোমত্‌বাদের প্রবর্ত্তন যদি নবজীবন সঞ্চারের কারণ হয়, তাহা হইলে স্বদেশীয় লোকদিগকে এরূপ নবজীবন প্রাপ্ত হইতে আমরা পরামর্শ দিই না। যথার্থ বলিতে গেলে, ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগের মৃতবৎ হিন্দু-সমাজে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছে।

* * * * *

"নবজীবনের সহযোগী প্রচার পত্রিকার কোন লেখক বলেন, 'যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এইরূপ উন্নতির তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সার ভাগ গঠিত। এরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মে তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ আছে এরূপ আর কোন

ধর্ম্মেই নাই। সেইটুকু সার ভাগ। সেইটুকু হিন্দুধর্ম্ম। সে টুকু-ছাড়া যাহা থাকে—শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে, অথবা বেদেতে থাকে, তবু অসত্য অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য্য।' এই কথাতে আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সায় দিই, কিন্তু প্রচারের উক্ত প্রস্তাবের লেখক আবার নবজীবনের 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' শিরস্ক প্রস্তাবের লেখক। 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' শিরস্ক প্রস্তাবে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, তিনি কোম্‌তের মত হিন্দুধর্ম্মের সার ভাগ মনে করেন। যদি কোমতের মত হিন্দুধর্ম্মের সার ভাগ হয়, তাহা হইলে এমন হিন্দুধর্ম্ম আমরা চাহি না।

"ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন, 'যে ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনো-বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।'—হিন্দুধর্ম্মের

সার ব্রাহ্মধর্ম্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। ব্রাহ্মধর্ম্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোকমাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয়ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহা সমস্ত বঙ্গদেশের লোক গ্রহণ করিলে বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।" *

বঙ্কিমচন্দ্র এতদ্‌সমূহ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, 'ইহার পরে আবার নূতন হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারের উদ্যম নবজীবন ও প্রচারের ধৃষ্টতার পরিচয় বটে।" †

(৩)

[বঙ্কিমচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র সিংহ]

"তৃতীয় আক্রমণ," বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "তত্ত্ব-বোধিনীতে নহে, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিচারেও নহে।" বিচার্য্য বিষয় অতি সামান্য। তাহা লইয়া কলহ, গালা-গালি চলে না। কিন্তু কৈলাস বাবু অবাধে চালাইয়াছেন। ব্যাপারটা গোড়া হইতেই বলি।

* তত্ত্ববোধিনী, ১৮০৬ শক, ভাদ্র।

† প্রচার, ১২৯১ সাল, অগ্রহায়ণ।

'বাঙ্গালার কলঙ্ক' নামক একটী প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারে প্রথম সংখ্যায় লিখিলেন। তাহাতে রাগ করিবার কাহারও কিছু নাই। উক্ত প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।—

"মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করেন নাই। ভিন্ন দেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্ন জাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। * * কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

"এ নিন্দার কোনও মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না। সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ জাতি পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই? * * *

"বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে

পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। * * *

"পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়। কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হন নাই। কেহই তাঁহার মতের সৎপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই।" ইত্যাদি।

এইরূপে অবতারনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, মিত্র মহাশয়ের আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বের যাথার্থ্য নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সকল কথায় আমাদের এক্ষণে কোন প্রয়োজন নাই। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে একজন লেখক 'নব্যভারতে' উহার প্রতিবাদ করেন। তাহাতে তিনি লেখেন—

"'বঙ্গদর্শন' অনন্তধামে গমন করিয়াছে। 'নবজীবন' ও 'প্রচার' তাহার স্থান অধিকারের জন্য অগ্রসর হইয়াছে। 'নবজীবন' সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় প্রচার নীরবে আপন প্রাধান্য সংস্থাপনের

অস্ত প্রয়াস পাইয়াছে। প্রথম সংখ্যা প্রচারে 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গ-দর্শনের 'ভারতকলঙ্ক' এই প্রবন্ধের আদর্শস্থল, ইহা তাহারই পরিশিষ্ট।

"আমরা বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের নিকট 'দাতাকর্ণ' 'গুরুদক্ষিণা' প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম। সে সকল সে সময় নিতান্ত উপাদেয় বোধ হইত। কিন্তু এক্ষণে আমরা আর তাঁহার পক্ষপাতী নহি। এক সময়ে আমরা বঙ্গ-দর্শনের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পক্ষপাতী ছিলাম; কিন্তু এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, তাহার অধিকাংশই অনুবাদ, অনুকরণ, ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধটি কেবল বালকের নিকটে কেন, ঐতিহাসিক তত্ত্বানভিজ্ঞ অনেকের নিকটেই ভাল লাগিবে॥ কিন্তু আমরা তাহার কতকগুলি কথার প্রতিবাদ না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।"

এইরূপে আরম্ভ করিয়া কৈলাস বাবু পণ্ডিত রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের মত যে অখণ্ডনীয় নহে তাহা, প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজেন্দ্রবাবু "সেনরাজ" ও "পাল ও সেন" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার দুই

এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া কৈলাসবাবু, মিত্রমহাশয়ের ভ্রম প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইলেন।

প্রবন্ধের উপসংহারে কৈলাসবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন,—"হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ণ কর, আবিষ্কৃত মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর, কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন, বেবার, মেক্‌স্‌মূলর, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিম্বা মিয়োর, ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, হণ্টার প্রভৃতির কুসুমকাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীনভাবে গবেষণা কর। না পার, গুরুগিরি করিও না।"

কৈলাস বাবুর এই প্রবন্ধের বৈচিত্র্য এই যে, এই প্রবন্ধের আরম্ভে ও শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি প্রচুর পরিমাণে গালিবর্ষণ করা হইয়াছে। মধ্যভাগে শুধু রাজেন্দ্রবাবুর ঐতিহাসিকতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। মধ্যভাগের সহিত অপর দুই অংশের বড় একটা সম্বন্ধ দেখা যায় না। সম্বন্ধ রক্ষার প্রয়োজন নাই—গালি দেওয়াই প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাধ, কেন তিনি রাজেন্দ্র-

বাবুর মত অখণ্ডনীয় বিবেচনা করিয়াছিলেন? অপরাধ আরও একটু আছে; কৈলাসবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারক ও প্রচারক। বঙ্কিমচন্দ্র, কৈলাসবাবুর পরিচয়ে বলিতেছেন, "শুনিয়াছি ইনি যোড়াসাঁকোর ঠাকুরমহাশয়দিগের একজন ভৃত্য—নাএব কি কি আমি ঠিক জানি না।" ভাষা সম্বন্ধে বলিতেছেন, কৈলাসবাবুর অন্যান্য প্রবন্ধে "কখন অসৌজন্য বা অসভ্যতা দেখি নাই। কিন্তু এবারকার এই প্রবন্ধে ভাষাটা সহসা বড় নাএবি রকম হইয়া উঠিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, এ আক্রমণ কৈলাস বাবুর নহে—এ আক্রমণ আদি ব্রাহ্মসমাজের। তাই তিনি ইহাকে আদি ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় আক্রমণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

---

(৪)

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ।

প্রথম সংখ্যা 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম্ম' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে দুইটি হিন্দুর কথা উল্লেখ

করিয়াছেন। প্রথম ব্যক্তি জমিদার। তিনি প্রত্যূষে স্নানাদি সমাপন করিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত একাগ্রমনে পূজাহ্নিকে অতিবাহিত করেন। তার পর নিরামিষ শাকান্ন ভোজনান্তে কাছারিতে বসিয়া কোন্ প্রজার সর্ব্বনাশ করিবেন, কিরূপে জাল দলীল প্রস্তুত করিয়া কোন্ বিধবার সর্ব্বনাশ করিবেন, ইহাতে নিবিষ্টচিত্ত থাকেন।

দ্বিতীয় হিন্দুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এ ব্যক্তির অভক্ষ্য কিছুই নাই। সুরাপান বা ম্লেচ্ছের সঙ্গে পান ভোজনাদিতে তাহার কিছু মাত্র সঙ্কোচ বা বিরাগ নাই। সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া কর্ম্ম কিছুই করেন না। কিন্তু তিনি অন্তরে ঈশ্বরে ভক্তিবান্—মিথ্যা কথা কদাচ কহেন না। যদি কখনও মিথ্যা কথা কহেন, তবে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন। তিনি নিষ্কাম হইয়া দান ও পরহিত সাধন করিয়া থাকেন; এবং যথাসাধ্য ইন্দ্রিয়-সংযমও করিয়া থাকেন।

এই দুই ব্যক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু?

হইয়াছে? কঠোর সত্যাচরণ করিয়া আমাদের এই বঙ্গ সমাজের কি এতই অহিত হইতেছে যে, অসাধারণ প্রতিভা আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে সেই সত্যের মূল শিথিল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু হায়, অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।"

উপসংহারে রবীন্দ্রবাবু বলিতেছেন,—

"অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কাপুরুষতার আশ্রয়-স্থল এই হীন মিথ্যাকে সবলে সমূলে উৎপাটন না করিয়া যদি তাহার বীজ গোপনে বপন করেন, তবে সমাজের ঘোরতর অমঙ্গলের আশঙ্কায় হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। যিনিই যাহা বলুন, পরম সত্যবাদী বলিয়া আমাদিগকে উপহাসই করুন, sentimental বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞাই করুন বা শ্রীকৃষ্ণেরই দোহাই দিন, এ মিথ্যাকে আমরা কখনই ঘরে থাকিতে দিব না, ইহাকে আমরা বিসর্জ্জন দিয়া আসিব।"

বক্তৃতাটি মুদ্রিত হইয়া "ভারতী"তে প্রকাশিত হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পঠনান্তর 'প্রচারে' "আদি ব্রাহ্ম

সমাজ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'প্রচারে'ই এই প্রবন্ধ বাহির হইল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র বাবুর আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন,—"ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। রবীন্দ্রবাবু যখন ক, খ শিখেন নাই,তাহার পূর্ব্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার একটু উত্তর করিবার প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে, (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে) তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে।

"কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্র বাবুর কথার উত্তর ইহার বেশী প্রয়োজন নাই।" * * *

"তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।"

'আদি ব্রাহ্ম সমাজ'কে লক্ষ্য করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বলিয়াছেন। রবিবাবু এই সমাজের তখন

সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বিশ্বাস ছিল, এ আক্রমণ রবিবাবুর স্বেচ্ছাকৃত নহে। তিনি রবিবাবুকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন—রবিবাবুও বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, "রবিবাবু আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র।" রবিবাবু মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে আসিয়া সাহিত্যালোচনা করিতেন। উভয়কে সে সময় একত্র দেখিয়া মনে হইত, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট, অথবা শিষ্য গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় রবিবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে গালিগালাজ করিতে পারেন না। বঙ্কিম-চন্দ্রও তাহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, —"চারি মাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহ-পূর্ব্বক অনেক বার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই। * * * তার পর চারিমাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে করি, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে।

এক্ষণে আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাজ, গোড়ায় যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন।"

এইরূপে আদি ব্রাহ্ম সমাজকে মসী-যুদ্ধে জড়াইবার হেতু প্রদর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে অবস্থায় "মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়," সে অবস্থার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনেকেই অবগত আছেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠির কর্ণের যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া শিবিরে পলায়নপূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণার্জ্জুন রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, যুধিষ্ঠির শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ভাবিতেছিলেন, অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিয়া সংবাদ দিতে আসিয়াছেন। যখন শুনিলেন যে, কর্ণ বধ হয় নাই, তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, যে ব্যক্তি গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি সংহার করিবেন। "কাজেই 'সত্য'রক্ষার জন্য অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নহিলে তিনি 'সত্য'-চ্যুত হয়েন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত

হইলেন—মনে করিলেন, তার পর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্ম-হত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য লঙ্ঘনই ধর্ম্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।"

উক্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবশেষে 'সত্য' শব্দের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজিতে যাহাকে Truth বলে 'সত্য' শব্দ ঠিক তাহা নহে। সত্য Truth বটে, কিন্তু Truth ছাড়া আরও কিছু। Truth, Honour, Faith এই সকল শব্দের সমষ্টি অর্থে যাহা বুঝায়, এক 'সত্য' শব্দের অর্থে তাহাই বুঝায়।

অতএব প্রতিজ্ঞাপালনও সত্য-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাপালনে কাতর, সে সত্য ধর্ম্মচ্যুত। অর্জ্জুন যখন তাঁহার সত্যরক্ষার্থ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম।" রবীন্দ্রবাবুর সম্প্রদায়কে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তাঁহাদের মতে আপনার পাপপ্রতিজ্ঞা (সত্য) রক্ষার্থে নিরপরাধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জ্জুনের উচিত ছিল?

যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য করে যে আজ দিবা অবসানের মধ্যে পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ আছে—হত্যা, দস্যুতা, পরদার, পরপীড়ন,—সকলই সম্পন্ন করিব—তাঁহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত? যদি তাঁহাদের সে মত হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সত্যবাদ তাঁহাদেরই থাক্, এ দেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর তাঁহাদের মত যদি সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এখানে সত্য-চ্যুতিই ধর্ম্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য।"

উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রবাবুকে বলিতেছেন, "সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভান বলিতেছি। এ জিনিষ এ দেশে বড় ছিল না,—এখন বিলাত হইতে ইংরাজির সঙ্গে সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য্য।

তাঁহার (রবীন্দ্রবাবুর) কাছে অনেক ভরসা করি, এই জন্য বলিলাম। তিনি এত অল্পবয়সেও বাঙ্গালার

উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।”

এই খানেই যবনিকা পড়িল না। রবীন্দ্র বাবু আবার উত্তর দিলেন। উত্তরটার নাম দিলেন—“কৈফিয়ৎ।” ভারতীর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

“বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, ভারতীতে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধে গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি বড় বাড়াবাড়ি আছে।” শুনিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। বঙ্কিম বাবুর লেখার প্রসঙ্গে আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি কিন্তু বঙ্কিম বাবুকে কোথাও গালি দিই নাই। তাঁহাকে গালি দিবার কথা আমার মনেও আসিতে পারে না। তিনি আমার গুরুজনতুল্য, তিনি আমার চেয়ে কিসে না বড়? আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আর কেই বা না করে? তাঁহার প্রথম সন্তান দুর্গেশনন্দিনী বোধ করি আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। আমার যে এতদূর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল যে, তাঁহাকে অমান্য করিয়াছি—কেবল মাত্র অমান্য নহে—তাঁহাকে গালি দিয়াছি, তাহা

সম্ভব নহে। ক্ষুব্ধহৃদয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু গালিগালাজ হইতে অনেক দূরে আছি।

* * * *

"গালিগালাজ করা কোন হিসাবেই ভাল নহে সন্দেহ নাই; এবং সে কাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে হয়ও নাই। তত্ত্ববোধিনীতে বঙ্কিম বাবুর মতের বিরুদ্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে গালিগালাজের কোন সম্পর্ক নাই।

* * * *

"বঙ্কিম বাবুর লেখার ভাব এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিবিশেষের লেখার উত্তর দেওয়ার আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না যদি না উক্ত রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিম বাবুর সহিত মুখামুখী উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে, বঙ্কিম বাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব্ব অনুভব করার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল, তাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া

বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, ভরসাও হয় না।"

প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবু তিনটি যুক্তি খাড়া করিয়াছেন। প্রথম, "সত্য অর্থে সাধারণতঃ Truth বুঝায় ও কেবল স্থলবিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায়। অতএব যেখানে সত্যের সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ অর্থের আবশ্যক, সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও আবশ্যক।" দ্বিতীয়, "সত্য বলিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝায় না—সত্য পালন বা সত্যরক্ষা বলিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝায়—কেবল মাত্র সত্য শব্দে বুঝায় না।" তৃতীয়, "বঙ্কিম বাবু 'সত্য' শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি 'মিথ্যা' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন।"

আরও প্রমাণাদি দর্শাইয়া রবীন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "বঙ্কিম বাবু এইরূপে বলেন যে, আমি যখন মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি, তখন অগ্রে সেই কৃষ্ণোক্তি অনুসন্ধান করিয়া পড়িয়া তবে আমার কথায় যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু বঙ্কিম বাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধে মহাভারতীয় কৃষ্ণের বিশেষ উক্তির বিশেষ

সর্ব্বজনখ্যাত দ্রোণপর্ব্বস্থ কৃষ্ণের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে উক্তিই মনে উদয় হওয়া অন্যায় হয় নাই। * * 'হত ইতি গজে'র কথা সকলেই জানে, কিন্তু গাণ্ডীবের কথা এত লোকে জানে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র একটী গুরুতর অভিযোগ করিয়াছিলেন; রবীন্দ্র বাবু সে সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"বঙ্কিম বাবু এক স্থলে কৌশলে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে, আমার প্রবন্ধে আমি মিথ্যা কথা কহিয়াছি। * * আমি বলিয়াছিলাম, 'লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন' ইত্যাদি। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, প্রথম কল্পনা শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়াছি, এ কথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছু নাই যে তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্র বাবু তুলিয়াছেন। পাঠক, ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, কল্পনা নহে। আমার নিকট পরিচিত দুইজন হিন্দুর দোষ গুণ বর্ণনা করিয়াছি।"

অভিযোগের উত্তরে রবীন্দ্র বাবু সরলভাবে স্বীকার

করিতেছেন যে, প্রচারের লেখা হইতেই তিনি এরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। যদি অনুমানে ভ্রম হইয়া থাকে, তবে সে ভ্রম তরুণ বয়সসুলভ। রবীন্দ্র বাবু বলিতেছেন,—"আমার দ্বিতীয় নম্বর মিথ্যার উল্লেখে (বঙ্কিমচন্দ্র) বলিয়াছেন—'তার পর আদর্শ কথাটি সত্য নহে। আদর্শ শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না।" * *

"প্রথম কথা এই যে, আমি বলিয়াছিলাম, 'তিনি একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন' ইত্যাদি। আমি এমন বলি নাই যে—তিনি একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন। 'একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করা' ও 'একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করা' উভয় অর্থের কত প্রভেদ হয়, পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।"

উপসংহারে রবীন্দ্র বাবু অতি উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন, "বঙ্কিম বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি, তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার

উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জ্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবন্ধের আর কোনও উত্তর দেন নাই। দিবেন না, তাহা পূর্ব্বেই 'প্রচারে' বলিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে এ মনোমালিন্য অচিরে দূরীভূত হইয়াছিল। ১২৯১ সালের পৌষ-সংখ্যার 'ভারতী'তে রবীন্দ্র বাবুর 'কৈফিয়ৎ' প্রকাশিত হইয়াছিল। মাঘ মাসের 'প্রচারে' রবীন্দ্র বাবু একটি কবিতা দিয়াছিলেন। কবিতার নাম 'মথুরায়'। এতৎপূর্ব্বে রবীন্দ্র বাবুর কোন রচনা 'প্রচারে' প্রকাশিত হয় নাই।

---

(৫)

[বঙ্কিমচন্দ্র ও অধ্যাপক হেষ্টি।]

১৮৮২ সালে হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোরতর মসী-যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধ ষ্টেট্‌স্‌-ম্যান কাগজেই চলিয়াছিল। শোভাবাজার রাজবাটীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষ হইয়াছিল। মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ খুব জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া-

ছিল। বৃহৎ সভামণ্ডপে বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। এই সভায় ৪০০০ অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাক্ষেত্রে গৃহবিগ্রহ গোপীনাথজীকে রৌপ্য সিংহাসনে সংস্থাপন করা হইয়াছিল। এই গোপীনাথজীকে সভামধ্যে দেখিয়া হেষ্টি সাহেবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; ক্রোধ সংবরণে অক্ষম হইয়া তিনি হিন্দুদের ধর্ম্মের উপর তীব্র বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। হেষ্টি সাহেব আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, যে সভায় এই বিগ্রহকে স্থাপন করা হইয়াছে, সেই সভায় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কিরূপে অবস্থান করিলেন? ক্রমে তাঁহার সুর চড়িয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন,—

"No delicate mind can look into a Sivite temple without a shudder. The horrid and bloody *Kali*, with her protruding tongue, her necklace of skulls, and her girdle of giant hands, is fitted only to excite terror and despair. The elephant-headed, huge paunched Gonapati may excite the ridicule even of children, but can

never draw forth their love. And to take the special example in point of the Krishna cult, what is at the best, with all its merry music and mincing movements, but the apotheosis of sensual desire and the idolatry of merely finite life.

হেষ্টি সাহেব এইরূপ গালি দিয়া হিন্দু ধর্ম্মটা যে তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইলেন। তিনি লিখিলেন,—

"But the fundamental position of the defender of idolatry is, that it is an *ideal necessity* for the practical devotion of less cultivated minds. The essential nature of deity is held to be so abstract and transcendent, that the ordinary worshipper can not apprehend it intellectually, and hence he must have put before him some visible representation of the Divine. This is the sheet anchor of the Hindu apologist to which he binds the whole system."

এইরূপে হিন্দু পৌত্তলিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া হেষ্টি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি কল্পনা-কুশল আর্য্যসন্তান বাঙ্গালী, বুদ্ধি-শক্তিতে কোল, ভীল, সাঁওতাল অপেক্ষা নিকৃষ্টতর?" এ কথার উত্তর তিনি নিজেই কিছু চিন্তার পর দিলেন; বলিলেন, "না,

বাঙ্গালীরা কখন এত নীচ, এত স্থূলবুদ্ধি হইতে পারে না যে, তাহাদের হাতেগড়া মাটির পুতুলের সাহায্য ব্যতীত তাহারা ঈশ্বরের ধ্যান বা উপাসনা করিতে অক্ষম।”

স্তোকটুকু দিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধরিলেন;— বলিলেন,—

“What is Krishna, after all, but an imaginary embodiment of the sensuous feeling of the East ?——— ”

শ্রীকৃষ্ণকে এক হাত বেশ লইয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মে আমাদের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা বলিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন; বলিলেন, —

“And this debasing idolatry produced, according to the painful testimony of native writers themselves, a mass of shrinking cowards, of unscrupulous deceivers, of bestial idlers, of filthy songsters, of degraded women, and of lustful men. * * It has encouraged and consecrated every conceivable form of licentiousness, falsehood, injustice, cruelty, robbery and murder. It has taught the millions every possible iniquity by the example of their gods. * * The Hindu alone still disgraces the nobility of the Aryan race by a Syrian worship of

idols inflaming him with lust under every green tree."

এতদপেক্ষা গুরুতর গালাগালি আর কেহ কখন কোন জাতির ধর্ম্মকে দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গালি দিয়া, ভারতবর্ষের অবনতি দর্শন করিয়া, হেষ্টি সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সে নিশ্বাসেরও সঙ্গে সঙ্গে হলাহল। সাহেব লিখিলেন,—

"O Varat Barsa, the once fair daughter of the morning, how hast thou fallen from thy throne of pride and become the mother of harlots and of the abominations of the earth!"

এ গালাগালি বঙ্কিমচন্দ্র সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ষ্টেট্‌সম্যানে একখানি পত্র লিখিলেন। সে পত্রখানির নকল নিম্নে দিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র পত্রনিম্নে নিজ নাম স্বাক্ষর করিলেন না—একটা কাল্পনিক নাম দিলেন; নামটী,—'রামচন্দ্র'। শেষ পত্র ছাড়া তিনি অন্যান্য সকল পত্রে 'রামচন্দ্র' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

No. I (Ram Chandra's.)

"Will you allow me to suggest to Mr. Hastie who is so ambitious of earning distinction as a sort

of Indian St. Paul, that it is fit that he should render himself better acquainted with the doctrines of the Hindu religion before he seeks to demolish them. As matters stand with him, his arguments are simply contemptible; and I think the columns of the STATESMAN might have been more usefully occupied by advertisements about Doorga Puja Holiday goods than by trash which render the Champion of Christianity contemptible in the eyes of idolaters. This may be harsh language, but the writer who mistakes Vedantism for Hindooism, and goes to Mr. Monier Williams for an exposition of that doctrine, hardly deserves better treatment. Mr. Hastie's attempt to storm the 'inner citadel' of the Hindoo religion forcibly reminds us of another equally heroic achievement—that of the redoubted knight of La Mancha before the windmill.

"Let Mr. Hastie take my advice, and obtain some knowledge of the Sanskrit Scriptures in the *original*. Let him study then critically all the systems of Hindu Philosophy—the *Bhagabat Gita*, the *Bhakti Sutra* of Sandilya, and such other works. Let him not study them under European scholars, for they cannot teach what they don't understand; the blind cannot lead the blind. Let him study them with a Hindoo, with one who *believes* in them. And then, if he should still entertain his present

inclination, to enter on an apostolic career, let him hold forth at his pleasure, and if we do not promise to be convinced by him, we promise not to laugh at him. At present, arguments would be thrown away on him. There can be no controversy on a subject when one of the controversialists is in utter ignorance on the subject-matter of the controversy; and if under such circumstances the 'Olympians only yawn,' and do not assert, Mr Hastie has only to thank his own precipitate ignorance."

পত্রখানা পড়িয়া হেষ্টী সাহেব বুঝিলেন, তাঁহাকে এবার একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুঝিতে হইবে। তিনি এতদিন যে সকল হিন্দুদের সঙ্গে মসীযুদ্ধে ব্রত ছিলেন, তাহাদের তাচ্ছল্য করিয়া লিখিলেন,—

"I do not intend to ask space for a reply to any of the *special* criticisms of your numerous correspondents upon my letters, until they say something relevant and worthy of being dealt with. But I hope you will allow me to return grateful thanks to the valiant hero of the modern Brahmans, *Ram• Chandra, Rediviva*, for the kind advice so• bountifully tendered to me in your

columns to-day, which I sincerely promise to put into practice, as soon as he shows that I have need of it. Your readers, who may be better acquainted with Sanskrit literature than he seems to be, will have already judged whether I confounded Vedantism with Hinduism."

হেষ্টি সাহেব ক্রমে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং রামচন্দ্রকে "supercilious and self-confident" বলিয়া আখ্যাত করিলেন। তার পর রামচন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া স্পর্দ্ধাসহকারে লিখিলেন—

"I publicly challenge him to substantiate his allegation of the 'contemptible' inferiority of 'blind' European learning, by giving, without its aid, an intelligible explanation of the simple *Vedic* verse—"Chatustrinsadvajino devabandhorvankrirasvasya svadhitih sameti." * I give him the whole of the Durga Puja holidays even to discover the difficulty involved in the expression, and if he does find out so much, I will give him, and the other 4000 *Adhyapaks* to boot, who were present at the great *Shradh*, as many months as they like, to search through all the Sanskrit literature known to them for an explanation."

---

* চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেববন্ধোর্বঙ্ক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেতি।

সাত দিন যাইতে না যাইতে হেষ্টি আর একখানা পত্র লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন,—

"I am waiting patiently for a reply to my last letter from the learned *Ram Chandra* and the 4000 *Adhyapaks* of the *Sradh*. It is really a challenge to all the Pandits of Bengal to show that they understand their own sacred literature, and are able to defend it at the bar of modern science. If none of them—not even the modern *Ram Chandra* himself—can come forward and bend this bow of a Western Janaka, let the champions of Hindu idolatry henceforth 'hide their diminished heads' before the more powerful scholars of Europe, and let the last abominations of that idolatry, even in these Durga Puja days, sink into utter darkness and shame."

এ পত্র ষ্টেট্‌সম্যানে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের পত্র লিখিত ও প্রেরিত হইল। তাঁহার পত্রের কিছু কিছু পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

No. II. (Ram Chandra's).

"The courage and dash with which Mr. Hastie throws down the gauntlet I admire and ackow-

ledge with a low *salaam* merely suggesting, in all humility, the necessity of further improvement in transliterating and transcribing Sanskrit texts.

* * *

"In plain language, as some irreverent heathen may be supposed to say, *Mr. Hastie loses temper* That is an important point gained in favour of Hinduism. Mr. Hastie attacks, without provocation, the proceedings in a solemn mourning ceremony held in the private dwelling house of one of the most respectable Hindu families in the country; attacks all the most respected members of native society, attacks their religion; attacks the religion of the nation. And all this without the slightest provocation, and from no other motive than a somewhat overflowing zeal in the cause of truth and of religion. And then, when an humble individual of the nation, whose religion he tramples upon, ventures upon a single retort, Mr. Hastie's temper is on fire and it explodes. The combatant who loses his temper in fight, is scarcely believed to be on the winning side. That is the point I score in favour of Hinduism. If this is the attitude which the Christian Missionary of the present day thinks it proper to assume towards Hinduism, Hindhism has nothing to fear from his labours.

"I suggested to Mr. Hastie that before putting himself forward as the assailant of the Hindu religion he should study the Hindu scriptures in the original, and under the guidance of those native scholars who believe in them. That Mr. Hastie does not choose to accept my advice does no harm to me or to my cause. It is no loss to the Hindu religion that its assailants do not choose to be better armed than they are. But beneath Mr Hastie's scornful rejection of my advice lurk some errors which are not confined to him, but are shared by a large class of Europeans.

"* * * A brief consideration will convince Mr Hastie and others who think with him, that no translation from the Sanskrit into a European language can truly or even aproximately represent the original. Let the translator be the profoundest scholar in the world—let the translation be the most accurate that language can make it, still the translation will be, for practical purposes, very wide. The reason is obvious. You can translate a word by a word, but behind the word there is an idea, the thing which the word denotes, and this idea you can not translate, if it does not exist among the people in whose language you are translating.

"And who is best qualified to expound the ideas and conceptions which can not be translated—the foreigner who has nothing corresponding to them in the whole range of his thoughts and experiences, or the native who was nurtured in them from his infancy? If obviously the latter, what is the meaning of this towering indignation at my suggestion that Mr. Hastie should resort to the latter for instruction? I added that he should take his lessons not merely from a Brahmin but from a Brahmin who *believes* in them. * * * If Mr. Hastie thinks that he can comprehend the vast complicated labyrinth of Hindu religious belief without studying it in the original sources of knowledge, and in a spirit of patient, earnest, and reverential search after truth, he will meet with bitter disappointment. He will fail in arriving at a correct comprehension of Hinduism, as—I say it most emphatically—*as every other European who has made the attempt has failed.* And if he thinks that his eloquence alone will enable him to demolish the oldest and the most enduring of all religious systems without a correct knowledge of its doctrines—why, I can only wish for an Indian Cervantes to record his achievements.

Mr. Hastie has unnecessarily complicated the

question by his protest on behalf of European Sanskritists. No one questions their *scholarhsip.* I can assure him that men like Max Muller and Goldstucker, Colebrooke and Muir, Weber and Roth do not stand in need of a champion like Mr. Hastie. I yield to none in my profound respect for their learning, their ability, and the large-hearted philanthropy which leads them to devote themselves to pursuits from which my countrymen recoil in fear and despair. When, however, Mr. Hastie goes on to say that "both the Sanskrit language and Sanskrit literature are much better understood in Europe or America than they are in India," I decline to follow. It is, I believe, one of the most monstrous assertions ever made; but what gives it importance is that not a few Europeans, and possibly some anglicised natives—Hindus I can not call them—who do not mix with their own race, believe it to be true.

* * *

"The fundamental doctrines of the Hindu religion and its vast details are what no European scholar is competent to teach. This I did mean to say, and this I again positively assert. I will add, that there are many other things in Indian literature and Indian philosophy—other things than the religious doctrines—which no European scholar

understands, aud no European scholar is competent to teach."

এ পত্রে এই পর্য্যন্ত লিখিয়া রামচন্দ্র লিখিলেন "যদি হেষ্টি সাহেব নিতান্তই জেদ করেন, তাহা হইলে আমার প্রকৃত নাম শেষপত্রে সন্নিবিষ্ট করিব। আপাততঃ হেষ্টি সাহেবের অবগতির জন্ত আমার নামের কার্ড পাঠাইলাম। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী একজন নগণ্য ব্যক্তি; ইহা দেখিয়া হয় ত তিনি হতাশ হইবেন; কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বী যে একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ থাকিবে না।"

এই পত্র পড়িয়াই হেষ্টি সাহেব লিখিলেন,—

"It was not without a certain "stern joy" that I discovered the valiant Ram Chandra marching out this morning with a long column, to the defence of this ancient windmills; although I must confess, I am deeply dissapointed to find that he is the learned Shevaite priest and protagonist of local Hinduism, that I took him to be, when I singled him out as the strongest of all my assailants for a reply. * * *

"But when the mighty Ram Chandra, like a *Deus ex machina* all in the imposing pomp of a new *Avatar*, appeared on the scene, claiming all

the wisdom of India for himself, and treating me with such contempt as would have been intolerable to a 'black beetle', I deemed it quite in order to reply to him in somewhat of his own style."

এইরূপ লিখিয়া সাহেব বিশেষভাবে জানাইলেন যে, তাঁহার কোনরূপ ক্রোধের সঞ্চার হয় নাই। উপরিউক্ত পত্র লিখিবার সময় তাঁহার মনের ভাব এত প্রফুল্ল ছিল যে, সে রকম প্রফুল্লতা কদাচিৎ তিনি ইতিপূর্ব্বে অনুভব করিয়াছেন। ইহা বলিয়াই আবার লিখিলেন,—

"In my own confidential cricle, his lucubrations are giving immense amusement, and riddle or conundrum; the more he writes on the subject of my challenge, the more he will amuse us."

—o—

এইবার রামচন্দ্র একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। পত্রখানি গভীর গবেষণাপূর্ণ। প্রয়োজনীয় কোন অংশ আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে যে অংশ নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলাম, তাহাই পরিত্যাগ করিলাম।

No III. (Ram Chandra's).

"I am sorry to have again kept Mr. Hastie and his "confidential circle" waiting for the promised amusement, but a Brahman's proper occupation during Pujas is feasting, not controversy. Advised by Mr. Hastie that religious discussions contribute so abundantly to clerical mirth, I now hasten to treat him to a rather large measure of that commodity.

"Your readers may consider it somewhat superfluous that anybody should undertake to prove that those who profess a religion understand its doctrines better than those who do not profess it. I must do Mr. Hastie the justice to say that he has nowhere distinctly denied this. It is, however, really the absurd position Mr. Hastie has taken up. It is the logical outcome of that monstrous claim to omniscience, which certain Europeans—an extremely limited number happily—put forward for themselves. No knowledge is to them true knowledge unless it has passed through the sieve of European criticism. All coins is false coin unless it bears the stamp of a Western mint. Existence is possible to nothing which is hid from their searching vision. Truth is not truth, but noisome error and rank falsehood, if it presumes to exist outside the pale of European cognizance."

ইহা বলিয়া রামচন্দ্র একটি গল্পের অবতারণা করিলেন। গল্পটি দেশ-প্রসিদ্ধ; এক জন জাহাজী গোরা পিপাসা ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া জনৈক ভারতবাসীর নিকট কিছু আহার্য্য প্রার্থনা করিল। দেশবাসী তাহাকে একটি নারিকেল দিয়া কি রূপে তাহা খাইতে হয় উপদেশ দিল। ক্ষুধার্ত্ত নাবিক পূর্ব্বে কখন নারিকেল দেখে নাই; সে দাঁত দিয়া ছোবড়া ছাড়াইয়া চিবাইতে লাগিল। ছোবড়ার স্বাদ সে পছন্দ করিল না। অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া নারিকেল ছুঁড়িয়া দাতার মাথায় মারিল।

এই গল্পের অবতারণা করিয়া রামচন্দ্র অবশেষে বলিলেন যে,—

"The sailor carried away with him an opinion of Indian fruits parallel to that of Mr. Hastie and others, who merely bite at the husk of Sanskrit learning, but do not know their way to the kernel within."

• • •

"Let us lay aside all general reasoning, and come to a circumstance peculiar to India, which alone is of sufficient weight to decide the case in my favour. I refer to the existence, unheeded by

or unknown to, the European, of a vast mass of *traditionary and unwritten knowledge in India*, used to supplement, illustrate, or explain the written literature. It is generally understood now that even before the art of writing was known in India, there was already a bulky literature which had to be handed down from teacher to pupil by word of mouth. * * * Knowledge in India thus come to be in part recorded in a written literature, and in part handed down as unwritten and traditional. All who studied under the older generation of *Bhattacharjyas* of the *Tols* know, as I have the good fortune to know, that of the wealth of learning which flowed from their lips much had no record except in the memory of the professors. This was specially the case with artistic and scientific knowledge, where another motive—professional jealousy—came into play Each discoverer, anxious to confine to himself and his own circle the discovery at which he had arrived, never trusted it to writing and satisfied himself with communicating it to his pupil in confidence. To this jealousy we owe that India has now utterly lost so many of her ancient art and so much of her ancient sciences. Medical science is a conspicuous instance ; and the native physician, trained in European schools, still

fails to wrest from the jealousy of the *Kabiraj* treasures of knowledge which both regard as invaluable. Now all this unwritten traditional knowledge, which is flesh and blood to the dry bones of the written literature, is wholly unavailable to the European scholar. The dry bone rattle in his hand and as he knows how to rattle them well, they make a thundering noise in the ears of the civilised world. But the breathing form of old learning and the old civilisation is visible to native eyes only.

"I have no hesitation in admitting the decided superiority of the European enquirer in the fields of Vedic literature. To the Indian studeut Vedas are dead; he pays to them the same veneration which he pays to his dead ancestors, but he does not think that he has any further concern with them. They do not represent living religion of India, and the only interest that can be felt in them by any human being is merely the historical interest. That is all in all to the accomplished European scholar, but of little moment to the native student who has never displayed any gifts for history. This accounts not only for the superior Vedic learning of the European, but also for the far superior value of his contributions to Indian and Aryan history. In all other departments of learning there

can be no comparison between the profound but unostentatious learning of the Pundit of the *Tol* with the shallow but showy acquisitions of the European professors. The rich and varied field of Indian philosophy the latter has trod but with a light step. Into the subtle and profound Nyaya philosophy of the Bengal school, into that which formed the field on which Raghunath, Gadadhara, Jagadisa won their great and lasting triumphs of intellect, the pride and glory of the Bengali race, he has not obtained a glimpse. Or the great Vaishnava philosophy first formulated in that book of books—the Bhagavata Purana—and developed by a succession of brilliant thinkers, from Ramanuja to Jiva Goswami, he has no adequate conception. Nothing has so largely influenced the fate of some of the Indian peoples as the Tantras, and of Tantra literature the European knows next to nothing. The secular poetry of ancient India he has studied, translated and commented upon, but has failed to comprehend. A single hour of study of the Sakuntala by a Bengali writer, Babu Chandra Nath Bose, is worth all that Europe had to say on Kalidas, not excepting even Goethe's well known eulogy. Hindu law, the *Smriti*, is still the almost exclusive study of the Hindus themselves. The legends of the Hindu faith, which are to the European inex

pressibly silly, he has hitherto honoured only with his laughter; to the loving study of the author of *Pushpanjali* (also a Bengali writer, Babu Bhudeb Mukerji) they have yielded results not surpassed in loftiness and splendour by anything in European literature. And I might go on with this enumeration for columns together, but this ought to be enough.

"I have been somewhat taken by surprise to find in Mr. Hastie's letter that he expects to find in this letter of mine such "explanation and defence" of Hinduism as I may be able to offer. He forgets that that the issues between us exclude the larger question of the merits of Hinduism, and that in my very first letter I told him that no controversy was possible with him at present, because he did not possess the necessary qualifications.

"Hinduism does not consider itself placed on its defence. In the language of lawyers, there is not yet a properly framed charge against it. And at the bar of Christianity, which itself has to maintain a hard struggle for existence in its own home, Hinduism also pleads want of jurisdiction. But I admit Mr. Hastie's right to demand an exposition of their views from those who do not accept his own. * * *

"Hinduism, like every other fully developed religious system, consists of, *Firstly*, a doctrinal basis or the creed; *Secondly*, a worship or rites; and *Lastly*, of a code of morals more or less dependent upon the doctrinal basis. This is the whole field of study; but let it be well surveyed. The doctrinial basis will be found to consist in (*1*) *dogmas* formulated, explained and illustrated in a mass of philosophical literature; and (2) legends, which form the legitimate subject of the Puranas, though these encyclopædic productions contain many things other than the legends. The value of the legends is inferior to that of the philosophy in the depths of which are laid, broad and solid, the foundations of modern Hinduism. The whole of Hindoo religious philosophy is probably post Vedic, and serves to mark the era of separation between the ancient and modern religions of India. Each modern Hindu sect has now its own system of philosophy, but the more general conclusion of philosophy are common to all; and among all the dogmas, there is one in particular which has had more influence in shaping the destinies of India than any other. Kapila had the glory of first announcing it to the world, and the philosophy of Europe and Asia has not up to this day alighted upon a discovery grander or more funda-

mental than the profound distinction first made by him between matter and soul—between *purusha* and *Prakriti*. In the hands of the eclectics, who are the real fathers of modern Hinduism, this great conception has taken its place as the backbone of their fabric. It runs through the whole world of Hindoo thought, shaping the legends, prescribing the rites, and running through even the secular literature. So long as the student of Hinduism keeps this great idea before him, he will find Hinduism a living organism which has *grown*, and not a collection of dead formulæ lumped together by finest craft.

"*Prakriti*, properly translated • is Nature. Modern science has shown what the Hindus always knew that the phenomena of nature are simply the manifestation of *Force*. They worship, therefore, Nature as *Force*. *Shakti* literally and ordinarily means force or energy. As destructive energy, force is *Kali*, hideous and terrible, because destruction is hideous and terrible. As constructive energy, force is the bright and resplendent *Durga*. The universal soul is also worshipped, but in three distinct aspects, corresponding to the three qualities ascribed to it by Hindu philosophy. These are known in English translations as Goodness, Passion, and Dark-

ness. I translate them as Love, Power, and Justice. Love creates, Power preserves, Justice dooms. This is the Hindu idea of Brahmā, Vishnu and Siva. I cannot stop to discuss the relation of these gods to their Vedic predecessors of the same names. The new religion grew out of the old, those time-honoured names were retained, but were grouped under new ideas. The citadel had been stormed and battered down by the Buddhists and the philosophers themselves; and had to be reconstructed out of the old materials, but on new and more solid foundations. Pantheism and Polytheism, philosophy and mysticism all lent a hand; and out of this bold electicism rose the beautiful religion which I do not believe to be of Divine origin but which I accept as the perfection of human wisdom.

The great Duality—Nature and Soul—presides over all. Let us now see how the same great conception shapes the Legends. It will be enough to take for the purpose the legends of Krishna, because they are the most important, but I have time only for the briefest explanation. Krishna is Soul, Radha is Nature. The Sankhya philosophy—the school to which the great conception of Nature and Soul originally belongs but which in spite of its wealth of thought, is a gloomy pessimism—had laid

down that supreme human bliss consisted in the dissociation of Soul from nature. It had pronounced their connexion illegitimate; and the legend of Radha and Krishna retains the illegitimate connexion. Nevertheless, the Hindu worship this illicit union. He worships them because with a truer insight than is given to a morose philosopher, he has perceived that in this Union of the Soul with Nature lies the source of all beauty, all truth, and love. And this magnificent legend, the basis of the Hindu religion, of *love for all that exists*, is treated by its European critics as the grossest and most revolting story of crime ever invented by the brain of man. So much for the intellectual superiority of Europe.

"I will next add an illustration to show how the same great conception runs through even the secular literature of ancient India. The Kumara Sambhava, the noblest philosophical poem to be found in any language, but, I regret to say, one of the least understood both in India and Europe, celebrates the Marriage of Nature with Soul, typified in Uma and Siva. In the hands of the great poet, the union is a legitimate one—a holy marriage. The poet could soar above both Philosopher and Puranist. I regret I have not space to explain or to do justice to Kalidasa's magnificent

conception ; the yearning of the physical and human for the moral and the divine, and the accomplishment of their union after purification through the sacrifice of earthly desires and the discipline of the heart. In that sacrifice, and in that discipline is to be found the poet's refutation of the philosopher. The sacrifice, the destruction of Kama, is narrated in a well-known passage, which still remains the loftiest in all Indian literature, and is unrivalled by any I have come across in the poetry of any other nations.

"I now pass on to the worship. Much of the Hindu ritual is mummery, admitted to be so by even the priests, and rejected with deserved contempt by educated Hindus. Mr. Hastie finds out, I hope, that the Hindu Idolatry, which is generally treated by the Christian Missionary as covering the whole field of Hinduism, is really a small fraction of it and comes under consideration as a subordinate part of this second division of our subject. Mr. Hastie will probably be startled to hear that idolatry, though a part of Hinduism, is not an essential part even of the popular worship. Idol worship is permitted, is even belauded in the Hindu scriptures but it is not enjoined as *compulsory*. The daily worship of the Hindu—his Sandhya—his Ahnika,—is not

idolatrous. The orthodox Brahman is bound to worship Vishnu and Shiva every day, but he is not bound to worship their images. He may worship their images if he choose, but if he does not so choose, the worship of the Invisible is accepted as sufficient. The majority of Brahmans, I believe, do not in the daily rites go beyond this worship of the Invisible and the Unrepresented. A man may never have entered a temple and yet be an orthodox Hindu.

"And I must ask the student of Hinduism when he comes to study Hindu Idolatry, to forget the nonsense about dolls given to children. I decline subscribe to what is simply childish, even ough the authority produced is titled authority ith a venerable look. The true explanation nsists in the ever true relations of the Subjective leal to its Objective Reality. Man is by instinct a et and an artist. The passionate yearnings of e heart for the Ideal in Beauty, in Power, and Purity, must find an expression on the world of he Real. Hence proceed all poetry, and all art. xactly in the same way the Ideal of the Divine Man receives a form from him, and the form n Image. The existence of Idols is as justifiable s that of the tragedy of Hamlet or of the story r Prometheus. The *Religious* worship of idol

as justifiable as the *Intellectual* worship of Hamlet or Prometheus. The homage we owe to the ideal of the human realised in art is Admiration The homage we owe to the ideal of the Divine realised in idolatry is Worship.

"Nor must the student fall into the error of thinking that the image is ever taken to be the God. The God is always believed, by every worshipper, to exist apart from the image. The image is simply the visible and accessible medium through which I choose to send my homage to the throne of the Invisible and Inaccessible. Images of gods have in themselves no sanctity. They are daily sold in the bazaars as toys. The very images worshipped are made by impure workmen, sold in the bazaars, and are treated on exactly the same footing as other shopkeeper's wares. They do not acquire any sanctity till the *Prana Pratistha*, i. e. till I consent to worship it. The image is holy, not because the worshipper believes it to be his god—he believes in no such thing—but because he has made a compact with his own heart *for the sake of culture and discipline* to treat it as God's image. Like other contracts, this one, with the worshipper's own heart, he may terminate at his pleasure. When he terminates it, he ceases to worship the image and throws it away, as we

have just thrown away by thousands, the images of Durga. He could not do this if for a moment he believed it to be his God.

"Our idols are hideous, say they. True, we wait for our sculptors. It is a question of art only. The Hindu pantheon has never been adequately represented in stone or clay, because India has produced no sculptors. The images we worship in Bengal are, as works of art, a disgrace to the nation. Wealthy Hindus should get their Krishna and Radha made in Europe.

"We come last of all to the ethics of the Hindu religion. Like all other complete codes of morality, the Hindu ethical system seeks to regulate the conduct of individuals, as well as the conduct of society. It is a System of Ethics as well as a Polity. The code of personal morality is as beautiful, if not more so, as any other in the world, not excepting the Christian ; a degree of excellence which the Christian accounts for by supposing, like Mr. Hastie, that it must have been derived from Christian sources, very much after the logic of a little fellow I know, who insists that every man who drives in a carriage is his grandsire, on the ground that his grandsire drives in a carriage. The Social Polity is even more wonderful. It is the only system which has even succeeded in substi-

tuting the government of Moral Power in the place of that of physical Power. It is the only system which has abolished War and the military Power.

"If the profoundest European thinker of the nineteenth century had any acquaintance with India he might have known that his dream of a Positive Polity and an Intellectual Hierarchy had, thousands of years ago, been thought out and realised with a success transcending all his anticipations.

"Here, too, however, the student must distinguish between the Essentials of Hinduism and its Non-essential adjuncts. Much of the ethical portion is pure Ethics, and not Religion. The social polity is also non-essential. Caste, therefore, which is the most prominent feature of that polity, is non-essential. There have been and there still are many Hindu sects who discard caste distinctions. The Chaitanyaite Vaishnavas furnish an instance in point.

"Mr. Hastie may turn round upon me here and say, 'You strip Hinduism of its rites, its idolatry, its caste; what do you then leave it?'—I leave *he kernel without the husk.*

"I have done. I hope Mr. Hastie now understands how I dispose of his challenge. The

modern Ram Chandra turns away from the Western Janaka's bow without touchiug it even with the tip of his little finger. For, alas! the new Janaka has no Janaki to offer as the prize. Truth, the Janaki he seeks to win, must be wooed in another fashion. Methods of disputation which find favour among pugnacious schoolboys gathered at a wedding feast are as unworthy of Mr. Hastie as they are of me. But if confession from me of inferiority to Western Scholars in Vedic learning will bring any comfort to Mr. Hastie, he will see that I have already made such confession on behalf of my countrymen, and I even more readily make it on my own behalf. I make no pretension to scholarship of any kind.

"I have to thank Mr. Hastie for his very kind offer to procure for my lucubrations the recognition of the great Sanskritists of Europe. I assure Mr. Hastie that he has mistaken his man. Happy that such recognition is already the fortunate lot of certain *distinguished* countrymen of mine, whom I somewhat reluctantly spare the humiliation of being mentioned by name in this connection. I hasten to assert Mr. Hastie that I am not ambitious of honours which I do not deserve and may not prize. As my card is already at Mr. Hastie's

disposal, I may presume to tell him that the approbation of a whole people has consoled me during a quarter of a century, and may console me still, for the absence of laurels which more fitly grace the heads that wear them now. If Mr. Hastie knows anything of Hinduism, he knows that the Hindu places the wreath round the full, not round the empty, vessel. I am sorry to have to say this, but Mr. Hastie's pointless jest carries an insinuation which can be met only in this way.

"In conclusion I have to thank you for allowing me the very unreasonable extent of space which I have taken up. I have also to express my deep commiseration for Mr. Hastie's bitter disappointment in finding that Ram Chandra was not the very great man from whose encounter he had expected to add fresh lustre to his rusty arms. There is, however, nothing like hope. Let him cheer up. A louder and shriller blast at the castle-gate of Hinduism may yet procure him the honour of an encounter with even—aye, even with the windmills."

পত্রখানা পড়িয়া হেষ্টি সাহেব যেন কিছু অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি লিখিলেন ;—

"If this shallow verbosity, this inconsistent farrago of phrases, this total irrelevance of reasoning

utter ignorance of even the rudiments of Hindu mythology and philosophy, is be taken as the highest expostiton of religion of the educated Hindu, then tell it not in Europe, publish it not in America, but let more earnest men try to give it the 'happy dispatch' as soon as possible. It will surprise me if the more learned representatives of Hinduism—for there are such—do not publicly repudiate Ram Chandra as an unbidden intruder into this controversy, and as no chosen champion of theirs. They will say that, if he is any thing, he is a romancer, and not a reasoner ; an Anglicist and not a Sanskritist ; an apostate and not an apologist ; a poetaster and not a critic. Had the abler men whom he names—Dr. Rajendra Lala Mitra or Babu Bhudeb Mookherjee—come to the rescue, they would not have written better English ; but they would have been more cautious, more correct, and less vulnerable in their utterances and theo ries."

এইরূপ অনেক কথা লিখিয়া হেষ্টি সাহেব পত্রখানা শেষ করিলেন।

পরদিন হেষ্টি সাহেব আবার একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। সে পত্র খানায় বেদ ও তন্ত্র লইয়া অনেক আলোচনা করিলেন। দুই দিন যাইতে না যাইতে

আবার এক খানি পত্র লিখিলেন, এই তৃতীয় পত্র ইংরাজি সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব বস্তু হইয়াছে। এই পত্রে তিনি সাংখ্য, পাতঞ্জল—পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

"রামচন্দ্র" কপিলকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া বলিয়াছিলেন, "জগতের মধ্যে তিনিই প্রথমে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া দর্শনশাস্ত্র লিখিয়াছিলেন।" হেষ্টি সাহেব সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আরিস্‌টটল্‌ ভারতে দর্শনশাস্ত্র আনিবার অনেক পরে কপিল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" অবশ্য কপিল কোন্‌ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কেহ আজও স্থির করিতে পারেন নাই।

এক স্থানে হেষ্টি সাহেব বলিলেন,—

"Hinduism *has only a rotten husk and no kernel.* It is *full* of *Nothingness,* says Kapila, and all the rest of them except Ram Chandra. It is vain to try to put life or light or love into its 'eyeless socket' again, or to attempt to cover its 'rattling bones' with the semblance of new 'flesh and blood.' Not a breath of real spiritual life stirs in the bare

shaking skeleton, and we can now look it through and through."

———o———

এইরূপে হেষ্টি সাহেব তাঁহার শেষ পত্র সমাপ্ত করিলেন। "রামচন্দ্র" এ পত্রেরও কোন উত্তর দিলেন না। নয় দিন পরে রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জ্জি—হেষ্টি সাহেবের অনুরোধে হউক বা যে কোন কারণেই হউক—আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"You can easily understand that having spent a whole life on the consideration of the mutual bearing of Christianity and Hinduism on the question of the regeneration of India, I could not have read, without deep interest, the last controversy between Mr. Hastie and our distinguished and accomplished countryman, who appeared under the assumed name of 'Ram Chandra.'

* * * *

"Ram Chandra has called the idolatrous rites and ceremonies of Hinduism its *husks*, not its *kernel*. If Ram Chandra's view of Hinduism be right, then, on his own theory, Mr. Hastie could not be wrong in condemning and denounc-

ing those persons who were inflicting serious injury, from a moral point of view, on their hosts and neighbours by encouraging *husk-chewing*.

"As to the view of Hinduism which Ram Chandra has propounded, I am obliged to confess to a sad feeling of disappointment. Whatever the pen of the author of 'Kapalakundala' offers to the public, is entitled to our patient attention. But what can be more startling; what more galling to our national pride; what more opposed to our early intuitions, and our unwritten traditions of past ages, than the unequivocal denial of the Vedas ('which are dead!') as the authoritative basis of Hinduism. This denial flatly contradicts Manu and all the authors of our sacred literature; nay, pours contempt on the whole civilised world.

"It is difficult to say what your correspondent's idea of Hindu *philosophy* is. He has certainly extolled the Sankhya and the Nyaya. But Kapila could not allow the creative agency of *Purusha*, and the *Nyaya* could never be so disloyal to its Atoms as to allow any place for *Prakriti*.

"Ram Chandra tells us that 'nothing has so largely influenced the fate of some of the Indian peoples as the *Tantras*, and of *Tantra* literature the European knows next to nothing.' If this has

any meaning, it must be that the *Tantra* with its *unwritten* traditions, is the general basis of the Hindu religion, and, consistently enough, he maintains that the Hindu worships the 'illicit union' between Purusha and Prakriti, retained in the 'illegitimate connection of Krishna and Radha' As a reader of Kapalkundala, I am amazed at such statements.

"I believe there are many Hindus who, inclining to the Vedanta, and looking for the *Mukti* which it promises, have nothing to say to Prakriti, of which even those who do speak of Purusha and Prakriti, the vast majority is innocent of the worship of any 'illicit union.' If there be worshippers and imitators of 'illicit union,' they must chiefly be in circles of Mohunts and recluse hermits, whether of the Vaishnava or Sakteya sects. Householders, men of repute in society, the better classes of the Hindu community, cannot and could not be included in such secret circles. It would be a cruel defamation to Hindu families to attribute to them belief in the system elaborated by Ram Chandra from Tantric sources. The followers of Nyaya, Vedanta and Sankhya philosophies would repudiate such an abuse of the ideas of Purusha and Prakriti, and the best practical *expose* of the illicit union is contained in that great Bengali romance, the Kapalakundala. The great Tantric hero of that inimit-

able novel is Kapalica, a representative worshipper of Bhavani and Bhairavi, as personations of Sakti or Prakriti.

*   *   *

"What, then, it may be asked, is the general religion of the Hindus? I can only answer the question by the help of our past written literature, including the *"dead Vedas."* No Hinduism can be found anywhere that will correspond to every age and epoch in the history of the Hindus. I think it has passed through four stages from the commencement, and without further preface I will at once say a few words on its passages through those stages.

"I. The first or primitive stage of Hinduism is marked by the celebration of sacrificial rites, as figures or images of Prajapati, the Lord of the Creation, who 'had offered himself a sacrifice for emancipated souls' (*Satapatha Brahmana*). The same Prajapati is elsewhere described as the Purusha, 'begotten from the beginning,' whom 'the Gods sacrificed on the sacred grass'.

"II. The second stage was characterized by a change from the monotheistic to the dualistic in doctrine but the practice of sacrifices continued as before. A declension in doctrine rapidly

followed. The self-offering of Prajapati was forgotten, and the significance of sacrifice as a figure of Prajapati was lost.

"III. At this stage it was that philosophy began to influence the creeds of India. The Nyaya while it contended for Brahminical supremacy, generally adopted the grounds on which Buddhism had based its doctrine of Renunciation and Nirvans. The Nyaya did not follow the principles of Shakya Singha in his description of world as a *Maya* or *Mirage* but it proclaimed the doctrine of *Mukti* as the final consummation of Hinduism. The Sankhya, with greater Buddhistic tendency, denied the existence of an intelligent Creator, and pointed to a final consummation not unlike that of Buddhism. The Vedanta, though decidedly an advocate for the Veda and the dignity of the Bramhinhood, yet inculcated the idea of a final absorption in Brahma, which is also called Nirvana.

"IV. In this stage Krishna was invested with supreme divinity, at the head of the Pantheon, not however, without occasional conflicts with Shiva, who aspired after the same dignity.

"The Brahmin is still bound to daily repetitions of the Gayatri and Sandhya, the former being a Vedic verse, and the latter a collection of Vedic passages, but neither are in any way connected

with the Tantras. He is also bound to the worship of Vishnu and Shiva, without any reference to Purusha or Prakriti."

এই পত্র পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি উত্তর দিলেন। কিন্তু সকল কথার উত্তর দিলেন না; মাত্র তন্ত্রের কথা তুলিয়া যা' কিছু বলিলেন। পত্র খানা আগাগোড়া তুলিয়া দিলাম।

No. IV. (Ram Chandra's).

"I have no wish to re-open the controversy I have closed, but allow me to remove a misconception—a most painful one, as your readers will see.

"Dr. K. M. Banerjee writes:—"Ram Chandra tells us that 'nothing has so largely influenced the fate of some of the Indian peoples as the *Tantras*, and of *Tantra* literature the European knows next to nothing.' If this has any meaning, it must be that the *Tantra* with its *unwritten traditions*, is the general basis of Hinduism."

"That certainly is *not* the meaning, and I have not understood how such an interpretation has been arrived at. There may be opinions which influence the destinies of nations, without being the base of national religion. The paganism of Greece has largely moulded, in some of its aspects

at least, the civilisation of modern Europe; but the paganism of ancient Greece is not the general basis of Christianity. Islamism has very greatly influenced the destinies of India, without being the general basis of Hinduism. Christianity at this day largely influences the destinies of India, yet Christianity is not the general basis of Hinduism.

"What the influence of Tantrikism has been on the people of Bengal, of Assam, and of Orissa, I do not propose to discuss here. I can assure Dr. Banerjee that he cannot be more emphatic in the condemnation of Tantrikism than I am, and that I have in no respect departed from the view I put forth and illustrated in *Kapala Kundala* in regard to the morality of that form of Hinduism. True Hinduism and Tantrikism are as much opposed to each other as light and darkness, and I say with as much sincerity as he does, that let it never be assumed that Tantrikism is the general religion of the Hindus; no one, I believe, has ever thought of making such an assumption.

"Let Tantrikism perish—but let it not perish unstudied. The study of the darkest errors of humanity yields lesson as valuable as that of truth itself. And what is history, if it is not the history of human errors.

"When Mr. Hastie talked of the 'Tantric Bible'

and such other nonsense, I did not consider it necessary to make a reply; he had shown himself not to be entitled to any. It is different when Dr. Banerjee misconceives my meaning. I respect him too highly to remain silent.

"As it can no longer be necessary to write under an assumed name, I subscribe my own.

Bankim Chandra Chatterjee.
November 18, 1882."

এইখানেই এই প্রসিদ্ধ মসীযুদ্ধের অবসান হইল।

লেখকত্রয়ের কেহই বাঙ্গালা দেশে অপরিচিত নহেন। তাঁহাদের গভীর জ্ঞান, অসাধারণ পাণ্ডিত্য সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম তাঁহারা কি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন? মনুষ্যলোকে কয়জন তাহা পারিয়াছেন জানি না। তবে এ তর্ক কেন?

বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথা আমাদের তেমন মনঃপূত হয় নাই। হেষ্টি সাহেব বলিয়াছিলেন, হিন্দুদের ঠাকুর জগন্নাথ মূর্ত্তি অতি ভয়ানক; বিলোলরসনা নৃমুণ্ডমালিনী কালীর প্রতিমা, বা হস্তিমুণ্ড গণেশমূর্ত্তি দেখিলে উপাসকের মনে কখনও ভক্তির উদয় হইতে পারে না। হেষ্টি সাহেবের মতে এ সব মূর্ত্তি অতি বীভৎসদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্র কথাটার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "সত্য বটে, আমাদের প্রতিমানিচয় বীভৎসদর্শন, কিন্তু সে দোষ হিন্দুধর্ম্মের নয়—দোষ হিন্দু কারিগরের। বাঙ্গালায় যে সকল প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, তাহা বাঙ্গালাকারিগরের কলঙ্কস্বরূপ। ধনবান্ হিন্দুদের উচিত, কৃষ্ণ ও রাধার মূর্ত্তি ইউরোপ হইতে প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করা।"

উত্তরটা আমাদের মনে তেমন লাগিল না। বঙ্কিমচন্দ্র যদি বুঝাইয়া বলিতেন, কালীমূর্ত্তির এরূপ ভীষণতা, গণেশের হস্তিতুণ্ড প্রভৃতির অস্বাভাবিকত্ব কল্পনা করিবার হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি, তাহা হইলে আমাদের কোনও আক্ষেপ থাকিত না। আমরা যদি ক্রুসকাষ্ঠকে বীভৎসদর্শন বলি, তাহা হইলে কোনও পাদরী বোধ হয় উত্তর দিবেন না, ক্রুসকাষ্ঠ ভাল কারিগরের হাতে পড়িলে তার ভীষণতা আর থাকিবে না; তিনি আমাকে ক্রুসকাষ্ঠ কল্পনা করিবার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবেন। যতক্ষণ না তাহা বুঝাইয়া দেন, ততক্ষণ আমি ক্রুসকে অর্থহীন কাষ্ঠখণ্ড বই আর কিছু মনে করিব না। সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্র যদি গণেশ ও কালীমূর্ত্তির গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব হেষ্টি সাহেবকে বুঝাইয়া দিতেন,

তাহা হইলে কাহারও কোনও দুঃখ থাকিত না। যাহা হউক, এ সকল বড় কথা আলোচনা করিবার আমাদের কোনও অধিকার নাই—শক্তিও নাই।

হেষ্টি সাহেব বা ব্যানার্জ্জি সাহেবের পত্র সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার আবশ্যকতা দেখি না।

—o—

বৈদিক সাহিত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে একটী প্রবন্ধ ইউনিভার্সিটি ইন্‌সটিচিউট মন্দিরে পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি ইংরাজি ভাষায় লিখিত ও পঠিত হইয়াছিল। তাহার নাম দিয়াছিলেন, "Vedic Literature." বর্ত্তমান্ প্রবন্ধ উক্ত Vedic Literatureর সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ।—

সরকারি কর্ত্তব্যানুরোধে আমি টোল পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম যে, বিস্তীর্ণ কলিকাতা নগরী মধ্যে একটী মাত্র বৈদিক চতুষ্পাঠী আছে, (*) আর

(*) বেদাচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের চতুষ্পাঠী।

সেই চতুষ্পাঠীতে নয়টি মাত্র ছাত্র * বেদশিক্ষা করিতেছে। বৈদিক সাহিত্য অনুশীলন পথে অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। সে সকল প্রতিবন্ধক ইউরোপভূমে নাই; সুতরাং সেখানে আমাদের দেশ অপেক্ষা বৈদিক সাহিত্যচর্চ্চা অধিক পরিমাণে হইতেছে।

বেদ আমাদের ধর্ম্মের, আমাদের সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ। বৃক্ষমূলের সহিত বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, বেদের সহিত আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের সেই সম্বন্ধ। বেদ একদিনে

(ক) শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (স্তর গুরুদাসের পুত্র)।
(খ) শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য্য (সামশ্রমীর ভ্রাতা)।
(গ) শ্রীহিতব্রত (পরে সামকণ্ঠ, সামশ্রমীর পুত্র)।
(ঘ) শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (স্তর গুরুদাসের পুরোহিত-পুত্র)।
(ঙ) ৺উপেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা চড়কডাঙ্গার জমীদার)।
(চ) শ্রীশিবধন ভট্টাচার্য্য (এক্ষণে বিদ্যার্ণব)।
(ছ) শ্রীভবতারণ ভট্টাচার্য্য (বিদ্যারত্ন)।
(জ) শ্রীদুর্গাকান্ত ভট্টাচার্য্য (৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের পুত্র)।
(ঝ) শ্রীপরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, (বিদ্যাবাচস্পতী বিষপুষ্করিণীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত)।

বা এক সময়ে সৃষ্ট হয় নাই,—শত শত বৎসর, সহস্র সহস্র বৎসরে সৃষ্ট হইয়াছিল।

বেদ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হয় নাই। গুরু ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন; ছাত্র আবার গুরু হইয়া তাঁহার ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে লোকমুখে বেদশিক্ষা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, লোকে এই কারণে বেদকে তখন শ্রুতি বলিত। কতকাল ধরিয়া লোকমুখে বেদশিক্ষা চলিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। তার পর —তার কতকাল পরে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব * বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই চারিভাগের নাম,—ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। এক ভাগের সহিত অপর ভাগের কোনও সম্বন্ধ নাই। ব্রাহ্মণেরা যে কোনও বেদোক্ত ধর্ম্ম অনুসরণ করিতে পারেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই সামবেদের অনুবর্ত্তী। আবার যাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ, তাঁহারা ঋগ্‌বেদীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।

---

* বেদের বিভাগকার্য্য অথর্ব্বাঋষির দ্বারা হইয়াছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে বেদব্যাস বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তিনি দ্বৈপায়ন নহেন।——প

চারিটি বেদের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু অথর্ব্ব বেদের কথা পূর্ব্বাপর সাহিত্যে উল্লিখিত হয় নাই। অন্যান্য বেদের পর অথর্ব্ব বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিম্বদন্তী আছে যে, আঙ্গির বংশীয় অথর্ব্ব ঋষির দ্বারা এই বেদ সঙ্কলিত হয়। ঋচ অর্থাৎ ঋক অর্থে পদ্য, যজুঃ অর্থে গদ্য, আর সাম অর্থে গান। যজুর্ব্বেদের সহিত অন্য দুই বেদের আরও কিছু পার্থক্য আছে। বৈদিক ক্রিয়া কলাপ যজুর্ব্বেদের মতানুসারেই পরিচালিত হয়। এই টুকুই যজুর্ব্বেদের বিশেষত্ব।

আজিকার দিনে কোনও ক্রিয়া কলাপ করিতে হইলে আমরা সচরাচর একজন পুরোহিত বা দুইজন পুরোহিতের দ্বারা কার্য্য সমাধা করিয়া থাকি। পূর্ব্বে কোনও বৈদিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে ষোলজন পুরো-হিতের প্রয়োজন হইত। এই ষোলজনকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া হোত্রী, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাত্রী ও ব্রহ্মা নামে অভিহিত করা হইত। অধ্বর্য্যুরা যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রানুসারে যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতেন, উদ্‌গাত্রীরা সাম গান করিতেন, আর ব্রহ্মারা সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেন ও ত্রুটি হইলে সংশোধন করিয়া লইতেন।

অথর্ব্ব বেদের সহিত অন্য কোন বেদের সম্বন্ধ নাই *। কোনও যাগ যজ্ঞ করিতে হইলে অন্য কোন বেদের সাহায্য না লইয়া এক অথর্ব্ব বেদানুসারে যজ্ঞ সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক বেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সন্দর্ভ আছে। অংশ বিশেষে মন্ত্রাদি আছে—কোন অংশকে ব্রাহ্মণ্য, কোন অংশকে উপনিষদ, আবার কোন অংশকে আরণ্যক নামে অভিহিত করা হয়।

যে অংশে মন্ত্র আছে, সে অংশ সংহিতা নামে আখ্যাত হয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সংহিতা অংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু এ মতের পোষকার্থ বিশেষ কোনও প্রমাণ তাঁহারা দেখাইতে পারেন নাই।

মন্ত্রগুলি সূক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সূক্ত এক একটী স্তোত্র। য়ুরোপীয়গণ বর্ত্তমান কালে

* মূলে একটু সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে বেদ এক ছিল। বেদব্যাস অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদের ঋক, যজুঃ ও সাম অংশ পৃথক করিয়া লইবার পরও কিয়দংশ অবশিষ্ট ছিল। সেই অবশিষ্টাংশ অথর্ব্ব বেদ নামে পরিচিত। সবই এক গাছের ফল বাছাই বাছাই হইয়া যাহা থাকিল, তাহাই অথর্ব্ব বেদ।—প.

এই সকল সূক্তের এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন যে, এই সকল স্তোত্র, প্রকৃতির উদ্দেশে অনেকেশ্বরবাদী জাতি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। হিন্দুরা যাস্কর সময় হইতে বলিয়া আসিতেছেন, সূক্তে বহু ঈশ্বর উপাসনার কোনও উল্লেখ নাই; তাহাতে সুধু ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পিতার যশোগান আছে। ঋগ্বেদ হইতেও শত শত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, সূক্তের উদ্দেশ্য একেশ্বরবাদ।

ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সূক্তের বহু-সংখ্যক শ্লোক একেশ্বরবাদের সমর্থন করিতেছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন যে, এই সকল শ্লোক পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত হইয়াছে। ইহা অনুমান ...া হয় যে, আদিম জাতিরা অনেকেশ্বরবাদী ছিল; ...র পরবর্ত্তী সভ্য জাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহারা ...কেশ্বরবাদী থাকাই সম্ভব। তাঁহারা ইহা বিস্মৃত হ'ন ... জুডিয়াবাসী ইহুদীরা পুরাকালে যখন অসভ্য ও বর্ব্বর ...ল, তখনও তাহারা একেশ্বরবাদী ছিল; অপরপক্ষে ...াসভ্য গ্রীকেরা অনেকেশ্বরবাদী ছিলেন।

সূক্তের কতকগুলি শ্লোক স্তোত্রই নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ

দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা স্বামী স্ত্রী—পুরূরবা ও উর্ব্বশীর মধ্যে কথোপকথন মাত্র। দশম মণ্ডলের ৩৪ সূক্ত, জুয়ারীর পাশার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা স্তোত্র নয়—জুয়ারীর আক্ষেপ মাত্র। ১০৭ ও ১১৭ সূক্ত স্তোত্র নয়—পরপ্রীতি ও স্বাধীনতার গুণ কীর্ত্তন মাত্র। এইরূপে দেখান যাইতে পারে অনেক সূক্ত আদৌ স্তোত্র নয়—তাহারা কবিতা, গাথা বা কীর্ত্তন মাত্র।

কিন্তু এই সকল সূক্তের—গাথা ও স্তোত্রের—কে প্রণয়ণ কর্ত্তা তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। হিন্দুরা বলেন, সূক্তগুলি অপৌরুষেয়, অর্থাৎ তাহাদের লেখক—দেবতা বা মানুষ—কোনরূপ লেখক নাই। শাস্ত্র বলেন, স্বয়ং ভগবান্ সূক্তের লেখক। এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, এই সকল সূক্ত অনন্তকাল হইতে বর্ত্তমান; ঋষি কর্ত্তৃক পরে দৃষ্ট হইয়াছে। ঋষিরা লেখেন নাই—দেখিয়াছেন মাত্র। আবার স্থূল চক্ষে দেখেন নাই—জ্ঞান চক্ষে দেখিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঋষিরা অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিয়াছিলেন। সূক্তের স্থানে স্থানেও ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে, সূক্তগুলি ঋষিগণ

কর্তৃক রচিত। ডাক্তার মুইর এতদ্‌সম্বন্ধে অনেকগুলি পদ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অতএব নৈষ্ঠিক হিন্দুরা নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করিয়া লইতে পারেন যে, বেদের সূক্তগুলি মানুষের রচিত।

প্রত্যেক সূক্তের প্রারম্ভে দেবতা, ঋষি ও বিনিয়োগের উল্লেখ করা হইয়াছে। বিনিয়োগের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। ঋষি হইতেছেন সূক্তের রচয়িতা। যাস্ক বলিয়া গিয়াছেন যে, "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ।"

দেবতা অর্থে অন্যত্র ঈশ্বর হইতে পারে; কিন্তু সূক্তের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। পূর্ব্বে জুয়ারীর পাশার উল্লেখ করিয়াছি; এই পাশা অর্থাৎ অক্ষ উক্ত সূক্তের দেবতা। একটি স্তোত্র দুইটি ঘোড়ার উদ্দেশে বলা হইয়াছে; এই ঘোড়া এস্থলে দেবতা। এইরূপে সূক্তের উল্লিখিত বিষয়ই যাস্কের মতে দেবতা; তা সে মানুষই হউক বা ভগবানই হউক, বা কোন প্রাণহীন অচেতন পদার্থই হউক।

আমার প্রথম জীবনে একদা প্রাতঃকালে আমি কুতবমিনরের পদতলে দাঁড়াইয়া তাহার দীর্ঘ ছায়া দেখিতেছিলাম। মাঠের উপর বহু দূর-বিস্তৃত ছায়া

দেখিয়া আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে এই ত্রিশ বৎসর পরে, "I find myself lost in wonder and awe of the all-enveloping shadow that the lofty heights to which the old vedic Rishis ascended, now cast upon our vaunted modern culture." *

হিন্দুর পূজোৎসবের উৎপত্তি-কথা।

[গত ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজী ভাষায় এই সন্দর্ভ

* দ্বিতীয় প্রবন্ধ আর এ স্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম না। যাঁহারা তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত প্রবন্ধ University Magazineএ দেখিতে পাইবেন।

এই প্রবন্ধ পঠিত হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর তিনমাস পূর্ব্বে ইন্‌ষ্টিটিউট-মন্দিরে একটী সভা হয়। ছোটলাট ইলিয়ট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্যর গুরুদাস, জষ্টিস আমির আলি প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন। বেদীর (Dias) উপর তিন খানি মাত্র আসন ছিল। মধ্যস্থলে ছোটলাট, তাঁহার দক্ষিণে কটন সাহেব, বামে বঙ্কিমচন্দ্র। সভায়—ঠিক স্মরণ নাই—কাগায় লার্কোর বক্তৃতা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পরিশেষে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গীত হয়।

লিখিয়াছিলেন; বেথুন সোসাইটীর অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা উহা বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই সন্দর্ভ লিখেন, তখন তিনি যুবক ছিলেন। এই বিষয় লইয়া প্রৌঢ়ে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বোধ হয়, এই হেতু তিনি পরে এই সন্দর্ভের কোনও উল্লেখ করেন নাই।]

হিন্দুদিগের পূজা ও উৎসবাদি লইয়া পূর্ব্বে একটু আলোচনা হইয়াছিল বোধ হইতেছে। এই সভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের বিবরণী-পুস্তকে পাওয়া যায় যে, একবার হিন্দুদিগের উৎসব সকলের পদ্ধতি ও প্রকৃতি বিষয়ক একটি নিবন্ধন লিখিত হইয়াছিল। আমি উহাদের উৎপত্তি বিষয়ে দুই চারি কথা বলিব।

আমার মনে হয়, হিন্দুদিগের উৎসব সকল এখন যে আকারে প্রচলিত, উহাদের উৎপত্তি বা প্রথম প্রচলনকালে, সে আকারের ছিল না। আমরা যদি উৎসব সকলের প্রচলন-সূচনা আবিষ্কার করিতে পারি, সমাজের কোন্ অবস্থায় উহাদের কেমন আকার ছিল, তাহার ইতিহাস-কথা জানিতে পারি, তাহা হইলে, আমাদের

সমাজ কেমন বিবর্ত্তন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, সে তত্ত্বও আমরা অবগত হইতে পারিব। তবে ইহাও ঠিক যে, সকল পূজা-উৎসবাদির এক উৎপত্তি-বিধি নির্দ্দেশ করা এখন সম্ভবপর হইবে না। প্রত্যেক পূজা বা উৎসবের প্রচলনের হেতু স্বতন্ত্র; অন্য সকল পূজা বা উৎসবের প্রচলন-হেতুর সহিত উহার কোনও সামঞ্জস্য নাই। প্রত্যেক উৎসব এক একটা বিশিষ্ট কারণের জন্য প্রচলিত হইয়াছে। সকল উৎসবের উৎপত্তির কারণ এক নহে; সে সকল কারণের মধ্যে আদৌ কোনও সামঞ্জস্যের ভাব নাই। ফলে এ বিষয়ে আমরা কোনও সাধারণ নিয়মের নির্দ্দেশ করিতে পারি না। বিশেষতঃ, এমনও অনুমান করিতে পারা যায় না যে, অধুনা প্রচলিত সকল উৎসবই হিন্দু সমাজের আদিম অবস্থায় প্রচলিত হইয়াছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, অনেকগুলি উৎসব অতি পুরাতন, অবশিষ্ট অনেকগুলি অতিশয় আধুনিক।

ইহা একরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এমন অনেক উৎসব আছে, যাহা দেবতা-বিশেষের পূজার আকার ধারণ করিয়া ধর্ম্মোৎসবে পরিণত হইলেও, মূলে

ঋতু-বিশেষের বা প্রাকৃত ঘটনা-বিশেষের সূচকরূপে সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। আদৌ ধর্ম্মের সহিত উহাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। উদাহরণস্বরূপ দোলযাত্রার উৎসবের কথা বলা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে দোলযাত্রা এখন তিথি-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের পূজামাত্র। পশ্চিম দেশে উহাকে হুলি বলে। এই শব্দটা ইংরাজীতে শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয় না, লিখিতও হয় না। গোড়ায় এই হুলি বসন্ত ঋতুর সমাগমের উৎসব ছিল; উহাকে সংস্কৃতে বসন্তোৎসব বলিত। পরে এই বসন্তোৎসব মদনোৎসবে পরিণত হয়। তখনই উহাতে ধর্ম্মের ভাব অনুস্যূত হয়। মদনোৎসবের অর্থ, প্রেম,—প্রেমের উৎসব। ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, যে ঋতুতে প্রকৃতি নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠেন, পবিত্র নিরাবিলরূপে ফুটিয়া উঠেন, বরং যে ঋতুতে মানবের মন উন্নত ও শান্তিপ্রদ চিন্তায় মগ্ন থাকিবে,—সেই ঋতুতে ভারতের কবি সকল ও অধিবাসিবৃন্দ কামের ও প্রেমের ঋতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন কেন! এইভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে বসন্ত ঋতু প্রেম ও কামের সহিত যেন অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত হইয়া আছে। কেবলই কি তাই? যে প্রেম অতি উচ্চ, যাহা

আত্মত্যাগের বা আত্মবিসর্জ্জনের তুল্য পবিত্র, যাহা মানুষ ও তাহার সঙ্গিনীতে বা অন্য কোনও বিষয়-বিশেষে নিবদ্ধ থাকিলেও মধুর, সে প্রেম বসন্ত ঋতুর বিষয়ীভূত নহে; পরন্তু যে প্রেমে বা কামে মানুষকে পশুতে পরিণত করে, সেই কামই বসন্তঋতুর আয়ত্তীকৃত ব্যাপার। এই ধারণাটা ভারতবাসীর হৃদয়ে এতই দৃঢ়ভাবে গ্রথিত যে, যখন কোনও হিন্দু কবি বসন্ত ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন, তখনই উহাকে কামজ-প্রেমের ঋতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অন্য কোনও ভাবের উহাতে আরোপ করিতে পারেন নাই।

পৌরাণিক যুগে ভারতে যে সকল মনস্বী ও মনীষী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই বসন্ত ঋতু বিষয়ে এই ধারণা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এমন কি, ভারতের কেবল ভারতেরই বা কেন বলি, প্রাচ্য জগতের বাক্য সাহিত্যের অতি সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ অংশ, কুমারসম্ভবের বসন্ত-বর্ণনায় কবি যেন সহসা একেবারেই ভূমি স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছেন—ঐ কামের কথাই বলিয়াছেন। অথচ ঐ কুমারসম্ভবের এক এক অংশে কবির বাক্য এত উচ্চে উঠিয়াছে, গাম্ভীর্য্যে ও ভাব-

ঐশ্বর্য্যে এতটাই ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে যে, বুঝি বা ততটা উচ্চতায় জগতের কোনও কবি উঠিয়াছেন কি না, এমন সংশয়ও মনে উদিত হয়। সত্য বটে, বসন্ত-বর্ণনাতে কবি কোমলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, মাধুরী ছড়াইয়াছেন, তাঁহার ভাবকম্পিত অনুভাবিকাশক্তি প্রকৃতির নবোন্মেষের সর্ব্বাবয়বে যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে—নবসঞ্জীবিতা প্রকৃতির সহিত কবি যেন অনুকম্পার ভাবে বিভোর হইয়া আছেন, তথাপি কালিদাসের কুমারসম্ভবের বসন্ত-বর্ণনায় কাম ও প্রেমেই প্রধান আসন অধিকার করিয়াছে। এই হেতু বসন্তের উৎসব মদনোৎসবেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। প্রেমের দেবতা মদন; তাই মদন-উৎসবে সর্ব্বপ্রথমে মদনের পূজাই হইত। হলিখেলায় আবীর কুঙ্কুম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পিচকারীর সাহায্যে আবীরের লাল জল সকলের অঙ্গে দেওয়া হয়। পুরাকালের মদনোৎসবেও এই সকল ব্যবহৃত হইত; রত্নাবলী নাটিকায় মদনোৎসবের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, হলি মদনোৎসবের আধুনিক পরিণতিমাত্র। তবে শ্রীকৃষ্ণ কবে মদনের স্থান অধিকার করিলেন, এবং হলী বা মদনোৎসব কখন

বঙ্গদেশে দোলযাত্রায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। পরন্তু যে দেবতা পরে বাঙ্গালার বহুলোকের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, যাঁহার পূজা দেশের আপামর সাধারণের প্রেয় হইয়া উঠিল, এবং যাঁহার ব্রজবিলাসকাহিনী শুনিয়া লোকে বুঝিল যে, মদন অপেক্ষা, তিনিই শিথিল প্রেমের ও উদ্দাম কামের যোগ্যতর দেবতা, তিনিই যে তখন মদন-উৎসব ব্যাপারে মদনকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহারই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

এইবার লক্ষ্মীপূজা ও উৎসবের বিচার করিয়া দেখা যাউক। লক্ষ্মী বা শ্রী ঐশ্বর্য্যের বা ধনধান্য বিভব বিষয়ের দেবী। পুরাকালে যখন কৃষিকার্য্যই ধনসম্পত্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ ছিল, অর্থোপার্জ্জনের অন্য পন্থা সকল লোকে অবগত হয় নাই, তখন লক্ষ্মী বলিলেই লোকে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র মনে করিত। এখন দেখ বৎসরে চারিটা লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বৎসরের চারি ঋতুতে চারিটা ফসল হয়, এবং চারিবার লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। প্রথমে শরৎকালে দুর্গোৎসবের পরেই একটি লক্ষ্মীপূজা হয়; ইহার পরই হৈমন্তিক ধান্য সুপক্ক হইতে থাকে। দ্বিতীয়

লক্ষ্মীপূজা পৌষমাসে হইয়া থাকে ; এই সময়ে হৈমন্তিক ধান কাটিয়া ঘরে তুলিতে হয়। তৃতীয় লক্ষ্মীপূজা হয় চৈত্র-মাসে ; এই সময়ে আশুধান্তের উপযোগী প্রথম বারিপাত হইয়া থাকে। চতুর্থ বা শেষ লক্ষ্মীপূজা ভাদ্রমাসে হয় ; এই সময়ে আশু ধান্য কাটিয়া ঘরে তোলা হয়। ইহা হইতে এইটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে, লক্ষ্মীপূজা কৃষকের উৎসবমাত্র, গোড়ায় উহার সহিত ধর্ম্মের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

অন্য বহু উৎসব, সূর্য্যের নিরক্ষবৃত্তে আয়নিক গতি ও আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতি পরিণতির সহিত সংবদ্ধ—উহার অনেকগুলি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের এক একটা ঘটনার স্মারকমাত্র। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে একটা সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন। আমি এইবার তাঁহারই গোটাকয়েক সিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত করিব। এ কারণ আমি তাঁহারই নিকট ঋণী। আমাদের সকল উৎসবের মধ্যে দুর্গোৎসবই শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই দুর্গোৎসবের ব্যাখ্যা এই ভাবে করা যাইতে পারে। ভারতের জ্যোতিষ শাস্ত্রে বর্ষের দ্বাদশ মাসকে দ্বাদশ সংক্রমণ অনুসারে আখ্যাত করা হয়। অর্থাৎ, সূর্য্য যে মাসে যে রাশিতে

সংক্রমিত হন, সেই রাশি অনুসারে সেই মাসের নামকরণ করা হয়। যেমন বৈশাখ মাসে মেষরাশি, মেষরাশিস্থ ভাস্কর বলিলেই বৈশাখ মাস বুঝায়। তেমনই জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশি। তেমনই আবার আশ্বিন মাসে যখন দুর্গোৎসব হয়, তখন ভাদ্রের সিংহ রাশির পর আশ্বিনের কন্যা রাশি। দুর্গা সিংহবাহিনী, কন্যা রাশি সিংহের পৃষ্ঠেই আসেন।* তবে দুর্গা কন্যা নহেন; পুরাণে তাঁহাকে বিবাহিতা দেবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; তিনি শিবানী ও গণেশজননী। কিন্তু কথা এই যে, বর্ত্তমান দুর্গোৎসবের দুর্গা-প্রতিমা কন্যার প্রতিমা না হইলেও, মূল উৎসবে যে কন্যার বা কুমারীর পূজা হইত, যুক্তির হিসাবে এটুকু বলা যাইতে পারে। এমন কি, গোড়ায় বোধ হয় কন্যা রাশিরই পূজা হইত। এ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। বিশেষতঃ যে দুর্গার পূজা হইয়া থাকে, সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে ষোড়শী বলে। কন্যা, কুমারী, ষোড়শী এক ভাবের পরিচায়ক নহে কি? অথবা যেমন

---

* আকাশে যাঁহারা সিংহ ও কন্যারাশি দেখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, হস্তপদবিস্তৃতা কন্যা সিংহ-পৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছেন।—প

পুরাতন অপ্রচলিত মদন দেবতার স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মদনোৎসবকে দোলযাত্রায় পরিণত করিয়াছেন, তেমনই ইহা সম্ভবপর যে, কন্যারাশির পূজার পরিবর্তে লোকপূজ্যা দুর্গারই উৎসব এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ এইরূপে রথযাত্রা উৎসবের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই উৎসব কর্কট-সংক্রান্তির সময় হইয়া থাকে। ঠিক সংক্রান্তির দিন না হইলেও উহার কাছাকাছি একদিন হইয়া থাকে। সৌর গণনা অনুসারে ত হিন্দুর উৎসবাদির নির্দ্দেশ হয় না, উহা চান্দ্রমাসের তিথি নক্ষত্রের ব্যবস্থা অনুসারে হইয়া থাকে। এই হেতু বোধ হয় রথের তিথির একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে। তবে মনে হয়, গোড়ায় রথোৎসব সৌর গতি গণনানুসারেই সংক্রান্তির দিন হইত; পরে সাধারণ নিয়ম চান্দ্রগণনা অনুসারেই উহার তিথি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। মকর রাশি ও কর্কট রাশির মধ্যে বিষুব রেখাকে দুই বার অতিক্রম করিয়া সূর্য্য যে স্বীয় অয়নের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাহার একটু বিশিষ্টতা আছে। সূর্য্য কর্কট রাশিতে যাইয়া যেন কিছুকাল অপেক্ষা করেন, তাহার পর আবার বিষুব রেখার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মকরসংক্রান্তির সম-

রেও ঠিক একই রকম গতি সূর্য্যের হয়। হিন্দুর পুরাণে গল্প আছে যে, সূর্য্য রথে চড়িয়া আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। এই পৌরাণিক গল্পের অনুসারে একটা রথ নির্ম্মিত হয়; সে রথকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়; সেই স্থানে রথ অষ্টাহকাল অপেক্ষা করে; পরে যেখানকার রথ সেইখানেই ফিরিয়া আসে। ইহা কি সূর্য্যের গতির অভিনয় নহে? বলিতে পার, রথে ত সূর্য্য থাকেন না, জগন্নাথ বিরাজ করেন। তাহা হইলে উত্তরে বলিব, যেমন মদন ও কন্যাকে অপসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্গা অন্য দুই উৎসবের প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তেমনই জগন্নাথ সূর্য্যকে সরাইয়া নিজেই রথে বিরাজ করিতেছেন।

এমন সংশয় করা যাইতে পারে যে, রথযাত্রার উৎপত্তির যে আনুমানিক কারণ নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা যুক্তিযুক্ত হইলে, শীতকালে মকর সংক্রান্তির সময়ে আর একটা রথযাত্রার উৎসব হইত। দ্বিতীয় রথযাত্রা না হউক, মকর-সংক্রান্তির সময় যে একটা উৎসব হয়, সে পক্ষে ত কোনও সন্দেহ নাই। এই উৎসব ঠিক সংক্রান্তির দিনই হইয়া থাকে, উহার নির্দ্দেশ সৌর গণনা

অনুসারে হয়, চান্দ্র পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। মাসের শেষ দিনে মকর-সংক্রান্তির নির্দ্দেশ আছে বলিয়াই, বোধ হয়, উৎসবটা ঐ দিনেই নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে দিন সূর্য্য মকর-সংক্রান্তিতে আসিয়া স্পর্শ করেন, সেদিন ত পঞ্জিকার হিসাবে মকর-সংক্রান্তি হয় না। হইবার কথাও নহে; কারণ, ক্রান্তিপাতে সূর্য্যের বিলোম বা পশ্চাৎ গতি আছে, সে জন্য পার্থক্য ঘটিবার কথা। পুরাকালে যখন এই উৎসব প্রচলিত হইয়াছিল, তখন হয় ত প্রকৃত সংক্রান্তি মাসের শেষ দিনেই হইত। এখন একুশ দিনের পার্থক্য হইয়াছে। প্রতি বৎসরে পৃথিবীর ৫০´/২" বিলোম গতি হওয়াতে পনর শত শতাব্দীতে একুশ দিনের পার্থক্য হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মকরসংক্রান্তির উৎসবটা খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল। কর্কট-সংক্রান্তির সময়ে যেমন রথ প্রস্তুত হয়, মকর-সংক্রান্তির সময়ে তেমন রথ প্রস্তুত হয় না বটে, পরন্তু পরের দিনকে উত্তরায়ণের দিন বলাতে, ইহা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে, এই উৎসব সৌর অয়নগতি লক্ষ্য করিয়াই প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতের বহুপ্রদেশে উত্তরায়ণের দিনে কেবল সূর্য্যেরই

উপাসনা হইয়া থাকে। মিঃ লঙ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে এক সন্দর্ভ পাঠ করেন; উহাতে ভারতীয় নানা বিষয়ে পাঁচ শত প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্ন সকলের মধ্যে একটি প্রশ্ন এই যে, উত্তরায়ণের দিনে কেবল সূর্য্যেরই পূজা হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কি আরও বিশদভাবে দিতে হইবে? মকর-সংক্রান্তির উৎসব যে সৌর অয়নগতি লক্ষ্য করিয়া প্রচলিত, তাই উত্তরায়ণের দিনে সূর্য্যের পূজাই প্রশস্ত। আমার মনে হয়, এই উত্তর অন্য কোনও অনুমানের অপেক্ষা করে না।

আমি জানি যে, জেনারল কনিংহাম, তাঁহার ভিল্‌সা স্তূপের বিবরণপুস্তকে আধুনিক রথযাত্রার একটি সঙ্গত ও ইতিহাস-সম্মত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার উৎসব ছিল। বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, এই তিনের প্রতিমা রথে বসাইয়া রথ টানা হইত। বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার উৎসব ঐ কর্কট-সংক্রান্তির সম-সময়ে হইত। বোধ হয়, পরে বৌদ্ধদিগের অনুকরণে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে, বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের পরিবর্ত্তে, রথে বসাইয়া রথযাত্রার উৎসব আরম্ভ করা হয়। এমন কি, জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা

বুদ্ধ-ধর্ম্ম--সঙ্ঘের আকারান্তরমাত্র, বৌদ্ধ আদর্শেই নির্ম্মিত। এই অনুমানের পোষক প্রমাণ, কনিংহাম সাহেবের পুস্তকে লিখিত আছে। তবে উহা যে অবি-সংবাদিত প্রমাণ, তাহা আমি বলিতে পারি না। এমনও ত হইতে পারে যে, বৌদ্ধগণ অতি পুরাতন আদিম সৌর উৎসবকে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ঘটনা-পরিজ্ঞাপক উৎসবকে,—নিজেদের মতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছিলেন।

এই হিসাবে রাস-যাত্রার উৎসবটা জ্যোতিষ-নির্ণায়ক উৎসব বলিয়া মনে হয়। হয় ত রাস শব্দটা 'রাশি' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে, উহার অর্থ যে কি হইতে পারে তাহা আমি বলিতে পারিলাম না। তবে এই অনুমান কতকটা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় যে, বসন্তোৎ-সবের—দোলযাত্রার অনুকরণে ইহা শারদোৎসব মাত্র। বসন্ত-উৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হয়, শরতের রাসযাত্রা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় হয়। আবার বৈশাখের পূর্ণিমায় ফুল দোল, শ্রাবণের পূর্ণিমায় ঝুলনযাত্রা হয়। কাজেই অনু-মান করিতে হয় যে, এই চারিটা উৎসবই প্রথমে ঋতুর উৎসবই ছিল, ধর্ম্মের সহিত উহাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। এখন কিন্তু এই চারিটিই ধর্ম্মোৎসব, এবং শ্রীকৃষ্ণই

এই চারি উৎসবের অধিনেতা, দেবতা। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, হিন্দুদিগের বৎসরের ছয় ঋতুর চারিটা ঋতুর চারি পূর্ণিমায় এই চারিটা উৎসব হইয়া থাকে। কেবল হেমন্ত ও শীতের দুইটা পূর্ণিমায় কোনও উৎসব নাই। ইহার হেতু বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরতের পূর্ণিমায় স্ফুটচন্দ্রিকাদীপ্ত নিশা বড়ই মধুর, বড়ই মনোরম, উৎসবের ও উল্লাসের উপযোগী। এমন কি, বর্ষায় গতঘনা যামিনীতে পূর্ণচন্দ্রোদয় এক অপূর্ব্ব ব্যাপার—অতি সুন্দর, অতি মনোহর। কিন্তু শীতকালে, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের পূর্ণিমা যেন তমিস্রাসমাচ্ছন্না, যেন শীতজাড্যস্থবিরা, যেন হৈমস্পর্শে সদা বেপমানা, চন্দ্রের সে উল্লাস বিকাশ নাই, সে বিগলিত-রজত-ধারাস্রাবের ন্যায় চন্দ্রিকাদীপ্তির হাস্যময়ী খেলা নাই। এমন পূর্ণিমার নিশায় উৎসব জমে না। হিন্দুগণ এই পূর্ণিমা পরিহার করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন।

কার্ত্তিক-পূজাটাও, আমার মনে হয়, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের ঘটনা হইতে সঞ্জাত। দেবতার নাম ও যে মাসে উহার পূজা হয়, তাহার নাম, কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে উৎপন্ন হই-

য়াছে বলিয়া বোধ হয়। পুরাণে গল্প আছে যে, কার্ত্তিকেয়, উমা বা দুর্গার পুত্র বা দত্তক পুত্র। উমা বা দক্ষ-দুহিতা সাতাইশটা নক্ষত্রের ভগিনী। ইহা হইতে এমন অনুমান করা যায় না কি যে, অতিপূর্ব্বে—পৌরাণিক যুগেরও পূর্ব্বে—কার্ত্তিকেয় ঐ কৃত্তিকা নক্ষত্রের পুত্র ছিলেন; শেষে পৌরাণিক যুগে গল্পটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং কার্ত্তিকেয় পুরাণপ্রিয় দুর্গারই পুত্র বলিয়াই উক্ত হইলেন? এই অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে এমন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, প্রথমে কার্ত্তিকোৎসব বলিলেই কৃত্তিকা নক্ষত্রের উৎসব বুঝাইত। পরে এই উৎসবে ধর্ম্মের ভাব আরোপিত হইল,উৎসবের অধিষ্ঠাতা এক দেবতা আসিলেন; কৃত্তিকাসম্বন্ধীয় দেবতা বলিয়া তাঁহার নাম হইল কার্ত্তিকেয়। ক্রমে ক্রমে কার্ত্তিকেয়কে লোকে কৃত্তিকার পুত্র বলিয়া চিনিল। শেষে পুরাণের কল্যাণে কার্ত্তিকেয় উমার পুত্র হইলেন। উমা দক্ষ প্রজাপতির দুহিতা সাতাইশ নক্ষত্রের ভগিনী হইলেন। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমার সিদ্ধান্ত অনেকটা সুদূরপরাহত এবং এই হেতু উহা বিশেষ বিচার-যোগ্য গুরুতর সিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

উপরের উল্লিখিত অনুমান সকলে যদি কিছু সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে, হিন্দুদিগের উৎসব সকলকে নিম্নোক্ত কয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) সূর্য্যের আয়নিক উৎসব; যথা, রথযাত্রা ও মকরসংক্রান্তি প্রভৃতি।

(২) নাক্ষত্রিক বা জ্যোতিষ-ঘটনা-সম্ভূত উৎসব; যথা, দুর্গাপূজা, কার্ত্তিকেয়-পূজা প্রভৃতি।

(৩) ঋতুজাত উৎসব; যথা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, ফুলদোল প্রভৃতি।

(৪) কৃষিকার্য্যগত উৎসব; যথা, চারিটি লক্ষ্মীপূজা। গ্রীকদিগের কীরিজ (Ceres) লক্ষ্মীর স্থানাভিষিক্ত দেবী।

(৫) পৌরাণিক উৎসব; যথা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা প্রভৃতি। এ গুলি অতি আধুনিক।

(৬) বিভীষিকা-অপসারক উৎসব। লোকে যে সকল প্রাকৃত ঘটনায় ভীত হয়, বা আপদে সঙ্কুচিত হয়, সেই সকল আপদ বা বিভীষিকার দূরীকরণমানসে দেবতা বিশেষের পূজা করে। যথা, মনসা-পূজা; ইহা সর্পভয়-নিবারণের উৎসব। শীতলা পূজা প্রভৃতি এই শ্রেণীর পূজা।

হিন্দুদিগের সকল উৎসবের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবিশেষের স্মরক কোনও উৎসবই উহাদের নাই। যে জাতির মধ্যে ইতিহাসের চর্চ্চাই ছিল না, সে জাতির মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনামূলক উৎসবের অন্বেষণ ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র।

যাহা হউক, হিন্দুদিগের মধ্যে এমন উৎসবের প্রচলন আছে, যাহা আমার নির্দ্দিষ্ট কোনও শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যেমন দেওয়ালী উৎসব। দেওয়ালী যে ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে উহা যে একটা বিস্ময়জনক উৎসব, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। উহার বিশিষ্টতা এই যে, যে নিশায় দেওয়ালী উৎসব হয়, সেই নিশাকালে হিন্দু-মাত্রই নিজ নিজ গৃহ প্রদীপ্ত দীপাবলীতে সাজাইয়া থাকেন। ক্রমে নগর আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া উঠে। কেবল ইহাই নহে; এই দীপাবলীর সঙ্গে আরও একটু ব্যাপার আছে; তজ্জন্যই উহার বিশিষ্টতা, এবং তাই মনে হয় যে, কোনও এক বিশিষ্ট ঘটনা, বা উদ্দেশ্য, বা ভাব নির্দ্দেশ করিয়া এই উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসব কার্ত্তিক মাসে হয়। এই মাসটা যেন আলোক-মালা-বিভূষণেই উৎসৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সারা

মাসটা প্রত্যেক হিন্দু-গৃহে আকাশপ্রদীপ দেওয়া হয়; একটা উচ্চ বংশদণ্ডের উপর আলো জ্বালাইয়া উর্দ্ধে ঝুলাইয়া রাখা হয়। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে, বিশেষতঃ কাশীতে এই মাসেই প্রত্যেক ঘাটে তীর্থে তীর্থে দীপাবলী জ্বালিয়া দেওয়া হয়। কুমারী সকল ছোট ছোট প্রদীপ জ্বালিয়া নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেয়; যেন মনে হয়, সংসার-প্রবাহে তাহাদের জীবন-প্রদীপ যে ভাবে ভাসিয়া যাইবে, তাহারা উহারই অভিনয় করে। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এবংবিধ আচার ব্যবহারের মূল কোথায়, তাহার আলোচনায় আমার সমধিক আগ্রহ বোধ হয়; মনে হয়, ইহাদের মূলের অনুসন্ধিৎসা, উৎসব সকলের প্রচলনের অনুসন্ধিৎসা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়জনক। তবে এই সকল ব্যাপারের দুই চারিটা পদ্ধতির অর্থ অনেকটা বুঝা যায়। লক্ষ্মীপূজায় কেন ধান দিতে হয়; সরস্বতীপূজায় পুস্তক, দোয়াত, কলম, বাদ্যযন্ত্রাদি কেন রাখা হয়, তাহা আর বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। হলীর সময়ে আবীর ব্যবহৃত হয়; বোধ হয় বসন্তের নবসঞ্জীবিত প্রকৃতির নবানুরাগপ্রসূন লোহিতাভ নব

কিশলয় আদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আবীরের ব্যবহার হইয়া থাকে। দুর্গোৎসবের পর বিজয়াদশমীর দিন ভাঙ খাইতে হয়। ভাঙের অপর নাম সিদ্ধি। বিজয়াদশমীর দিনে সিদ্ধিপান করিলে সারা বছরটা সকল কার্য্যে সিদ্ধি-লাভ হয়। কিন্তু অন্য সকল ব্যবহার-পদ্ধতি এমনই বিস্ময়-জনক যে উহাদের ব্যাখ্যা এত সহজে হয় না। কার্ত্তিক মাসে এত দীপাবলী কেন? গঙ্গা দশহরা পূজার দিনে কেন আদা কলা উচ্ছে (বীড়) না চিবাইয়া গলাধঃকৃত করিতে হয়? চুল্লীমুখে উনানের উপর মনসা-পূজা হয় কেন? পুরাণ এ সকল ব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যাই দিতে পারে না, লোকবুদ্ধিও ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারে না। তাই মনে হয়, যে ভাব বা ঘটনা সম্পর্কে বা যাহার স্মৃতিরক্ষার জন্য এই সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, সে ভাব, ঘটনা বা স্মরণীয় ব্যাপার এখন পূর্ণ-ভাবে বিস্মৃতি-গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে।

সে যাহা হউক, আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, হিন্দুদিগের অধিকাংশ উৎসব এবং তৎসংসৃষ্ট ব্যবহারপদ্ধতি, অন্ততঃ পুরাতন উৎসব সকল ও ব্যবহারপদ্ধতির মূলে ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধই ছিল না। এখন যে ঐ সকল ধর্ম্মোৎসবে

পরিণত হইয়াছে, সে কেবল পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগের প্রভাবেই হইয়াছে, অথবা পুরাণগত অন্ধবিশ্বাসের হেতুই উহাদের আদিম আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলিলাম। লোকসাধারণ আমার হেতুবাদ অনুসারে উৎসব সকলকে লক্ষ্য করিলে, আমার সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য হয় ত অনুধাবন করিতে পারিবেন, এবং হয় ত তাঁহারাও আমার মতানুকূল হইতে পারেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সন্দর্ভ পঠিত হইবার পর রেভারেণ্ড জে, লং উঠিয়া বলিলেন যে, সন্দর্ভ-লেখক অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় প্রদেশে (Tera incognita) বিচরণ করিয়াছেন। এখনও এ ব্যাপারের অনেক বিষয় আবিষ্কার করিবার আছে। তিনি যাহার ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা নূতন বিষয় এবং সম্যক আলোচনার যোগ্য। তবে ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার বটে যে, এখন যাঁহাকে আমরা জগন্নাথ বলিয়া জানি, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে উনিই বুদ্ধ ছিলেন, এবং জগন্নাথের মন্দির বৌদ্ধ-মন্দির ছিল।

মিঃ উড্রো (Mr. Woodrow) বলেন, আমার এই ধারণা যে, হিন্দুদিগের উৎসব সকলের ইতিহাস যদি আদিম কাল পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখা যায়,

তাহা হইলে, গ্রীক বা যবনদিগের উৎসব সকলের সহিত উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় ত জানা যাইতে পারিবে।

মিঃ বিভার্লী (Mr. Beverley) লেখকের ভাবুকতার পর্য্যাপ্ত প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন, লেখক দার্শনিকের সামঞ্জস্যবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, হিন্দুদিগের উৎসব পূজা কেন, জাতিবিচারটাও যে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত এমন বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। স্বাভাবিক কারণবশতঃই এই সকল ব্যাপার উদ্ভূত; সামাজিক অভাব প্রভাবে উহাদের উন্মেষ ঘটিয়া থাকে; বিশেষতঃ, জাতিবিশেষের প্রকৃতি বা মনীষার বিশিষ্টতা হেতু সামাজিক আচার ব্যবহার উৎসবাদির বিশিষ্টতা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। *

---

* সাহিত্য, ২০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

সূচী।

—ঃঃ—

প্রথম ভাগ।

—*—

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চাকরী।

তৃতীয় খণ্ড।

শেষ জীবন।

দ্বিতীয় ভাগ।

চতুর্থ খণ্ড।

সাহিত্য।